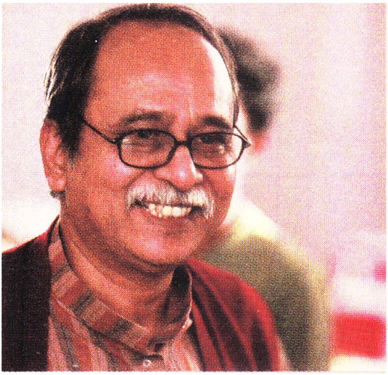
শান্তিকমিটি ১৯৭১

মুনতাসীর মামুন

গত চারদশকে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা হয়েছে। তবে, মুক্তিযুদ্ধের শত্রুপক্ষে বিষয়ে লেখালেখি প্রায় হয়নি। যতটুকু লেখালেখি হয়েছে তার অধিকাংশই লিখেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। তিনি প্রধানত শত্রুপক্ষের মনস্তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন। এ- বিষয়ক একটি গ্রন্থ দুখণ্ডে আমরা ইতঃপূর্বে প্রকাশ করেছি, নাম—*রাজাকারের মন।*

এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হলো হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ফ্রন্ট, রাজাকারদের সংগঠন শান্তিকমিটি নিয়ে—*শান্তিকমিটি ১৯৭১।* মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সমর্থকদের শায়েস্তা করার জন্য গঠিত হয় রাজাকারদের সংগঠন শান্তিকমিটি যার অন্যতম নেতা ছিলেন জামায়াতে ইসলামের আমীর গোলাম আযম। গোলাম আযম ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে শান্তিকমিটির সদস্যরা খুন লুট ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ—এমন কোনো দুষ্কর্ম নেই যা করেনি। অথচ শান্তিকমিটি নিয়ে গবেষণা এর আগে হয়নি এবং এ নিয়ে আলাদা কোনো গ্রন্থও প্রকাশিত হয়নি। সেই পথিকৃতের কাজটি সমাপন করে ড. মুনতাসীর মামুন আবারও প্রমাণ করলেন তিনিই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ঐতিহাসিক।

ISBN 984 70156 0246 8



মুনতাসীর মামুনের লেখালেখি শুরু ছাত্রজীবন থেকে। সেই থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনা ও গ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে লাভ করেছেন পি-এইচ.ডি.। বর্তমানে সেই বিভাগের অধ্যাপক। পূর্ববঙ্গ, ঢাকা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর বেশ কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি পরিচিত। শিশুসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। বর্তমানে দেশে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ভাষ্যকার হিসেবে হয়ে উঠেছেন অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দুশোরও বেশি, যার মধ্যে উলেখযোগ্য ১৪ খণ্ডে *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা*, *কোই হ্যায়*, দুই খণ্ডে *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, *পাকিস্তানী জেনারেলদের মন* প্রভৃতি। গবেষণা ও সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে উলেখ্য *প্রেসিডেন্ট পুরস্কার* (১৯৬৩), *বাংলা একাডেমী পুরস্কার* (১৯৯৩) ও *একুশে পদক* (২০১০)।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

শান্তিকমিটি ১৯৭১

শান্তিকমিটি ১৯৭১

মুনতাসীর মামুন

মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

তৃতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বইতে ব্যবহৃত স্কেচটি সংগ্রহীত

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্‌পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম
চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 70156 0246 8

SHANTICOMMITTEE 1971 (Peace Committee 1971) by Dr. Muntassir Mamoon. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhrubo Esh. Price : Taka Four Hundred and Fifty only.

উৎসর্গ

শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য
চারদশক ধরে যিনি সংগ্রাম করছেন

নিবেদন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনি তাদের সহায়তার জন্য অনেকগুলি ফ্রন্ট খুলেছিল। যেমন, রাজাকার বাহিনি, শান্তিকমিটি, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি। এগুলির সঙ্গে প্রধানত যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ বিরোধী রাজনৈতিক দল—জামায়াত ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দলের নেতাকর্মীরা যাদের আমরা এক কথায় বলি রাজাকার।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গত চারদশক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ বিরোধীদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে কম। এ পরিপ্রেক্ষিতে, আমি ইতোমধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছি। *শান্তিকমিটি ১৯৭১* এ পর্বের নতুন সংযোজন।

শান্তিকমিটি নিয়ে একটি বিবরণ লেখার ইচ্ছে ছিল অনেক দিনের। বিভিন্ন সময় তথ্য সংগ্রহ করেছি, সংবাদপত্র থেকে নোট নিয়েছি, কোনো কোনো বিষয়ে প্রবন্ধও লিখেছি, আবার অনেক কাগজপত্র হারিয়েও ফেলেছি। এবার যা সংগ্রহে ছিল তাই দিয়ে শান্তিকমিটির একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছি। এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেও এটি রচনার তাগিদ অনুভব করেছি।

রাজাকারের মন নামে আমি দু'খণ্ডে একটি বই লিখেছিলাম। তাতে শান্তি কমিটির কয়েকজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। আমার সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষেও* বিভিন্ন শান্তিকমিটি সম্পর্কে তথ্য ছিল। ইফতেখার আমিনের *একাত্তরের দালালনামা* ও আলী আকবর টাবীর *দৈনিক সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকায়* বেশ তথ্য আছে। এ সবকিছু মিলিয়ে আমি একটি ধারাবাহিক বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র।

মূল অধ্যায়সমূহের তথ্য নির্দেশ পাতায় পাতায় দেয়া আছে। শান্তিকমিটির নামের তালিকার তথ্য নির্দেশ দেয়া আছে তৃতীয় বন্ধনীর সাথে সংখ্যায়। বইয়ের

শেষে নির্দেশিকায় দেয়া ক্রমিক নম্বর এর সূত্র। যে সব কমিটির নাম/সদস্যের নিচে কোন নির্দেশিকা নেই তা নেয়া হয়েছে ষষ্ঠ পর্বের সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে।

শান্তিকমিটি সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রথম বাধা দলিলপত্রের অভাব। বিজয়ী পক্ষ এ সংক্রান্ত কোন দলিলপত্র রাখেনি। বিজিত পক্ষ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে দলিলপত্র বিনষ্ট করেছে। যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তার ভিত্তিতেই গ্রন্থটি রচিত হলো। আশা করি ভবিষ্যতে অন্য কেউ আরো বিস্তারিত আকারে এ বিষয়ে লিখবেন।

পাণ্ডুলিপি তৈরিতে সহায়তা করেছেন তপন পালিত ও ইকবাল জাফর খন্দকার। তারা সবাই ধন্যবাদার্হ।

ইতিহাস বিভাগ — মুনতাসীর মামুন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১ জানুয়ারি, ২০১২

সূচিপত্র

ভূমিকা

'রাজাকার', 'দালাল', যোগসাজশকারী বা 'কোলাবরেটর', 'আল-বদর', 'আল-শামস' শব্দগুলির সঙ্গে ১৯৭১ সালের আগে বাঙালির কোনো পরিচয় ছিল না। দালাল শব্দটির সঙ্গে অবশ্য পরিচয় বাঙালির অনেক দিনের। তবে, ১৯৭১ সালে 'দালাল' বা 'দালালি' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিভিন্ন গ্রুপের গঠন, গ্রুপের সদস্যদের মন-মানসিকতার ভিত্তিতে উদ্ভব হয়েছে শব্দগুলির।

১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে দালাল কে? ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দালাল অধ্যাদেশ 'বাংলাদেশ কোলাবরেটরস স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস অর্ডার ১৯৭২' জারি করা হয়। এতে দালাল বা যোগসাজশকারী বা কোলাবরেটরদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে—

"১. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে বেআইনি দখল টিকিয়ে রাখার জন্য সাহায্য করা, সহযোগিতা বা সমর্থন করা।

২. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখলদার পাকবাহিনীকে বস্তুগত সহযোগিতা প্রদান বা কোনো কথা, চুক্তি ও কার্যাবলীর মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করা।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের চেষ্টা করা।

৪. মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৫. পাকবাহিনীর অনুকূলে কোনো বিবৃতি প্রদান বা প্রচারণায় অংশ নেয়া এবং পাকবাহিনীর কোনো প্রতিনিধি, দল বা কমিটির সদস্য হওয়া। হানাদারদের আয়োজিত উপনির্বাচনে অংশ নেয়া।"

উল্লিখিত সমস্ত গ্রুপই এর আওতায় পড়ে। সে অর্থে রাজাকার, কোলাবরেটর, আল-বদর বা পাকিস্তানপন্থী—সবাইকেই দালাল বলা হয়।

রাজাকার বাহিনী বা রাজাকারদের সংগঠন করেছিলো তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালে জুন মাসে রাজাকার অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। পূর্বতন আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে এ দল গঠিত হয়। কিন্তু পরে বিভিন্ন শ্রেণীর পাকিস্তানপন্থীরা এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা ছিল সশস্ত্র। হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। জেনারেল নিয়াজী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন যে, রাজাকার বাহিনীর তিনিই স্রষ্টা। তারা যথেষ্ঠ খেদমত করেছে পাকিস্তানি বাহিনীকে, যে কারণে তার বইটি তিনি তাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করেছেন।

আল-বদররা ছিল ডেথ স্কোয়াড। রাজাকার বাহিনীর পরপরই এটি গঠিত হয়। তবে, রাজাকার অধ্যাদেশের মতো কোনো আইনগত বিধান এর ভিত্তি নয়। কিন্তু, পাকিস্তানি বাহিনীর প্রেরণায় এরা সংগঠিত হয় এবং হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল গভীর। আল-বদর বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ হানাদার বাহিনীই যুগিয়েছে। রাও ফরমান আলির নোটে আল-বদরদের উল্লেখ আছে। অবশ্য, সরকারিভাবে পাকিস্তানি বাহিনী তা অস্বীকার করেছে। আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন বর্তমান জামায়াত ইসলামের নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ৭ নভেম্বর ১৯৭১ সালে তারা 'আল-বদর দিবস' পালন করে। ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে নিজামী 'দৈনিক সংগ্রাম'-এ আলবদর বাহিনী সম্পর্কে লেখেন—

" আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনার সহযোগিতায় এদেশের ইসলাম প্রিয় তরুণ ছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল-বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তিন শত তের জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের যেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আল-বদরের তরুণ মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ, সেই সর্বগুণাবলী আমরা দেখতে পাব।"

"পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আল-বদরের যুবকেরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম। তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।"

রাজাকারদের সঙ্গে আল-বদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে, লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে। অনেকে যুদ্ধকালীন দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার

হয়েছে, কিন্তু, আল-বদরদের লক্ষ্য ছিল স্থির। প্রকৃতিতে তারা ছিল অতীব হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণভাবে নিকেশ করে দিতে চেয়েছে। কারণ, তারা অনুধাবন করেছিলো, যে ধরনের শাসন তারা করতে চায়, বুদ্ধিজীবীরা হয়ে উঠবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক। মুক্তিযুদ্ধ তো ছিল একটি আদর্শগত লড়াইও। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল বাংলাদেশ তত্ত্বে বিশ্বাসী যা পরে প্রতিফলিত হয়েছিলো ১৯৭২ সালের সংবিধানে। দালালরা ছিল পাকিস্তান তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী তাদেরও বিভিন্ন পর্যায় ছিল। রাজাকারদের মন-মানসিকতা বুঝতে হলে পাকিস্তান তত্ত্ব বা প্রত্যয় এবং এর বিভিন্ন পর্যায়ের খানিকটা ব্যাখ্যা দরকার। তা হলে বুঝতে পারব, কারা দালালি করেছে, কেন করেছে।

বাকি রইল আল-শামস। এরা আল-বদর ধরনেরই আরেকটি স্কোয়াড। হত্যাই ছিল যাদের মূল লক্ষ্য।

২

এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধ কাজ করেছে সেই ষষ্ঠ শতক থেকেই। ১৯৪৭-এর আগে এই আঞ্চলিকতা-বোধ রূপান্তরিত হতে থাকে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বাঙালি হলেও আগে মুসলমান হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিলো। গত শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিলো। সম্প্রদায় হিসেবে সে ছিল অধস্তন। একজন বর্ণহিন্দু একজন শূদ্রের সঙ্গে যে ব্যবহার করে একজন মুসলমানের সঙ্গেও সে ব্যবহারে কোনো তারতম্য ছিল না।

আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন একটি প্রবন্ধে বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"মুসলমানদের এই পৃথক পরিচয় দাবি বাহ্যত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির বলে প্রতীয়মান হলেও মূলতঃ তা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক সমাজ-পরিবেশে একটি প্রান্তিকীকৃত (marginalised) অর্থাৎ ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এর ফলে, উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জনসংখ্যার অবস্থানগত বাস্তবতা এখানকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, যেখানে হিন্দুরা ছিল প্রায় সকল সুযোগ সুবিধার অধিকারী এবং মুসলমানরা ছিল ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়েছিলো। মুসলিম লীগ ছিল নেতৃত্বে। কিন্তু সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিতে

বাঙালি মুসলিম লীগ নেতারা ছিল অধস্তন। অন্যদিকে, বাঙালি হিন্দুদের দেশত্যাগ বেশ একটা বড়সংখ্যক বাঙালি মুসলমানকে সুযোগ করে দিয়েছিলো সম্পদের ভিত্তি গড়ার। রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল যাদের সুবিধাটি তারাই পেয়েছিলো। এভাবে আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো কায়েমি স্বার্থ। তবে, পাকিস্তানি আদর্শকে সামনে রেখে অর্থাৎ ধর্মকে ব্যবহার করে 'ইসলামপন্থী' বেশ কিছু দলের সৃষ্টি হয়, যেমন—জামায়াত ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি। মুসলিম লীগের সঙ্গে এদের লড়াইটা ছিল আদর্শ থেকে ক্ষমতা করায়ত্তের।

এর বিরুদ্ধে সংস্কৃতির প্রশ্নেই দ্বন্দ্বটি প্রকট হয়ে ওঠে ১৯৪৭-এর পর থেকে, যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। এর সঙ্গে যুক্ত হলো অর্থনীতি। মধ্যবিত্ত তো বটেই, সাধারণ বাঙালির প্রসারণের সুযোগই সংকুচিত হয়ে গেল। ফলে, সাংস্কৃতিক সত্তায় স্বাধীনতা ও প্রসারণের দাবিতে এগিয়ে এল পাকিস্তান কাঠামোর ভেতরেই অন্যান্য দল, যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ প্রধান।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সবসময় ইসলামকেই শোষণ ও কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। শাসকদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হলেই তা দেখা হতো ইসলামদ্রোহ হিসেবে। সমীকরণটি ছিল এরকম—ইসলামের বিরোধিতা মানে ভারতকে সমর্থন। ইসলামের প্রতীক পাকিস্তান, হিন্দুত্বের প্রতীক ভারত। পাকিস্তানি শাসকদের বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে হিন্দুত্ব সমর্থন। কেন্দ্রের অধস্তন বাঙালি সহযোগীরাও তা বিশ্বাস করত এবং প্রচার করত (যেমন মুসলিম লীগ, জামায়াত)। অধস্তন হলেও তারা তৃপ্তি পেত এই ভেবে যে, তারাও ক্ষমতার সহযোগী, কখনও কখনও অংশীদার এবং সে সুযোগে অর্থনৈতিক উপায়েরও সুবিধাভোগী। তবে, তাদের সবাই অর্থনৈতিক সুবিধার অংশীদার ছিল তা নয়, কিন্তু মনোজগতে যে আধিপত্য সৃষ্টি করেছিল দল তা ভাঙা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর পাকিস্তান প্রত্যয়ে নতুন কিছু উপাদান যুক্ত হলো। ধর্ম ছাড়াও শাসনের উপাদান হিসেবে যুক্ত হলো আমলা, বিশেষ করে সামরিক আমলাতন্ত্রের আধিপত্য। এর অর্থ, আমলাতন্ত্র, বিশেষ করে সামরিক আমলাতন্ত্র কর্তৃক সিভিলসমাজ ও রাজনীতিবিদদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, অভ্যন্তরীণ লুটের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ (বিশেষ করে পাকিস্তানবিরোধী) এ আদর্শ, আরো অনেক বাঙালিকে যুক্ত করতে পেরেছিল শাসকদের সঙ্গে।

এই সামগ্রিক বঞ্চনার আবেগ পাকিস্তানের পরিসরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মনে সেই পুরনো আঞ্চলিকতার রেশ ফিরিয়ে আনে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ একটি একক যা বাংলাদেশ। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা বা স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা তারই প্রতিফলন। ছয় দফা প্রত্যাখ্যাত হলে সৃষ্টি করা হয় 'পাকিস্তান'-এর বিপরীতে

সোনার বাংলা মিথ। আঞ্চলিকতা-বোধ উত্তরিত হয় জাতীয়তাবাদে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সোনার বাংলার স্বপ্ন মেনে নিতে থাকে। প্রশ্ন ওঠে সোনার বাংলা শ্মশান কেন? লিখেছেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর—"এভাবে পুনর্নির্মিত, পুনর্গঠিত হয়েছে ইতিহাসের দিক থেকে মৌল এবং স্থায়ী এক প্রতিরোধ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের মধ্যে। সেনার বাংলার এই নির্মাণের ফলে পাকিস্তানের কেবল কথা বলার অধিকার আছে এবং পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ কেবল নীরব, স্তব্ধ, মৌন, এই ধারণা যায় বদলে। এটি বদলে দেয় পরিস্থিতি এবং সাব অলটার্ন বাঙালিদের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করে দ্বৈরথের সম্মুখীন হয়ে, নিশ্চিতভাবেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস তত্ত্বের ভিত্তিতে।"

শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেয়। মানসিকভাবে বাঙালি প্রস্তুত হয়ে ওঠে দ্বৈরথের জন্য। অন্যদিকে, ১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোজগতে পরিবর্তন আসা শুরু করলেও পাকিস্তান আদর্শের ধ্বজাধারীরা তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। কারণ, তাদের ধারণা ছিল মনোজগতে এবং কায়েমি স্বার্থ কেন্দ্রগুলিতে তাদের আধিপত্য কেউ ভাঙতে পারবে না, তা অটুট।

৩

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। পাকিস্তান আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে বাংলাদেশ আদর্শ। পাকিস্তান আদর্শ যারা অটুট রাখতে চেয়েছিল তারা গুরুত্ব দেয় পেশিশক্তির ওপর। পরিণামে শুরু হয় তাদের ভাষায় 'গৃহযুদ্ধ'। বাংলাদেশ আদর্শের পতাকাবাহীদের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তান আদর্শবাদীদের জন্য বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে যাঁরা নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা মানসিক কষ্টের শিকার হলেও নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তান আদর্শের বিপর্যয় হিসেবেই দেখেছিলেন। কারণ, তাঁদের কাছে কখনও মনে হয়নি বাঙালি পরিচয়টি প্রথম, পাকিস্তানি পরিচয় আসে তার পরে।

রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা ফিরতে চায়নি। কারণ, পাকিস্তান আদর্শ ও কেন্দ্রের সেনাবাহিনীর শক্তি তাদের কাছে ছিল অজেয়। তাদের মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের আদর্শ জয়ী হলে তাদের স্থান হবে বিপন্ন। যে রাজনীতি করে তারা ক্ষমতার অংশীদার বা কায়েমি স্বার্থের অংশীদার হয়েছিলো সেটি থাকবে না। নতুন বাংলাদেশে তাদের স্থান থাকবে না। এরচেয়ে পাকিস্তানে অধস্তন হিসেবে ক্ষমতার সহযোগী হওয়া ছিল শ্রেয়। এখানে আদর্শ বা ধর্মের প্রশ্ন

আসতে পারে। কিন্তু সেটি গৌণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কি মুসলমান ছিল না? বা ইসলামে বিশ্বাস করত না? তবে, ধর্মটিকে ঢাল হিসেবে রাখা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। তারা যা করেছে তা কি ইসলামি আদর্শে অনুমোদিত? ফলে, অস্তিত্বরক্ষার জন্য তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে যা করার করেছে। ড. সাজ্জাদ হোসায়েনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সাধারণ আল-বদরের মতো অস্ত্রহাতে ঘোরা। কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক। ফলে, যার যার অবস্থান থেকে সে সে কাজ করে গেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানি দালালদের, দালালদের মধ্যে অবস্থাগত কারণে আবার বিভিন্ন গ্রুপের। এর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও ফ্যাসিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে জামায়াত ইসলাম ও তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রসংঘ। পাকিস্তানের অ্যাকাডেমিশিয়ান আব্বাস রশীদ 'পাকিস্তান মতাদর্শের পরিধি' শীর্ষক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"উলেমাগোষ্ঠীর নিকট আইউব খানের নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনী এবং সনাতনপন্থী সংগঠনের মাঝে অসম হলেও পারস্পরিক ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে, সনাতনপন্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে অগঠিত, অসংঘবদ্ধ উলেমাগোষ্ঠী নয় বরং তাদের স্থান ইতিমধ্যে দখল করে নেয় সুসংগঠিত জামাত-ই ইসলামী। জামাত-ই ইসলামীর নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞকে কেবল সমর্থনই করেনি, তাদের কর্মী ও সদস্যরা শান্তি কমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সামরিক বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট এই শান্তিবাহিনীর দায়িত্ব ছিল বিদ্রোহ দমনে সামরিক কর্মকর্তাদের সহায়তা করা। আদর্শগত পর্যায়েও জামাত-ই ইসলামীর সমর্থন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ সামরিক বাহিনী স্বাগত জানিয়েছিল সর্বান্তঃকরণে।" তাই আমরা দেখি, আল-বদর ও আল-শামসদের মধ্যে জামায়াতের কর্মীই বেশি।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই দালালদের দ্বারা গঠিত হয় শান্তি কমিটি। ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১ সালের 'দৈনিক পাকিস্তানে'র সংবাদ অনুসারে "স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রচনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।" এর সদস্যরা ছিল পাকিস্তান আদর্শের অনুসারী বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এলিট, যারা অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করতে যায়নি। অন্যান্যের তুলনায় শান্তি কমিটির সদস্যরা ছিল বলা যেতে পারে 'নরমপন্থী'। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনায় বা অংশগ্রহণে তারা নিষ্ক্রিয় ছিল না অনেক ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন পেশায় বা পদে থেকে এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে যারা হানাদারদের সহযোগিতা করেছে সেই সময়, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'কোলাবরেটর' হিসেবে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক অনেকেই ছিলেন।

এরপর ছিল রাজাকার। আসলে এর শুদ্ধ উচ্চারণ 'রেজাকার'—ফারসি শব্দ। 'রেজা' হল স্বেচ্ছাসেবী, 'কার' অর্থ কর্মী। এক কথায় স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় হায়দরাবাদের নিজাম অনিচ্ছুক ছিলেন ভারতের সঙ্গে মিলনে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম দেয়া হয়েছলো রেজাকার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত নেতা এ. কে. এম. ইউসুফ শব্দটি ধার করেন এবং খুলনায় রেজাকার বাহিনীর সূত্রপাত করেন। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে এই বাহিনীর সূত্রপাত যা পরে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী—"প্রশাসনিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙালি হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল, দ্বিতীয়তঃ যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং তৃতীয়তঃ গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়—এ ধরনের লোককে প্রলুব্ধকরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

রাজাকার বাহিনী যাদের নিয়েই গঠিত হোক না কেন, এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত জামায়াতে ইসলামী। আবু সাইয়িদ তাঁর 'সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আজম' গ্রন্থে জনৈক রাজাকারের পরিচয়পত্র তুলে দিয়েছেন যেখানে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—

"This is to certify that Mr. Haroon-ur-Rashid Khan, S/o. Abdul Azim Khan, 36, Purana Paltan Lane, Dacca-2 is our active worker. He is true Pakistani and dependable. He is trained Razakar. He has been issued a Rifle No-776 with ten round ammunition for self-protection.

Sd/- illegible
IN CHARGE
RAZAZKAR AND MUZAHID
JAMAT-E-ISLAM
91/92, Siddique Bazar, Dacca."

রাজাকারদের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেয়া, মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে এরাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সে কারণে, বাঙালিদের কাছে রাজাকার শব্দটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

আবু সাইয়িদ জানাচ্ছেন, আল-বদর বাহিনীর গঠনের সূত্রপাত জামালপুর শহরে। পাকিস্তান বাহিনী ২২ এপ্রিল জামালপুর দখল করে নিলে, জামালপুরের ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়। "জামালপুর মহকুমায় আল-বদর বাহিনী কর্তৃক ৬ জন মুক্তিবাহিনীকে হত্যার মাধ্যমে তাদের 'কৃতিত্ব' প্রকাশিত হয়ে পড়লে জামায়াত ইসলামী নেতৃত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, রাজাকারদের চেয়ে উন্নততর মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলার সুযোগ বর্তমান। আগস্ট মাস হতেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল-বদরে রূপান্তরিত করা হয় এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ও ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে তাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকা দিয়ে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য পাঠান হয়। তাদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে বুদ্ধিজীবী হত্যায় নামান হয়।"

২৫ নভেম্বর ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। জানাচ্ছেন সাইয়িদ, "এই পরিষদে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের 'চীফ একসিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) আফরাফুজ্জামান সহ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খুনী আল-বদর কমান্ডাররা অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মসলিশের শুরার সদস্য সামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমটির সদস্যরা ছিল—

১. মোস্তফা শওকত ইমরান। ২. নূর মোহাম্মদ মল্লিক। ৩. এ. কে. মোহাম্মদ আলী। ৪. আবু মোঃ জাহাঙ্গীর। ৫. আশরাফুজ্জামান। ৬. আ.শ.ম. রুহুল কুদ্দুস। ৭. সর্দার আবদুস সালাম।"

আল-বদরদের কার্যকলাপ সুবিদিত। এ বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এভাবে বাংলাদেশ আদর্শের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, তাদের সৃষ্ট বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে।

৪

১৯৭১ সালে তো বটেই, তারপর তিন দশক পর্যন্ত, এদেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কীভাবে কাজ করে বা মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে সে ব্যাপারে গভীরভাবে কেউ চিন্তা করেছেন বলে জানি না।

আগেই উল্লেখ করেছি মুক্তিযুদ্ধের বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা স্বায়ত্বশাসনেরও বিরোধিতা করেছেন অনেকে ১৯৭১ সালের আগে। ঐ বিরোধিতা, যুক্তির খাতিরে অগ্রহণযোগ্য এমন বলা যাবে না। কিন্তু, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর এবং স্বাধীনতার পর এ যুক্তি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সংবিধানের প্রথম পাতাতেই লেখা আছে—

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের (সংশোধিত পাঠ) মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।"

এরপর স্বাধীনতাসংক্রান্ত কোনো বিষয় আদালতের এখতিয়ারে পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু, বাংলাদেশ যেহেতু পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ সেহেতু এখানে এর উল্টোটাই ঘটেছে। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই স্বাধীনতাপক্ষের ও বিপক্ষের শক্তি আছে। এ প্রশ্ন অবশ্যই অনেকে করতে পারেন যে, স্বাধীনতালাভের পর একটি দেশে আবার স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি হয় কীভাবে? পৃথিবীতে, এদেশেই একমাত্র সরকার ও বিরোধীদল একই সঙ্গে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির সঙ্গে নমনীয় ব্যবহার করে। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই স্বাধীনতার বিপক্ষের পত্রিকাসমূহ অবাধে প্রকাশিত হয় এবং স্বাধীনতার বিপক্ষীয়রা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্‌গার করে যেতে পারছে। আলোচিত গ্রন্থসমূহ এর একটি উদাহরণ মাত্র।

শুধু তাই নয়, প্রাক্‌-মুক্তিযুদ্ধ পর্বের পাকিস্তান প্রত্যয়ের বিভিন্ন উপাদান আবার যুক্ত হচ্ছে রাজনীতিতে। বাংলাদেশ আদর্শের বিপরীতে সে বিষয়গুলি তুলে ধরা হচ্ছে, যা দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। এই আদর্শের নাম দেয়া যেতে পারে পাক-বাংলা আদর্শ। এ আদর্শের যারা ধারক তাদের বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু, বাংলাদেশ আদর্শ তাদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না হীনম্মন্যতার কারণে। কায়েমি স্বার্থ যা সৃষ্টি হয়েছে গত ত্রিশ বছরে তা বজায় রাখতে গেলেও পাক-বাংলা আদর্শ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর প্রধান উপাদান পাকিস্তানে বিশ্বাস, ভারতকে ইহজগতের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা কিন্তু ভারতকে গোপনে সুযোগ দেয়া, ইসলাম ধর্মকে ক্ষমতা দখলের স্বার্থে ব্যবহার করা, সামরিক আধিপত্যে বিশ্বাস ইত্যাদি। এই আদর্শের স্রষ্টা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রুরা। এদের পুনর্বাসিত করে জিয়াউর রহমান এই আদর্শের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন, পরে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ তাঁকে অনুসরণ করেন। এঁরা এসব উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করেন কাকুল কালচার। কাকুলে যৌবনে তাঁরা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন এবং তা মগজে গেঁথে গিয়েছিলো। সেটিরও আবার ক্লোন তৈরিতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। পাকিস্তান আদর্শের স্রষ্টাদের অনেকের মৃত্যু হলেও তাদের দলে নতুন ক্লোন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ক্লোনরা যে সবাই সে আদর্শে বিশ্বাসী তা নয়। তারা বিশ্বাসী কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখা, স্বার্থের নতুন মানচিত্র তৈরি করায়।

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানি অ্যাকাডেমিশিয়ান পারভেজ আলী হুদোভয় ও আবদুল হামিদ নায়ার 'পাকিস্তানের ইতিহাস পুনর্লিখন' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—"দেশ বিভাগের ৩০ বছর পর পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পুনর্জাগরণে এটাই প্রমাণ করে যে ধর্মীয় কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নয়, রাজনৈতিক মতলববাজিই এখানে

বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের চিরস্থায়ী সামরিকীকরণের জন্য চাই একজন চিরস্থায়ী শত্রু। অনেক কারণেই পাকিস্তানের অন্যান্য প্রতিবেশীরা এই কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। অপরদিকে ভারত ও পাকিস্তানের শাসকবর্গ এই পারস্পরিক শত্রুতা ও উত্তেজনাকে একটি অপরিহার্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখে আসছে।"

এখানে সৃষ্ট পাকি ক্লোনরা ঠিক একই কাজ করছে কি না সচেতন নাগরিক মাত্রই তা বিচার করতে পারবেন। গত বিশ বছরে এদেশে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতিই এর প্রমাণ।

এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হলে হয়তো কিছু জানা যেত। কিন্তু হয়নি এবং তথ্যের স্বল্পতাও লক্ষণীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কার্যকলাপের বিবরণ সংগ্রহ করা এখন প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরাই এগুলি নষ্ট করে ফেলেছে বা ফেলছে। মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ বছর পর, এ. এস. এম. শামসুল আরেফিন 'রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা' প্রণয়ন করেছেন যার কয়েকটি খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যাদের আমরা স্বাধীনতা বিরোধী বা রাজাকার বলি তাদের কেউ ছিল কোলাবরেটর, কেউ আল-বদর বা অন্যকিছু। কিন্তু আগেই বলেছি কাগজপত্রে বিভিন্ন বিভাগ থাকলেও মূলত এরা সব একই লক্ষ্যের অনুসারী। এই বিভাজন বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করতে পারে মাঝে মাঝে। আরেফিন নিজেও এ সমস্যায় পড়েছিলেন তাঁর উপর্যুক্ত গ্রন্থ লিখতে গিয়ে। লিখেছেন তিনি—

"বিভিন্ন পরিচয়ে এদের ভাগে ভাগে না দেখিয়ে গড়পরতা সবাইকে 'দালাল' পরিচয়ে চিহ্নিত করার প্রয়াসের পেছনে একটা কারণও রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ যেটি তা হল, যে সব সরকারী কাগজের আলোকে এই তালিকাটি প্রস্তুত হয়েছে সেই সবের ছক অভিন্ন ছিল না। কোথাও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অপরাধের কারণ সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কোথাও শুধু বলা হয়েছে কোলাবরেটর অথবা দালাল অথবা পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী। কোন কোন তালিকায় তাদের পরিচয় এরূপও রয়েছে যে, "Arrested Razakars, All-Badars and Mujahids" অথবা, "Arrested on as they were either members of Razakars, Al-Badars, Al-Shams or Mujahid organisation and also supported the Pak Army in killing innocent public, looting, arson etc."

এ পরিপ্রেক্ষিতে এক কথায়, মোটাদাগে স্বাধীনতাবিরোধীদের আমি 'রাজাকার' নামে অভিহিত করেছি। রাজাকার, আগেই উল্লেখ করেছি, যারা বাংলাদেশে ছিল এবং মানুষ এই নাম ও তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত। জাহানারা ইমামের 'ঘাতক দালাল নির্মূল' আন্দোলন শুরু হলে রাজাকার নামটি আরো পরিচিত হয়ে সাধারণের ভাষ্যে চলে আসে। হুমায়ূন আহমেদের একটি

নাটকের সংলাপ ছিল—'তুই রাজাকার'। এসব কারণে, স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি সে আল-বদরই হোক বা দালালই হোক পরিচিত হয়ে ওঠে রাজাকার হিসেবে। জামায়াত ইসলাম, বাংলাদেশের আমীর গোলাম আযম অবশ্য সম্প্রতি বলেছেন, তাঁরা 'রাজাকার' ছিলেন না, ছিলেন 'রেজাকার'। হতে পারে রেজাকার শুদ্ধ, কিন্তু মানুষের কাছে অশুদ্ধ রাজাকারই পরিচিত। তাই আমিও রেজাকার-কে রাজাকারই লিখলাম।

৫

রাজাকার, আলবদর বা দালালদের নিয়ে যে বিস্তারিত আলোচনা আগে হয়নি তা নয়, হয়েছে, তবে শান্তিকমিটি নিয়ে আলোচনা একেবারেই হয়নি। কারণ, সমাজের একটি বড় অংশের ধারণা, এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না হওয়ায়, সেই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে যে, শান্তিকমিটি অশান্তির কিছু করেনি। হানাদার বাহিনীর সহযোগী অনেক কিছু সৃষ্টি করা হয়েছিল, শান্তিকমিটি তার মধ্যে একটি। হ্যা, তারা হানাদার বাহিনী সৃষ্ট বটে কিন্তু তারা মানুষজনের তেমন ক্ষতি করেনি। শুধু তাই নয়, অনেকে বাধ্য হয়েও শান্তিকমিটি করেছে। শুধু তাই নয় মুক্তিযোদ্ধাদেরও সহায়তা করেছে।

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হানাদারদের সহযোগী হিসেবে আলবদর, রাজাকাররা যা করেছে শান্তিকমিটির সদস্যরাও অনেক ক্ষেত্রে তাই করেছে। অনেকে হয় নিষ্ক্রিয় ছিল কিন্তু মতাদর্শগতভাবে তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে ছিল। হ্যা, কেউ কেউ বাধ্য হয়ে শান্তিকমিটিতে যোগ দিয়েছেন, দু'একজনকে হয়ত রক্ষাও করেছেন কিন্তু সে সংখ্যা নগন্য। শান্তিকমিটির সদস্যরা রাজাকারদের সঙ্গে মিলে হানাদারদের চেনা অচেনা লক্ষ্যবস্তুতে পৌছে দিয়েছে। হত্যা, লুট করেছে। বিশেষ করে শান্তিকমিটির অবাঙালি সদস্যরা হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের মতো আচরণ করেছে।

হানাদার বাহিনীর অন্যান্য সহযোগী গ্রুপগুলির মধ্যে শান্তিকমিটিতেও যারা যোগ দিয়েছিলেন আদর্শগতভাবে তারা পাকিস্তান প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। এই পাকিস্তান প্রত্যয়ে বিশ্বাসের অর্থ, হানাদারদের সহায়তা করে, ভারতকে প্রধান শত্রু এবং হিন্দুদের জাতীয় ঐক্যের প্রতি ক্ষতিকর মনে করা। আওয়ামী লীগ বা ধারার অনুসারীরাও ভারতের দালাল ও হিন্দুদের সহযোগী। শান্তিকমিটির প্রতিটি সভায়ই এ বিষয়গুলিই উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং পাকিস্তান রক্ষার জন্য প্রয়োজন আওয়ামী লীগ/হিন্দু/বামপন্থীদের নিকেশ করা। তাদের সহায়সম্পত্তি 'গনিমতের মাল' হিসেবে বিবেচনা করা ও হানাদারদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

যেসব দলের সমর্থকরা রাজাকার বা আলবদর হয়েছিল সেসব দলের সমর্থকরাই শান্তিকমিটিসমূহ গঠন করেছিলেন। অর্থাৎ মুসলিম লিগ, জামায়াত,

পিডিপি প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির যারা নেতা বা নীতি নির্ধারক ছিলেন তারা ছিলেন এসব দলের প্রধান। যেমন, খাজা খয়েরউদ্দিন ছিলেন মুসলিম লিগের, গোলাম আজম জামায়াতে ইসলামের, ফরিদ আহমদ পিডিপির প্রভৃতি। শান্তি কমিটি ছিল বাঙালিদের দমনে হানাদার বাহিনীর আরেকটি ফ্রন্ট। আরো উল্লেখ্য, যাদের আমরা মনে করি বাঙালি বিরোধী চক্রের নীতি নির্ধারক, প্রধান বা যুদ্ধাপরাধী তাদের অনেকে কিন্তু জড়িত ছিলেন শান্তিকমিটির সঙ্গেই।

বাঙালি বিরোধীদের নিয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টির সম্মুখীন হতে হয় তাহলো তথ্যের নিতান্ত অভাব। রাজাকাররা পরাজিত হওয়ার পরপরই তাদের অপকর্ম সুকৌশলে ঢাকতে চেয়েছে। প্রমাণাদি নষ্ট করেছে। জিয়াউর রহমান, হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ও খালেদা জিয়া তাদের পুনর্বাসন করা শুধু নয়, ক্ষমতার অংশীদার করার কারণেও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাদের সমস্ত অপকর্ম চাপা দেয়ার। সে কারণেই তাদের সম্পর্কে গবেষণা কম।

আমাকেও একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও যা পেয়েছি তা দিয়েই বইয়ের নির্মাণ কাজ শুরু করেছি।

বইটি কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে শান্তিকমিটির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ, দ্বিতীয় পর্বে, তাদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ; অবশ্য দু'টি পর্ব একেবারে আলাদা করে বিচার করা যাবে না। তৃতীয় পর্বে শান্তিকমিটির কয়েকজন সদস্য যারা অত্মজীবনী লিখেছেন তাদের নিয়ে কেস স্টাডি। চতুর্থ পর্বে কমিটির সদস্য যাদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ তথ্য পাওয়া গেছে তাদের বিবরণ ও তালিকা।

পঞ্চম পর্বে শান্তিকমিটির তালিকা। ষষ্ঠ পর্বে শান্তিকমিটি সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরাখবর। গত তিন দশকে বিভিন্ন সময় সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে নোট নিয়েছিলাম। এখন সে সব পত্রিকা পাওয়া যায় না। নোটও অনেক হারিয়ে গেছে। তবে এর পরিপূরক হিসেবে সম্প্রতি দু'টি বই থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য নিয়েছি। বই দু'টি হলো–ইফতেখার আমিনের *একাত্তরের দালালনামা* ও আলী আকবর টাবীর *দৈনিক সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা*। সপ্তম পর্বে গ্রন্থে উল্লিখিত শান্তিকমিটির সদস্যদের একটি তালিকা।



প্রথম পর্ব

শান্তিকমিটির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ

৬

পঁচিশ মার্চ মধ্যরাতে বা ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। প্রায় একই সঙ্গে বা তার একটু আগে পাকিস্তান বাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসের কাজ শুরু করে। স্বাধীনতা বিরোধী বা দালালদের সঙ্গে হানাদার বাহিনীর নীতি নির্ধারকদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। পাকিস্তানি ট্যাংকের গোলা নিক্ষেপ তাদের মনে দারুণ উল্লাসের সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকদের মতো তারাও মনে করতেন, কয়েকহাজার হত্যার পর বাঙালিরা স্তব্ধ হয়ে যাবে। তখন পাকিস্তানিদের সহযোগী হিসেবে তারাই ক্ষমতায় আসবেন। উল্লেখ্য এদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া, বাকী কেউ কখনও নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি।

পাকিস্তানি বা তাদের সহযোগী দালালরা যা ভেবেছিল তা কিন্তু হয়নি। গণহত্যার খবর চাপা দেয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, কয়েকদিনের মধ্যে সে খবর ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা বিশ্বে। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক টিক্কা খান আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন বালুচিস্তানের কসাই হিসেবে। ফলে, তার পক্ষে গণহত্যা সম্ভব এই ধারণা বদ্ধমূল হলো। নিজের বা পাকিস্তানের ইমেজ ফিরিয়ে আনার জন্য দরকার ছিল কিছু কর্মতৎপরতার। তাদের ধারণা হলো, বাঙালি রাজনীতিবিদরা তাদের সঙ্গে আছেন এধারণা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের দিয়েই বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দক্ষিণপন্থি বাঙালি রাজনীতিবিদরাও তাই চাচ্ছিলেন। কারণ, ক্ষমতায় যাওযার জন্য এই যোগাযোগকে ভেবেছিলেন তারা প্রথম পদক্ষেপ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ১২ জন বাঙালি রাজনীতিবিদ টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। টিক্কা খানও আনন্দে 'রাজি' হলেন। ৪ এপ্রিল ১২ জন আওয়ামী লীগ বিরোধী নেতা বঙ্গভবনে বা সাবেক গভর্নর হাউসে গেলেন টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করতে। নেতৃত্ব দিলেন পিডিপি প্রধান নুরুল আমিন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন গোলাম আজম, ফরিদ আহমদ, খাজা খয়ের উদ্দিন, এ.কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান, আবদুল মান্নান প্রমুখ।

আলাপ আলোচনার পর প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে "অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভিত্তিহীন ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়।"[১]

টিক্কা খান এ প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করে "দুস্কৃতকারী ও সমাজ বিরোধীদের [অর্থাৎ যারা বাংলাদেশ চায়] আশ্রয় না দেওয়া এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে এদের সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার"[২] আহবান জানান। শুধু তাই নয় তাদের "শুধু বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় ফলপ্রসূ কাজ করতে নির্দেশ দেন।"[৩]

পাকিস্তানিরা চেয়েছিল, তাদের পক্ষের সবাই একই প্ল্যাটফরমে কাজ করবে। কিন্তু বাঙালি বিরোধী অনেকে এক সঙ্গে কাজ করতে রাজি ছিলেন না। বিশেষ করে দলের ফরিদ আহমদ ও নুরুজ্জামান, গোলাম আজম বা জামায়াতের সঙ্গে একই প্ল্যাটফরমে এসে কাজ করতে রাজি ছিলেন না। ফলে ৬ এপ্রিল গোলাম আজম আবার টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রামে* সামরিক বাহিনীর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়—

"পূর্ব পাকিস্তানের আরো কয়েকজন নেতা গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা 'গ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ সমগ্র প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এক হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে, সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আজম, জামায়াত ওলামায়ে ইসলামির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি পীর মহসীন উদ্দিন আহমেদ এবং একজন নেতৃস্থানীয় এডভোকেট এ-কে সাদিক [হবে সাদি] পৃথক পৃথকভাবে জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে, প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ ভারতের দূরভিসন্ধিকে বানচাল করার জন্য সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করবেন।"[৪]

একই দিন পত্রিকায় 'স্বাভাবিক জীবনযাত্রা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়তে শান্তিকমিটি গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়—

---

১. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ৫.৪.১৯৭১।
২. *ঐ*।
৩. *ঐ*।
৪. আলী আকবর টাবী, *দৈনিক সংগ্রাম : মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা*, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২২।

"বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের সমন্বয়ে শান্তিকমিটি গঠন এ ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে। এ ধরনের শান্তিকমিটি যেমন দুস্কৃতিকারীদের হাত থেকে শান্তিকামী নাগরিকদের জান-মাল রক্ষার কাজে সহায়তা করতে পারবে। অপরদিকে তেমন দেশ ও জাতির স্বার্থবিরোধী যে কোনো মহলের যেকোনো প্রচেষ্টার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। সুতরাং প্রতিটি বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিককে এ ব্যাপারে তাদের সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করা উচিত।"[৫]

শান্তিকমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের পক্ষে যারা আছেন তাদের নিধন করা। পরের দিন জামায়াত নেতা গোলাম আজম, নুরুজ্জামান ও গোলাম সরোয়ারের একটি বিবৃতিই তা প্রমাণ করে। দীর্ঘ বিবৃতির শেষে তারা উল্লেখ করেন—

"ভারতীয়দের জানা উচিত। এ দেশের জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কখনো ত্রাণকর্তা হিসেবে মনে করেন না। পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কোন স্থানে দেখামাত্র খতম করে দেবে বলে তারা দৃঢ় আস্থা পোষণ করেন।"[৬]

টিক্কা খান ৯ এপ্রিল প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার পরপরই ১৪০ সদস্যের 'ঢাকা নাগরিক শান্তিকমিটি' গঠিত হয়। তবে, এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় ১১ এপ্রিল—

"ঢাকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গতকাল শনিবার ১৪০ সদস্যের একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করা হয়েছে। ...

গতকাল কমিটির বৈঠকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ এবং পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা করা হয়। ...

বৈঠকে আরও বলা হয়, ভারত পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে আগুন নিয়ে খেলা করছে। ...

পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়েরুদ্দিনকে কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। কমিটিতে যে সকল নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তারা হলেন, জনাব একিউএম শফিকুল ইসলাম, মৌলভী ফরিদ আহম্মদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, পীর মোহসেন উদ্দিন, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব এএসএম সোলায়মান, জনাব আবুল কাসেম এবং জনাব আতাউল হক খান প্রমুখ।

নাগরিক শান্তিকমিটি আগামী মঙ্গলবার ঢাকায় এক মিছিল বের করবে। মিছিলটি ঢাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করবে।"[৭]

---

৫. ঐ, পৃ. ২৩।
৬. ঐ, পৃ. ২৬।
৭. ঐ, পৃ. ২৮-২৯।

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির ১৪০ জনের তালিকা সংগ্রহ করা যায়নি। তবে, বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে ৩৪ জনের নাম পাওয়া গেছে। তারা হলেন—

মুসলিম লিগ নেতা খাজা খয়েরউদ্দিন, জামায়াতের সভাপতি গোলাম আযম, অ্যাডভোকেট একিউএম শফিকুল ইসলাম, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল উম্মাহর নেতা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, মুসলিম লিগ নেতা আব্দুল জব্বার খদ্দর, মাহমুদ আলী, ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া, এমএকে রফিকুল ইসলাম, আবুল কাসেম, জামায়াত নেতা গোলাম সারওয়ার, সৈয়দ আজিজুল হক ওরফে নান্না মিয়া, এএসএম সোলায়মান, পীর মোহসেন উদ্দিন ওরফে দুদুমিয়া, শফিকুর রহমান, মেজর (অব.) আফসারউদ্দিন, সৈয়দ মোহসেন আলী, ফজলুল হক চৌধুরী, মুসলিম লিগ নেতা মোঃ সিরাজুদ্দিন, অ্যাডভোকেট এটি সাদি, অ্যাডভোকেট আতাউল হক খান, মকবুলুর রহমান, নেজামে ইসলামের মকবুলুর রহমান, জামায়াতের রুহুল কুদ্দুস, নুরুজ্জামান, মিয়া মফিদুল হক, অ্যাডভোকেট আবু মালেক, অ্যাডভোকেট আবদুল নাঈম, সিদ্দিক আহমদ, আবদুল মতিন, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন, তোযায়া বিন হাবিব, হাকিম ইরতিজায়ুর রহমান আখুনজাদা, চাকমা প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় ও মুসলিম লিগ নেতা ফয়েজ বক্স।[৮]

৭

১০ এপ্রিলই বিরোধ বেঁধে যায় শান্তিকমিটির নেতাদের মধ্যে। ফরিদ আহমদ, ইসলামিক রিপাবলিক পার্টির নুরুজ্জামান প্রমুখ শান্তিকমিটিতে থাকতে অস্বীকার করেন। মনে হয় আদর্শ থেকে নয়। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খাই ছিল দ্বন্দ্বের কারণ। খুব সম্ভব ফরিদ আহমদ আহবায়ক হতে চেয়ে ছিলেন। ফরিদ আমাদের নেতৃত্বে আরেকটি কমিটি গঠিত হয় যার নাম দেয়া হয়—'পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিল'। তবে, এটির সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৩ এপ্রিল। দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটিও গঠিত হয়—

"ঢাকা, ১২ই এপ্রিল। শান্তিরক্ষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনা এবং দেশের এই অংশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় মিথ্যা প্রচারণা প্রতিহত করার উদ্দেশ্য গত শনিবার মৌলভী ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এছলামিক রিপাবলিক পার্টির সভাপতি মওলানা নূরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁহাকেই স্টিয়ারিং কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। জনাব কোরবান আলী (বার-এট-ল), জনাব ওয়াজী উল্লাহ খান, জনাব আজিজুর রহমান, জনাব

---

৮. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১১.১.১৯৭১ ও মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৯-১৮১।

মোস্তাফিজুর রহমান, কাজী ফিরোজ সিদ্দিকী, চট্টগ্রামের অ্যাডভোকেট জনাব এ, কে, এম নূরুল করিম নির্বাচিত এমপিএ (স্বতন্ত্র) জনাব মাহমুদ আলী কমিটির কার্য্যনির্বাহক সদস্য থাকিবেন। বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য আগামী ১৪ই এপ্রিল কমিটি এক বৈঠকে মিলিত হইবে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সর্বত্র আস্থার ভাব ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় বেতারের মিথ্যা প্রচারণা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটি পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিল সংগঠন করিবে।

কার্যকরীভাবে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবেলা এবং ভারতীয় প্রচারণায় কর্ণপাত না করিয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণে জনসাধারণকে উৎসাহিত করাই হইবে কাউন্সিল সমূহের অন্যতম লক্ষ্য।"[৯]

কমিটিতে এ ছাড়াও ছিলেন আবদুল মান্নান [পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান তাকে ধর্ম মন্ত্রী করেন, দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা], জুলমত আলী খান [পরবর্তীকালে বিএনপি নেতা][১০]

১২ এপ্রিল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা নাগরিক শান্তিকমিটি একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি 'টিক্কা খান' জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলি, ইসলামপুর, মিটফোর্ড, চকবাজার, আজিমপুর হয়ে নিউমার্কেট অব্দি যায়। সেদিন ছিল ঝড়ো আবহাওয়া, বৃষ্টি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেদিন গোলাম আজম, খান সবুর বা খয়ের উদ্দিনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সভার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে *দৈনিক সংগ্রাম* খবর ছেপেছিল—

"নয়াদিল্লী বেতারের ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা এবং পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্ত ক্ষেপের প্রতিবাদে এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশের উদ্দেশ্যে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা নগর শান্তিকমিটির আহ্বানে রাজধানী ঢাকার সকল শ্রেণীর জনগণ এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। শান্তিকমিটির আহ্বায়ক জনাব সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দিনের নেতৃত্বে মিছিলটি বেলা ২টা ৪০ মিনিটে বায়তুল মোকাররম থেকে বেরিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করার পর নিউমার্কেটে এসে শেষ হয়।

মিছিলের পুরোভাগে নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি জনাব একিউএম শফিকুল ইসলাম, সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য খান এ সুবর,

৯. *দৈনিক আজাদ*, ১৩.৪.১৯৭১।
১০. *একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়*, পৃ. ১৮১।

পিডিপির সহ-সভাপতি মৌলভী ফরিদ আহম্মদ ও জনাব মাহমুদ আলী, কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রধান জনাব এএসএম সোলায়মান, জনাব আব্দুল জব্বার খদ্দর, ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম প্রধান পীর মোহসেন উদ্দিন, জনাব আবুল কাসেম, সৈয়দ আজিজুল হক, ইউসুফ আলী চৌধুরী, ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রধান জনাব মতিউর রহমান নিজামী, অ্যাডভোকেট এটি সাদী, কবি বেনজীর আহমদ এবং মেজর আফসার উদ্দীন।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খান এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বৃহৎ আকারের ছবিও মিছিলে শোভা পেতে দেখা যায়।

মুসলধারে বৃষ্টিপাতকে উপেক্ষা করে 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম-জিন্দাবাদ', পাকিস্তানের উৎস কি-'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' শ্লোগানে মুখরিত সুশৃঙ্খল জনতার মিছিল নবাবপুর রোড ধরে অগ্রসর হয়। নবাবপুর রেল ক্রসিং অতিক্রম করতে মিছিলটির ৪৫ মিনিট সময় লাগে। কলেমা খচিত শত শত ব্যানার আর লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানি ঝাণ্ডা হাতে তৌহিদী জনতা দৃঢ় পদক্ষেপে আগে বাড়তে থাকে।

'মিথ্যা প্রচার-বন্ধ কর।' 'ব্রাহ্মণ্যবাদ সাম্রাজ্যবাদ-মুর্দাবাদ' শ্লোগান দিতে দিতে জাগ্রত জনতার মিছিল সিপাহী আন্দোলনের শহীদানের মিনারকে সাক্ষী রেখে সদর ঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। ...

মিছিলটির একটি ট্রাকে ভারতীয় সৈন্য ও ইন্দিরা গান্ধী সাজিয়ে তাদেরকে ধৃত অবস্থায় রাখা হয়। মিছিলে জুতার মালা পরিহিতা ইন্দিরা গান্ধীর একটি কুশ-পুত্তলিকাও বহন করা হয়।

নেতৃবৃন্দের কণ্ঠ থেকেও উৎসারিত হয় কণ্ঠে কণ্ঠে গর্জিত হয় গগণ বিদারিত শ্লোগান 'রুশ ভারত সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জিন্দাবাদ', 'আমার নেতা তোমার নেতা—বিশ্বনবী মোস্তফা', 'ভারতীয় হস্তক্ষেপ—মানব না, মানব না', 'জেগেছে জেগেছে—মুসলিম জেগেছে', 'ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার' ইত্যাদি। ..."[১১]

মিছিল শেষে, জামায়াত ইসলাম পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্য দীর্ঘ মুনাজাত করেন—

"পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম মিছিল শেষে মুনাজাত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের রক্তের ওপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাকিস্তানেও মুসলমানদেরকে রক্ত দিতে হয়েছে। তিনি আল্লাহ্‌র দরগাহে দোয়া করেন যেন

১১. আলী আকবর টাবী, *প্রাগুক্ত।*

আর রক্ত দিতে না হয়। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সত্যিকারের মুসলিম সৈনিক হিসেবে দেশ রক্ষার যোগ্যতা অর্জনের জন্য আল্লাহর দরগাহে দোয়া করেন। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্যে দোয়া করেন। সত্যিকারের মুসলমান ও পাকিস্তানি হিসেবে বেঁচে থাকার ও পাকিস্তানকে চিরদিন ইসলামের আবাসভূমি হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে দোয়া করেন।"[১২]

মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র ১৯৮৭ সালে যে গবেষণা জরিপ চালিয়ে ছিল তাতে জানা যায়, পুরনো ঢাকা, আজিমপুর দিয়ে মিছিলটি যাবার সময় বিভিন্ন বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। এবং "বেশ কিছু বাঙালিকে ধাওয়া করে হত্যা করে রাস্তার পাশে লাশ ফেলে রাখা হয়।"[১৩]

ঢাকা নাগরিক শান্তিকমিটির অফিস ছিল মগবাজারের ৫ এলিফ্যান্ট লেনে। কমিটির কাজে গতিশীলতা আনার জন্য ১৪ এপ্রিল কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ২১ সদস্যের একটি ওয়ার্কিং বা কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। তাঁরা ছিলেন, খাজা খয়েরুদ্দিন, আহ্বায়ক, একিউএম শফিকুল ইসলাম, গোলাম আযম, মাহমুদ আলী, আবদুল জব্বার খদ্দর, 'মওলানা' সিদ্দিক আহমদ, আবুল কাশেম, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), 'মওলানা' সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, আবদুল মতিন, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন, অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার, এএসএম সোলায়মান, পীর মোহসেন উদ্দীন (দুদু মিয়া), এ কে রফিকুল হোসেন, নুরুল আমিন, আতাউল হক খান, তোহাবিন হাবিব, মেজর আফসারুদ্দীন, দেওয়ান ওয়ারেসাত আলী ও হাকিম ইরতিযুর রহমান আখুনজাদা।

২১ জুন ওয়ার্কিং কমিটির তরফ থেকে শাখা কমিটিগুলির কাছে একটি নির্দেশ পাঠানো হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহে এই দলিলটি আছে। দলিলটির প্রতিচিত্র তাদের ১০০টি আলোকচিত্র সংগ্রহেও আছে। তবে ক্যাপশনে যে লেখা আছে ২১ জুন ১৯৭১ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠনের দলিল তা ভুল। নির্দেশটি ইংরেজীতে। এখানে সংক্ষেপে তার বাংলা অনুবাদ প্রদান করছি।

ওপরে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ছাপা হয়েছে প্রথম নামটি গোলাম আযমের।

ক. জেলা শহর এবং মহকুমা শান্তি কমিটির সমস্ত কার্যাবলীর বর্ণনা ও কমিটির সদস্যদের নামের তালিকার তিন কপি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। যা জানানোর জন্য এবং স্বীকৃতির জন্য সেনা কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে। এই অফিসে জেলা কমিটির নামে একটি নথি খোলা হবে এবং প্রতিদিন স্থানীয় পত্রিকায় এ সম্পর্কিত রিপোর্ট সেখানে নথিবদ্ধ হবে।

---

১২. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩.৪.১৯৭১।

১৩. *একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়।*

খ. কেন্দ্রীয় কমিটি যেভাবে গঠিত হয়েছে তা অনুসারে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের লোকদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে।

গ. কমিটির নীতি বাস্তবায়নে সাধারণ কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করতে হবে।

ঘ. এ প্রক্রিয়ায় যে সব মহকুমা ও থানা কমিটি গঠিত হয়নি সেগুলোকে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে কমিটি গঠন করতে হবে। ইউনিয়নের ব্যাপারেও তা প্রযোজ্য। কোন পর্যায়ের কমিটিতে যেন (Anti state and anti social element) অন্তর্ভুক্ত না হয়। স্থানীয় সিভিল প্রশাসনের কোন কর্মচারী যদি অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে তবে সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

ঙ. সামরিক কর্তৃপক্ষ থেকে স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষকে দেশপ্রেমীদের থেকে রাজাকার ও গ্রামরক্ষী নিযুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের রাইফেল ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করা হয় তা জানানোর জন্য স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এ কারণে শান্তি কমিটির অধীনে একটি প্রতিরক্ষা উপকমিটি গঠন করতে হবে যারা শুধু এ বিষয়টিই দেখবে।

চ. পরিত্যক্ত বাড়ি ঘর সম্পত্তি সাময়িকভাবে বরাদ্দ দেয়ার জন্য ডিসিদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চিফ সেক্রেটারি একটি নির্দেশ পাঠিয়েছেন। এ কমিটিতে স্থানীয় শান্তি কমিটির প্রতিনিধি থাকবে যার প্রধান হবে সামরিক অফিসার। এছাড়া আরও কয়েকটি নির্দেশ ছিল। যার মধ্যে বলা হয়েছিল সব শান্তি কমিটির আহ্বায়ক বা সভাপতি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছিল। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন খাজা খয়েরউদ্দিন।[১৪]

একই সঙ্গে নাগরিক শান্তিকমিটির নাম বদলে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি রাখা হয়। তবে, সারা বাংলাদেশে তা শান্তিকমিটি নামেই পরিচিত ছিল।

নাম পরিবর্তনের পর তা এবং তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করার জন্য শান্তিকমিটির ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১৬ এপ্রিল। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন কিন্তু নূরুল আমিন। কমিটির সদস্যরা তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা দেন এবং গভর্নরকে জনসাধারণের কতিপয় অসুবিধা সম্পর্কেও জানান। কিন্তু, সেই জনসাধারণ বা তাদের অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে, কমিটির কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়, এই জনসাধারণ ছিল পাকিস্তানি সমর্থকরা। পত্রিকার খবর অনুযায়ী—

---

১৪. বিস্তারিত, মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র*, ঢাকা, ২০১১।

"আলোচনা চলাকালে শান্তিকমিটির সদস্যরা গভর্ণরকে জানান যে, জনসাধারণ ভারতের হীন চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে রয়েছে।

গভর্ণর সদস্যগণকে জনসাধারণের বিভিন্ন প্রকৃত সমস্যা পর্যালোচনা ও সে সব সমাধানের উদ্দেশ্যে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

শান্তি কমিটির যে সব সদস্য গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎ করেন তাঁরা হলেন সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দীন (আহবায়ক), জনাব একিউএম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর, জনাব মোহন মিয়া, মওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আবদুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, জনাব এ.এস.এম. সুলায়মান, জনাব এ.কে.রফিকুল হোসেন, জনাব নূরুজ্জামান, জনাব আতাউল হক খান, জনাব তোহা বিন হাবিব, মেজর আফসার উদ্দিন ও হাকিম ইরতেজাউর রহমান খান।"[১৫]

এরপর কমিটি সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও বুনিয়াদ শক্তিশালী করার কাজ শুরু করে। ঢাকা শহরে তারা ৬টি থানার জন্য ২৩ জন লিঁয়াজো অফিসার নিয়োগ করে। এ ছাড়া, বিভিন্ন এলাকায় শাখা কমিটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ী স্বতস্ফূর্তভাবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সারা বাংলাদেশে কমিটি স্থাপিত হতে থাকে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিটি জানায়। বহুস্থানে ইতিপূর্বেই ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইউনিট কমিটিসমূহের কার্যকলাপ সম্পর্কে যাবতীয় খবর, ৫, এলিফ্যান্ট লেন, মগবাজার, ঢাকা ঠিকানায় কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির অফিসে প্রেরণ করতে হবে। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় অফিস ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে এবং অফিস সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট জনাব নূরুল হক মজুমদার সর্বসাধারণের সমস্যাবলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অফিসে অবস্থান করবেন।

প্রদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য প্রতিদিন শান্তি কমিটির বৈঠক হয়ে থাকে। জনসাধারণকে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাত্রার নির্বাহে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার জন্য এবং বিভিন্ন স্থানে ইউনিট শান্তি কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি বিভিন্ন জেলায় ও মহকুমায় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

কমিটির তরফ হতে তার সদস্যদের মধ্য হত লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তারা জনসাধারণের অসুবিধাদি সম্পর্কে তথ্যাদি গ্রহণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আর্মি সেক্টরের সাহায্য গ্রহণ করে ঐগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন।

---

১৫. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৭.৪.১৯৭১।

প্রতিদিন কেন্দ্রীয় অফিসে রিপোর্ট দাখেলের জন্য লিয়াজোঁ অফিসারদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

কোতোয়ালী থানা

১. জনাব আজিজ আহমেদ শাহ, আহসান মঞ্জিল, ৯৭, আহসানুল্লাহ রোড, ঢাকা। ফোন : ২৪৬৩৪০।
২. জনাব মোহাম্মদ সাকী সুলতান, ১২, কাশাইটাব, ঢাকা, ফোন ২৫১৩৫১।

লালবাগ থানা

১. আলহাজ্ব নাজির হোসেন, চেয়ারম্যান, লালবাগ ইউনিয়ন কমিটি, ৫৩, জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা, ফোন : ২৫৩৬৮১।
২. জনাব এস.এম. হাবিবুল হক, হাউস নং ৬১২, রোড নং ১৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন : অফিস ২৫০৮০৬, বাসা ২৫৪০৬৪।
৩. জনাব নোয়া আলী, অ্যাডভোকেট, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা, ফোন ২৫০২৬১।

সূত্রাপুর থানা

১. আলহাজ্ব সিরাজুদ্দীন প্রাক্তন এমপিএ, ৯১, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা, ফোন : অফিস ২৮১৩৪১, বাসা ২৮২৫৪০।
২. জনাব মাহতাবুদ্দীন খান ৫৪, আর.কে, মিশন রোড, ঢাকা, ফোন ২৪৫৩৫৪।
৩. ফজলুল হক, ১২, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, ফোন : ২৫৭৫৯৬।
৪. জনাব তমিজউদ্দিন, ৩১, জরিয়াত আলী লেন, ফোন : ২৫৭২৫৬।
৫. জনাব আবদুর রশীদ, ১৬ হাটখোলা রোড, ফোন : ২৫০৯০৯।

তেজগাঁও থানা

১. জনাব ইকবাল ইদরিস, ৭৫, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকা, ফোন অফিস ২৫১১০৭, বাসা ৩১০৯৮০।
২. জনাব মাহবুবুর রহমান, গুরহা, ফোন : ৩১১১৭১।
৩. এম.এস.এস. হাবিবুল হক, হাউস নং ৬১২, রোড নং ১৮, ধানমন্ডি, ফোন : অফিস ২৫০৮০৬, বাসা ২৫৪০৬৪।
৪. জনাব নোয়াব আলী, হেড মাষ্টার আই.পি.এইচ. স্কুল মহাখালী (অয়্যারলেস কলোনীর নিকট)

মীরপুর থানা

১. জনাব লাইক আহমেদ সিদ্দিকী, ২৬, এ/সি মীরপুর ফাষ্ট কলোনী, ঢাকা।

মোহাম্মদপুর থানা

১. জনাব এম.এ. বারেক, ৩০/৬, মোহাম্মদপুর কলোনী, ফোন ৩১১৫৩৮।
২. ডা. ওসমান ('এ' ব্লকের মসজিদের নিকট) মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন : অফিস ৩১১২৬৮, বাসা ৩১৬৬৯৫।
৩. জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ ফারুক, কায়দে আজম রোড, (রাফাকাত খানের বাড়ির নিকট) মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন : ২৫৪৮০৮।
৪. জনাব শফিকুর রহমান, অ্যাডভোকেট, ৬৮, ঝিকাটোলা, ঢাকা, ফোন : ২৪৬৪৬৭।
৫. জনাব আবদুর রহমী চৌধুরী, হাউস নং ৭৯০, রোড নং ৯৯, ধানমন্ডি আর, এ ঢাকা, ফোন : ৩১১০৩৩।

রমনা থানা

১. আতাউল হক খান অ্যাডভোকেট, ১৯৭, বড় মগবাজার, ঢাকা।
২. জনাব জি, এ, খান, অ্যাডভোকেট ২৪, দিলু রোড, এস্কাটন ঢাকা-২, ফোন : ২৫৪০৩৫।
৩. প্রফেসার এ, হাশেম।
৪. জনাব জুলমত আলী খান, অ্যাডভোকেট, ১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২, ফোন : ২৫৪৮৫৫।
৫. জনাব মোহাম্মদ আয়ুব আলী, সি-৫৮৭, এ চৌধুরীপাড়া, খিলগাঁও, ফোন : ২৫৪৮০৮।
৬. অ্যাডভোকেট এ, ওয়াদুদ মিয়া, শান্তিনগর, ঢাকা।"[১৬]

ফরিদ আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিটিও কাজ শুরু করে। ১৪ এপ্রিল এক বৈঠকে তারা সারা পূর্ব পাকিস্তানে কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কল্যাণ কাউন্সিল' [অতঃপর কাউন্সিল হিসেবে উল্লেখ করা হবে] রাখা হয়। তাদের ঠিকানা ছিল ধানমন্ডির ৫ নং সড়কের ১২ নম্বর বাড়ি [খুব সম্ভব ফরিদ আহমদের]। কমিটির সদস্যদের জেহাদের জন্য প্রস্তুত "এবং পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

১৬. *দৈনিক আজাদ*, ২০.৪.১৯৭১।

প্রস্তুত থাকার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরান ও সুন্নাহ মোতাবেক জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে পর সদস্য, মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি আহ্বান"[১৭] জানানো হয়। শান্তিকমিটির মতো কাউন্সিলও লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করে এবং বিভিন্ন এলাকায় কাউন্সিল গঠন ও তার খবর ধানমন্ডির কার্যালয়ে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়। সভায় ফরিদ আহমদ ছাড়াও নূরুজ্জামান বক্তৃতা করেন—

"সভায় মওলানা নূরুজ্জামান ষ্টিয়ারিং কমিটির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, কমিটি সারা প্রদেশব্যাপী তাহার তৎপরতা অব্যাহত রাখিবে এবং কমিটির মূল লক্ষ্য হইতেছে জনমনে আস্থার ভাব পুনরুদ্ধার করা এবং জীবনের সর্বপর্যায়ে স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনা। জনাব নূরুজ্জামান কমিটির লক্ষ্য সম্পর্কে আরও বলেন যে, এছলাম ও পাকিস্তানের দুশমনের সহিত সংগ্রাম করার জন্য জনগণকে প্রস্তুত রাখার ব্যাপারেও আমাদের তৎপরতা অব্যাহত থাকিবে।"[১৮]

কাউন্সিলের লিয়াজোঁ অফিসার [বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি] হিসেবে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেন—

১. রামপুরা, মোহাম্মদ আলী সরকার [অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী]।
২. মালিবাগ, ইদ্রিস আহম্মদ, ২৭১, মালিবাগ।
৩. স্টেডিয়াম, মোহাম্মদ আলী সরকার।
৪. আর্মেনীটোলা, শাহ ইসমাইল উল্লাহ চিশতি, ১২ গোবিন্দ দাস লেন।
৫. তাসওয়ার হোসেন খান, ২, বাসাবাড়ি লেন।
৬. ইংলিশ রোড, আবদুল মজিদ, ৬৬ পাতলা খান লেন।
৭. উর্দু রোড, মোঃ ইসহাক।[১৯]

কাউন্সিলকে সমর্থন করেছিলেন নওয়াব হাসান আসকারী এবং ঢাকার কিছু সরদার। হাসান আসকারী ১৮ এপ্রিল ঢাকার পঞ্চায়েতের কয়েকজন সরদারকে ডেকে পাঠান। একসময় পঞ্চায়েতের সরদাররা ঢাকার 'নওয়াব'দের সঙ্গে কাজ করতেন, নওয়াবদের অনুগত ছিলেন। ঐ সময় 'নওয়াববাড়ি'র প্রধান ছিলেন আসকারী। তিনি আবার মুসলিম লিগের নেতাও ছিলেন। সরদারদের মধ্যে ছিলেন আবু নাসের, ঢাকা হোটেলের মালিক আবদুল মাজেদ সরকার, শিল্পপতি সিরাজুদ্দিন। বিশেষ আমন্ত্রণে যোগ দেন ফরিদ আহমদ ও মুহাম্মদ নূরুজ্জামান।[২০] ঢাকা সমিতির নেতৃবৃন্দও কাউন্সিলকে সমর্থন করেন। সমিতির

---

১৭. *একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়*, পৃ. ৪৭।
১৮. *দৈনিক আজাদ*, ১৫.৪.১৯৭১।
১৯. *একাত্তরের ঘাতক দালালরা* পৃ. ১৮৪-১৮৫।
২০. *দৈনিক আজাদ*, ২০.৪.১৯৭১।

পক্ষে স্বাক্ষর করেন, সভাপতি সিরাজুদ্দীন আহমদ, প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ মাজেদ আলী সরদার, সহ-সভাপতি মওলাবখশ সরদার, সাধারণ সম্পাদক এস.এ. ওয়াজেদ আলী ও মোহাম্মদ আলিম শাহাবুদ্দীন আহমদ। বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করেন, 'জনগণ' যাতে 'এছলাম' ও 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারণায়' কর্ণপাত না করে। তারা আরো বলেন—

"আমরা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ঢাকায় পাকিস্তানের এই ভূমিতে ১৯০৫ সালে শাহাবাগে পাকিস্তানের বীজ সর্বপ্রথম বপন করা হয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে এই ঢাকা শহরেই ভারতীয় ও পাকিস্তানের বীজ অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এক নম্বর ঘাঁটি হিসাবে থাকিবে। শহরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাত্রা কায়েম হইয়াছে এবং আল্লাহর দোওয়ায় নাগরিকগণ শহরে ও সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শূন্যতা পূরণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের সহিত সহযোগিতায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন।

মৌলভী ফরিদ আহম্মদের নেতৃত্বে ও পরিচালনাধীন গঠিত পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের কর্মতৎপরতার প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাইতেছি। জানমালের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন প্রকার আশংকা অথবা সন্দেহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিক পেশাগত কাজকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকের নিকট আবেদন জানাইতেছি। পরিশেষে আমরা ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বীর সশস্ত্র সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি।"[২১]

১৯ এপ্রিল শান্তিকমিটির এক সভায় কয়েকজন লিয়াঁজো অফিসার বদল করা হয়। তারা হলেন—লালবাগে হাবিবুল হকের বদলে মাহবুবুজ্জামানকে, রমনা থানায় ৩৭৫, উত্তর শাহাজাহানপুরের ফজলুল হক চৌধুরী, ১৫১ দক্ষিণ কমলাপুরে শাহ মফিজুদ্দিন এবং ২২৫ মালিবাগের আবদুল হাইকে। শুধু তাই নয় দৈনন্দিন কাজ জানবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় যার নাম দেয়া হয় কার্য নির্বাহক কমিটি। এর সদস্য ছিলেন—এ.এম. শফিকুল ইসলাম, গোলাম আযম, আবদুল জব্বার খদ্দর, এ.কে.এম সোলায়মান, আবদুল মতিন এবং এসকে খায়েরুদ্দীন।[২২]

২২ তারিখে কমিটি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জানায়—"সারা পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে এখন পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করছে এবং

২১. ঐ।
২২. ঐ, ২২-৪-১৯৭১।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রানি করতে শুরু করেছে। সুতরাং এক, জনগণ যেন এদের উৎখাত করতে এগিয়ে আসেন, দুই, ভারতীয় বেতারের 'বিদ্বেষমূলক প্রচারণা ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের গুজব' ও যেন কান না দেন এবং সশস্ত্র বাহিনীকে যেন ভয় না করেন।[২৩]

শান্তিকমিটি প্রথমে ঢাকাতেই শাখা কমিটি স্থাপনের জন্য বিভিন্ন এলাকায় প্রচার শুরু করে। কেন্দ্রীয় নেতারা তাতে অংশ নেন। যেমন গোলাম আজম, মাহমুদ আলী ও আবদুল জব্বার খদ্দর ও আবুল কাসেম খান, শফিকুল ইসলাম, মনসুর আলী ও খদ্দর যান আরামবাগ। জেলা ও মহকুমায়ও শান্তিকমিটির প্রতিনিধিদের পাঠানোর উদ্যোগ নেয়। ২৫ এপ্রিলের মধ্যে ঢাকা শহরে ১৬টি থানা কমিটি গঠিত হয়।[২৪] আগস্ট মাসে ঢাকা শহরে শান্তিকমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন সিরাজুদ্দীন আহমদ, সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক মো. মনসুর আলী।[২৫]

শান্তিকমিটির পক্ষ থেকে শান্তি স্কোয়াড গঠিত হয়। কমিটির মতে, এদের কাজ ছিল, ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে 'শান্তি' স্থাপন করা। আসলে তাদের মূল কাজ ছিল আওয়ামী লীগার বা সমর্থক, হিন্দু বা বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকদের চিহ্নিত করা, প্রয়োজনে তাদের বাড়িঘর লুট বা হত্যা করা। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের গবেষণা অনুসারে—

"মাথায় সাদা বা লাল পট্টি বাঁধা শান্তিকমিটির এই শান্তি স্কোয়াডের সদস্যরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে বাঙালি হত্যাসহ তাদের বাড়িতে লুটতরাজ ও অগ্নি সংযোগ করে। বাঙালি বিশেষত তরুণ ও যুবকদের দেখামাত্র পিটিয়ে, বেয়নেট চার্জ করে বা গুলি করে হত্যা করে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাঙালিদের বাড়িঘরে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।"[২৬]

ঐ একই গবেষণা অনুসারে মে মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় শান্তিকমিটি স্থাপিত হয়। কাউন্সিলও কয়েক জায়গায় কমিটি করে। তবে, মনে হয় হানাদার বাহিনীর সমর্থন ছিল খায়েরুদ্দীনের কমিটির প্রতি। সে কারণে, তারা বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনিক সমর্থনও পায়। কাউন্সিলের প্রতি হানাদারদের সমর্থন ছিল না বটে কিন্তু তাই বলে তাদের কার্যক্রমেও বাঁধা দেয়া হয়নি কারণ তারাও হানাদারদের পক্ষে কাজ করছিল। কিন্তু, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অচিরেই কাউন্সিলের কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। মূল কমিটিই ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

---

২৩. *ঐ*, ২৩.৪.১৯৭১।
২৪. *ঐ*, ২৭.৪.১৯৭১
২৫. ইফতেখার আমিন, *একাত্তরের দালালনামা*, ঢাকা, ২০১১।
২৬. *একাত্তরের ঘাতক-দালালরা* পৃ. ৪২।

৮

শান্তিকমিটি ও কল্যাণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেছিল মূলত আওয়ামী লীগ ও বামদল বিরোধী চরম ডানপন্থি দলগুলি। এদের মধ্যে জামায়াত ইসলাম ছিল প্রধান। এছাড়া ছিল মুসলিম লিগের বিভিন্ন অংশ, নেজামে ইসলামী, পিডিপি, ইসলামিক রিপাবলিক পার্টি, দক্ষিণ পন্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ। একইভাবে এইসব দলের অনুসারীরাই বিভিন্ন জাগায় শাখা কমিটিগুলি গড়ে তোলে। শান্তি কমিটিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন মুসলিম লীগের খাজা খায়রুদ্দীন ও মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, জামায়াতের গোলাম আযম। এছাড়া ছিলেন আবদুল জব্বার খদ্দর, শফিকুল ইসলাম ও মাহমুদ আলী। কল্যাণ কাউন্সিলে ফরিদ আহমদ ও নূরুজ্জামান।

আওয়ামী লীগ ও বামপন্থি দলগুলি দমনের ফলে রাজনীতিতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল এইসব দলের নেতারা সে শূন্যতা পূরণে এগিয়ে এসেছিলেন।

হানাদাররা চেয়েছিল কিছু বাঙালি রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসুক যারা তাদের অধস্তন হিসেবে কাজ করবে অন্যদিকে বিশ্ববাসীকে দেখান যাবে, বাঙালিদের একটি অংশ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব মানতে চায় না। কিন্তু অধিকাংশই চায়। অবরুদ্ধ দেশে যারা আছেন এরা এরা তাদের প্রতিনিধি। আর এইসব রাজনীতিবিদরাও সেই অধস্তনতা মেনে নিতে রাজি ছিলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষমতাবান হওয়া।

ঈশ্বরদীর ছাত্রনেতা শহীদুজ্জামান নাসিম নিরাপত্তার কারণে ঈশ্বরদী জামে মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেটি এপ্রিল মাসের শেষ দিকের কথা। তাঁর ভাষায়–

"আমরা কিছুটা নিরাপত্তার আশায় ঈশ্বরদী জামে মসজিদে এসে উঠলাম। সেখানে দেখলাম জনৈক মওলানা আলমাদানি সাহেবকে। তিনি জামাত নেতা খোদা বক্স খাঁকে পাক বাহিনীর পক্ষে কাজ করা ও পাকিস্তান রক্ষার সবক দিচ্ছেন।"[২৭ক]

কমিটি গঠন হওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের নেতারা শান্তি কমিটিকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। পিডিপির নূরুল আমিন বা প্রাক্তন মুসলিম লিগের হামিদুল হক চৌধুরী কমিটির সদস্য না হলেও কমিটি গঠনে ভূমিকা রেখেছেন। মুসলিম লিগের ফজলুল কাদের গ্রুপের সভাপতি শামসুল হুদা ও সাধারণ সম্পাদক এ.এচ.এম. ইউসুফ, দেশে "স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার, সর্বপ্রকার সন্দেহ প্রবণতা দূরীকরণ, মিথ্যাগুজব, উত্তেজনা সৃষ্টিকর অলীক কাহিনী প্রচারে বিরত করার উদ্দেশ্যে প্রদেশে সকল পার্টির ইউনিটকে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে লইয়া কমিটি গঠনের জন্য স্ব স্ব অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা" চালানোর আহ্বান জানান।[২৭]

২৭ক. আবুল কালাম আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা, পাবনা জেলা*, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৬০।
২৭. *দৈনিক আজাদ*, ১৪.৪.১৯৭১।

একইভাবে কনভেনশন লিগের ডা. নুরুর রহমান ঘোষণা করেন "হিন্দুস্থান পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে।" সুতরাং শান্তিকমিটিকে পূর্ণ সহযোগিতা দিতে হবে।[২৮]

নেজামী ইসলামীর নেতা চাঁটগার বাঁশখালি থেকে 'নির্বাচিত এম.পি' 'মাওলানা' আহমদ সগীরও একই ধরনের বক্তব্য প্রদান করেন। "ছয় দফা কর্মসূচিতে যাহা কিছু ছিল, ভারতীয় চর ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সৃষ্ট গোলযোগ ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে তাহার চাইতে অনেক বেশি অঘটন ঘটিয়াছে।"[২৯]

সিলেটে জামায়াতের শামসুল হক শান্তি কমিটির এক সভায় বলেন, "ভারত পাকিস্তানের সহিত সংগ্রাম করিবার স্বাদ পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছে। বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করিয়াছে, আমাদের সড়ক, সেতু ধ্বংস করিয়াছে এবং ব্যাংক, খাদ্য ও গুদাম মূলধন করিয়াছে। এই ধরনের শত্রু ও সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে বীরত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এজন্য তিনি তাহাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।"[৩০]

কিশোরগঞ্জে শান্তি কমিটির এক সভায় পিডিপির সহ সভাপতি 'মওলানা' সৈয়দ মোসলেহ উদ্দিন বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের এই দুভার্গ্যের জন্য বিচ্ছিন্নকারীরাই দায়ী।"[৩১]

২৯ নভেম্বর ঢাকায় শান্তিকমিটি এক প্রতিবাদ মিছিল করে ভারতীয় 'আগ্রাসনে'র বিরুদ্ধে সেখানে তাতে মুসলিম লিগের (কাইয়ুম) খান এ সবুর বক্তৃতা করেন।[৩২] জমিয়াতুল মোদরেছিনও যুক্ত ছিল শান্তিকমিটির সঙ্গে।[৩৩] কাউন্সিলে দক্ষিণপন্থি দল ছাড়াও, অনেকে ছিলেন যারা বাংলাদেশ চাননি তারা যোগ দিয়েছিলেন শান্তিবাহিনীতে। উত্তর বঙ্গে, যশোরে, ঢাকায় বিহারিরা প্রায় সবাই যুক্ত ছিলেন শান্তিকমিটির সঙ্গে।

শান্তিকমিটিতে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল জামায়াতে ইসলামী। এর নেতারা শান্তি কমিটির [কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক] বিভিন্ন পদে ছিলেন। গোলাম আযম শান্তিকমিটির সদস্য এবং জামায়াতের প্রাদেশিক আমির হিসেবে প্রায় সময়ই বক্তব্য রেখেছেন। জামায়াতের মুখপত্র *সংগ্রাম* সবসময় শান্তি কমিটির পক্ষে সম্পাদকীয়। উপসম্পাদকীয় ছেপেছে।[৩৪]

---

২৮. *ঐ*, ১৮.৪.১৯৭১।
২৯. *ঐ*, ১০.৬.১৯৭১।
৩০. *ঐ*, ১৬.৬.১৯৭১।
৩১. ইফতেখার প্রাগুক্ত গ্রন্থ।
৩২. *ঐ*।
৩৩. *দৈনিক আজাদ*, ২৮.৬.১৯৭১।
৩৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য আলী আকবর টাবীর *প্রাগুক্ত গ্রন্থ* দেখুন।

সংগ্রাম ১৩মে লিখেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের নিয়ে—"এ নতুন জাতির নাম হল 'জয় বাংলা' জাত। তাদের কলেমা ও সালাম-কালাম হলো 'জয় বাংলা', তাদের দেশের নাম 'বাংলাদেশ', তাদের ধর্মের নাম বাঙালি ধর্ম। এ ধর্ম প্রতিকের নাম দিয়েছে তারা বঙ্গবন্ধু।"[৩৫]

সংগ্রাম কর্তৃপক্ষকে আবেদন করে, "দুস্কৃতিকারী দমনকল্পে নানা এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রশাসন যন্ত্রকে পূর্নবহাল ও সক্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হবেন ততই দেশ ও জাতির মঙ্গল। বিভিন্ন জায়গায় যেসব শান্তিকমিটি গঠিত হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে সেগুলোও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।"[৩৬]

মুক্তিযোদ্ধাদের দমনের জন্য *সংগ্রাম* বিভিন্ন বাহিনী গঠনের কথাও বলে। কারণ, গেরিলা তৎপরতার কারণে দু'একজন করে দালাল নিহত হচ্ছিল। জামায়াতী পরিকল্পনার ভিত্তিতেই এই সম্পাদকীয়টি লেখা হয় যার শিরোনাম ছিল— 'বিভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ড'—

"এসব হত্যাকাণ্ডে যারা নিহত হয়েছেন, তাঁদের সকলেই পাকিস্তানবাদী ও জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী বলে জানা যায়। শান্তিকমিটির সাথে জড়িত ব্যক্তিও নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বলে প্রকাশ। এছাড়া প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যাঁরা সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তাঁদের গোপন পত্র মারফত দুস্কৃতিকারীরা (মুক্তিযোদ্ধারা লেখক) হুমকি দিয়ে চলেছে জানা যায়।

আমাদের সেনাবাহিনী দুস্কৃতিকারী দমন অভিযান অব্যাহত রেখেছেন সন্দেহ নেই এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাঁরা যেভাবে দেশকে হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারী ও দুস্কৃতিকারীদের সুসংগঠিত হামলা থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন তেমনিভাবে এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত অপরাধীদের সত্বরই নির্মূল করতে সক্ষম হবেন।

দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী এসব দুস্কৃতিকারী দমনের ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বেও সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় এবং একাধিক নিবন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস পাকিস্তান ও জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য লোকদের সমন্বয়ে একটি বেসামরিক পোশাকধারী বাহিনী গঠন করে তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে অতি তাড়াতাড়ি এসব দুস্কৃতিকারীদেরকে নির্মূল করা সহজ হবে।"[৩৭]

---

৩৫. *ঐ*, পৃ. ৫০।
৩৬. *ঐ*।
৩৭. *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৮.৫.১৯৭১।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই কিছুদিনের মধ্যে রেজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি বাহিনী গঠিত হয় যার কথা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। এসব বাহিনিতেই জামায়াতীরাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ।

গোলাম আজম ১৬ জুলাই ঘোষণা করেন, হিন্দুরা মুসলমানের বন্ধু এমন কোন প্রমাণ নেই—

"রাজশাহী, ১৬ই জুলাই। সম্প্রতি স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে রাজশাহী শান্তি কমিটির উদ্যোগে আহুত সুধী সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্পর্কে বলেন যে, যাদের নিজেদের শক্তি নেই, তারা হিন্দুস্তানের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে স্বাধীন হতে চায়।

জামায়াত নেতা প্রশ্ন করেন, হিন্দুস্তানী ফৌজ এদেশ দখল করলে তাদের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ করা কিভাবে সম্ভব হবে?

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, হিন্দুরা মুসলমানের বন্ধু—এরূপ প্রমাণ করার মতো কোন দলীল নেই। তারা চিরদিনই মুসলমানের সাথে দুশমনী করে এসেছে এবং দেশ বিভাগের পরও ভারতে মুসলিম হত্যা দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, মুসলমানে মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করার কৃতিত্ব হিন্দুদের। ভাষার প্রশ্ন তুলে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারলে হিন্দু-মুসলমান মিলে এক জাতি হওয়ার সম্ভব নয় বলে অধ্যাপক আযম মন্তব্য করেন। তিনি বাঙালি অবাঙালি মনোভাব ত্যাগের জন্য সকল মুসলমানকে আকুল আহ্বান জানান। উক্ত সুধী সমাবেশে রাজশাহী শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান জনাব আইনুদ্দীন সভাপতিত্ব করেন।"[৩৮]

শান্তিকমিটি কেন শক্তিশালী করা দরকার তার কারণ দেখিয়েছিল *দৈনিক সংগ্রাম* বা জামায়াত নেতারা। পত্রিকার মতে, সেনাবাহিনী শুধু পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবে না—

"ভারত ও তার চরদের অঘোষিত যুদ্ধ যতদিন শেষ না হয় ততদিন শান্তি কমিটি দেশ ও জনতার উভয় স্বার্থেই প্রয়োজন। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখা ও সুসংগঠিত করার গুরুত্ব অত্যধিক। শান্তিকমিটির শূন্যতা দেশ ও জনতা দুটোকেই বিপন্ন করতে পারে, তা উপলব্ধি করা না হলে মারাত্মক ভুল হবে। ভুলে গেলে চলবে না, পাকিস্তানের নেতা উপনেতা খতম হলে জনতাও হতাশ হয়ে পড়বে। তখন শুধু সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবে না। একারণেই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে নিখুঁত ও এককেন্দ্রিক শান্তিকমিটি ও তার অধীনে প্রয়োজনীয় নির্ভেজাল রেজাকার বাহিনী। এ দুটো সংগঠন যদি সুষ্ঠুভাবে চালু হয়ে

৩৮. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯.৭.১৯৭১।

যায় তাহলে সেনাবাহিনী যেমন বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় পূর্ণ নিয়োগ করতে পারবে তেমনি শান্তি কমিটিও রেজাকার বাহিনী পঞ্চম বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট হবে। ...”[৩৯]

শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড যে মানুষ আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ তা জামায়াতী নেতারা বুঝতে পারছিলেন। বস্তুত তাদের আগ্রাসী মনোভাবে অন্যান্য দক্ষিণপন্থি দলগুলিও ভীত হয়ে উঠছিল। *দৈনিক সংগ্রামে* প্রকাশিত দু'টি সংবাদ প্রতিবেদন এর প্রমাণ।

১. “পূর্ব পাকিস্তান শান্তিকমিটির বয়স আজ সাড়ে চার মাস অতিক্রম করে চলেছে। তবে শান্তিকমিটির অপ্রশংসনীয় কাজ যে আদৌ নেই তাও বলা চলে না। কারণ দেশের মানুষ দিয়েই শান্তিকমিটি গঠিত। আকাশের ফেরেশতাদের দ্বারা নয়। তাই দেশের মানুষও যেমন ভুল-ত্রুটি মুক্ত নয়, তেমনি মুক্ত নয় তাদের নিয়ে গড়া শান্তিকমিটি। এ কারণেই কোথাও বা শান্তিকমিটি নাকি অশান্তি কমিটিরই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।”[৪০]

২. “যে রেজাকারদের সর্বদলীয় শান্তিকমিটির সহযোগিতায় সামরিক সরকারই বাছাই করেছেন এবং ট্রেনিং দিয়ে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগিয়েছেন, তারা কি করে দল বিশেষের পক্ষ হয়ে অন্যান্য দলের কর্মীদের খতম করেছে তা ভাবতেই অবাক লাগে। অপবাদ মূলত কি সামরিক সরকারকেই দেয়া হচ্ছে না?

    সামরিকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রেজাকাররা যখন শুধু ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দালালদের খতম করছে তখন তা যদি অন্য কোন দলের কর্মী খতম করা হয়ে থাকে তবে সে দলের কর্মীরা নিঃসন্দেহে ভারতের দালালী করছে।”[৪১]

জামায়াত কতোটা আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল তা বোঝা যায় নভেম্বর মাসে গোলাম আযমের উক্তিতে। কারণ, তখন বাঙালি পাকিস্তানিদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে সময় ঘনিয়ে এসছে। মরীয়া হয়ে উঠছিল তারা। গোলাম আযম দাবি করেন—

“পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে সকল দেশপ্রেমিক, শান্তিকমিটির সদস্য এবং রেজাকারদের উন্নতমানের ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য অধ্যাপক আযম দাবী জানান।”[৪২]

---

৩৯. *ঐ*, ১৪.৮.১৯৭১।
৪০. *ঐ* [সম্পাদকীয়]
৪১. *ঐ*, ৩.৮.১৯৭১।
৪২. *ঐ*, ২৪.১১.১৯৭১।

এর কিছুদিন পরই জামায়াতীদের আলবদররা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। আলবদরদের নেতা ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী।

শান্তিকমিটির সদস্যরা এতই আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল যে সুদূর পাকিস্তান থেকে এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান বলেন "শান্তিকমিটির সদস্যরা আইন শঙ্খলা পুনরুদ্ধারের নামে ব্যক্তিগত শত্রুতা ও রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে গ্রামাঞ্চলের লোকদের হয়রানি করছে। এতে নিরীহ মানুষ কষ্টভোগ করছে।" প্রত্যুত্তরে *সংগ্রাম* উল্লেখ করে—

"জনাব আসগর খান তার সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থা ও শান্তিকমিটির বিরুদ্ধে পাইকারীভাবে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নাম তিনি উল্লেখ না করলেও রেজাকার আলবদর বাহিনী ও মোজাহিদ বাহিনীর প্রতি তিনি ঈঙ্গিত করেছেন। শান্তিকমিটি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য যারা বুকের রক্ত দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী ও হিন্দুস্তানী ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে জনাব আসগর খানের এই শত্রুসুলভ অভিযোগ আমাদেরকে দুঃখিত করেনি বরং তার শূন্যগর্ভতা আমাদেরকে বিস্মিত করেছে।"[৪৩]

৯

শান্তিকমিটির নেতাকর্মীদের আদর্শের কথা আগে উল্লেখ করেছি। দক্ষিণপন্থি দলগুলি ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে। অখণ্ড পাকিস্তানে যদি তাদের অধস্তন থাকতে হয় তাতেও তাদের আপত্তি ছিল না। ইসলামকে তারা ব্যবহার করেছিল। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের কাম্য। শান্তিকমিটির বিভিন্ন সভায় নেতারা এ কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন।

মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন বলেছিলেন—

"কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার আখতার উদ্দীন আহমদ বলেছেন, বর্তমান মুহূর্তে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য আমাদেরকে দলীয় মত পার্থক্য ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হতে হবে। বরিশালে জেলা শান্তিকমিটি আয়োজিত এক বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আখতার উদ্দীন উপর্যুক্ত মন্তব্য করেন বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে ভারত যে চক্রান্ত ও প্রচারণা চালাচ্ছে, সাহস ও আস্থার সাথে তার মোকাবেলা করার জন্য জনাব আখতার উদ্দীন জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তানে অশুভ কার্যকলাপে লিপ্ত দুস্কৃতিকারী এবং বিদেশি চরদের উৎখাত করার জন্যও তিনি আহ্বান জানান।

৪৩. আলী আকবর টাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

সভায় আরো বক্তৃতা করেন এম এন এ অবসরপ্রাপ্ত মেজর আফসার উদ্দীন, সাবেক মন্ত্রী এমএম আফজাল, সাবেক এম এন এ চৌধুরী রব খান, অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান বিশ্বাস [বিএনপি নেতা ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট] প্রমুখ।"[৪৪]

গোলাম আযম যেমন বলেছিলেন,

"অধ্যাপক আযম বর্তমান পরিস্থিতির ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব এবং যতদিন আমরা বাঁচবো পঙ্গু জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবো।

অধ্যাপক আযম এই উপমহাদেশের মুসলমানদের অপরিসীম ত্যাগকে বৃথা যেতে না দেয়া এবং পাকিস্তানি মানবতায় উদ্বুদ্ধ একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সারা বিশ্বে এক অনন্য সাধারণ উদাহরণ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শপথ গ্রহণ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান বলে গতকাল শুক্রবার প্রাদেশিক জামায়াতের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ।"[৪৫]

গোলাম আযম আরো বলেছিলেন,

"পাকিস্তান যদি না থাকে তাহলে জামায়াতকর্মীরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা মনে করে না। পাকিস্তান সারা বিশ্ব মুসলিমের জন্য ইসলামের ঘর। কাজেই পাকিস্তান যদি না থাকে তাহলে জামায়াতকর্মীরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোন স্বার্থকতা খুঁজে পাবে না। জামায়াত প্রধান বলেন, তাই জামায়াতের কর্মীরা জীবন বিপন্ন করে পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। শান্তিকমিটির মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণের মনে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করার জন্য কাজ করেছে এবং একই উদ্দেশ্যে জামায়াত দলের দু'জন সিনিয়র নেতাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে বাধ্য করেছে।"[৪৬]

মধ্যপন্থি বা বামপন্থাকে তারা পাকিস্তানের সমর্থক কখনও মনে করেনি। আওয়ামী লীগ সমর্থক তথা বাংলাদেশের মানুষদের বিবেচনা করা হয়েছে চক্রান্ত কারি, হিন্দু ভারতের এজেন্ট, পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিরোধী। আদর্শ ছাড়াও এ বিরোধিতার অন্য কারণ ছিল। আওয়ামী ছিল পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। এমনিতে বা রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার সামর্থ্য এদের ছিল না। সুতরাং, শক্তির সাহায্যে তাদের দমিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। আওয়ামী লীগ দমিত হলে তাদের শূন্যস্থান তারা গ্রহণ করবে এমন

---

৪৪. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮.৭.১৯৭১।
৪৫. ঐ, ১৪.৬.১৯৭১।
৪৬. ঐ, ২৬.৯.১৯৭১।

বাসনা ছিল। কারণ, নিছক পাকিস্তান আদর্শ রূপায়িত করার জন্য এত খুন, লুট, জখম দরকার ছিল না।

আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্ব সম্পর্কে *দৈনিক সংগ্রাম* লিখেছিল—

"সবকিছু ভুল নেতৃত্বের কুফল। ভ্রান্ত নেতৃত্বের যে বিপুল খেসারত এ অঞ্চলবাসীকে দিতে হল, তার ক্ষতিপূরণ কতদিনে সম্ভব তা কে বলতে পারে, তথাপি আমাদের শেষরক্ষা খোদা যে করলেন, সেজন্য আমরা খোদার কাছে কৃতজ্ঞ। এ ব্যাপারে আমাদের সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও ত্যাগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাদের সময়োচিত হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছুতেই আমরা ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পেতাম না। ... ক্ষমতার লালসা যে মানুষকে দেশ বিক্রেতাও করতে পারে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে আওয়ামী নেতৃত্বই পয়লা সে কলঙ্কজনক নজীর কায়েম করল। বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত আমাদের সেনাবাহিনী ও জনতার সচেতন পদক্ষেপ যদিও দেশ ও দেশের জনতাকে ভারতীয় ধ্বংসস্পৃহার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, তথাপি আওয়ামী ভ্রান্ত নেতা ও ফ্যাসিবাদী কর্মীদের একতরফা প্ররোচনা, প্রচারণা ও জবরদস্তির শিকার হয়ে কিছু লোক ভারতে চলে গেছে।"[৪৭]

আরেকটি বিষয় ছিল সম্পদ হস্তগত করা। ১৯৪৭ সালে, ব্যাপক হারে হিন্দুদের দেশত্যাগ এখানকার মুসলমানদের বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে সম্পদ আহরণ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে স্ফিত করতে সাহায্য করেছিল। ১৯৭১ সেই সুযোগ এনে দিয়েছিল পাকিস্তানপন্থীদের। তাদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কীভাবে শুধু হিন্দু নয়, অন্যান্যদের সম্পদ দখল করা হচ্ছে।

শান্তিকমিটি যারা করেছিলেন, উচ্চ পর্যায়ের এবং নিম্ন পর্যায়ের, এই প্রথম তারা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিলেন। এ ক্ষমতা এমন যে, যা ইচ্ছে তা করা যায়। খুন ছিল মামুলি ব্যাপার। এই ক্ষমতার স্বাদ তাদের হিংস্র করে তুলেছিল এবং এই ক্ষমতার লোভ, সম্পদের লোভ তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

একটি বিষয় উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। এরকম অনেকে ছিলেন যারা বাধ্য হয়ে যোগ দিয়েছেন শান্তি বাহিনীতে কিন্তু নিষ্ক্রিয় থেকেছেন, অনেক ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারাও কোনো ব্যক্তিকে যুক্ত থাকতে বলেছেন খবর সংগ্রহের জন্য। তবে সে সংখ্যা খুব সামান্য।

---

৪৭. ঐ, ২৩.৫.১৯৭১।



দ্বিতীয় পর্ব

শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

১০

শান্তিকমিটির প্রধান কাজ ছিল বাংলাদেশ আদর্শের বিরুদ্ধে প্রচার। পাকিস্তানি আদর্শের প্রতি অনুগত থেকে বাঙালিদের প্রতিরোধ ছিল প্রচারের উদ্দেশ্য। ২৫ মার্চের পর পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক সেটিও তারা বারবার তুলে ধরতে চেয়েছে বা পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক' করণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সবসময় তারা দুস্কৃতিকারী হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং তাদের প্রতিরোধে আহ্বান জানিয়েছে। এই প্রচারে বারবার তারা উল্লেখ করতে ভোলেনি যে ভারত হচ্ছে 'হিন্দুস্থান' ও তাদের 'দুরভসন্ধি' সম্পর্কে সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

বাগেরহাট শান্তিকমিটি ৫ মে ১৯৭১ সালে বাগেরহাটবাসীদের উদ্দেশে ১০ হাজার প্রচারপত্র ছেপে বিলি করে। লিফলেটের শিরোনাম 'বিশেষ নিবেদন'। আবেদনের শুরুতে বলা হয়—"দেশের বর্তমান সঙ্কটময় মুহূর্তে পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সমাজবিরোধী কর্মতৎপরতা, লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি প্রতিরোধ করার জন্য এক দায়িত্বশীল মহকুমা শান্তি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আবেদনে গ্রামে গ্রামে শান্তিকমিটি গঠন, অফিসপাট, দোকান খোলা রাখা, নিজ দায়িত্বে অবস্থান করার জন্য বলা হয়েছে। মূল বক্তব্য ছিল ৩ নং আবেদনে—"আপনার এলাকায় কোন দুস্কৃতিকারী [অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা] তথাকথিত মুক্তিবাহিনী বা তাহাদের সহকারী ও সাহায্যকারী ও কথিত নক্সাল থাকিলে বা আসিলে স্থানীয় বা মহকুমা শান্তিকমিটিকে জানান।"

শ্লোগান ছিল—

'নারায়ে তকবির আল্লাহ আকবর' 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ' 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ'

পাকিস্তানের সংহতি ও আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখুন
হিন্দুস্থানী দুরভিসন্ধি ও মিথ্যা প্রচার বন্ধ কর।
"দেশপ্রেমিক ভাইসব—এক হও।"[৪৮]

---

৪৮. বাগেরহাট শান্তিকমিটি, *প্রচারপত্র*, ৫.৫.১৯৭১।

বাগেরহাট শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান মোঃ রজ্জব আলী ফকির রমজানের সময় একটি প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন বাগেরহাটে। মূল বক্তব্য মুক্তিযোদ্ধারা যাতে আত্মসমর্পণ করেন।

'জরুরী আবেদনে' বলা হয়েছে, বাগেরহাটের "ভ্রাতা ভগ্নিগণ সমীপে আরজ এই যে, এখনও যাহারা পাকিস্তানের চিরশত্রু ভারতের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া পাকিস্তানের আদর্শ সংহতি ও যাবতীয় নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত আছে এবং যাহারা ভারত থেকে অস্ত্র সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্যে অত্র কমিটির পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল তাহাতে আশানুরূপ সাড়া পাইয়াছি। প্রায় ৫০০ জনের ন্যায় লোক আত্মসমর্পণ করিয়া পূর্ণ নাগরিক জীবন যাপন করিতেছে। [এটি অতিরিঞ্জত অথবা মিথ্যা] ইহাদের মধ্যে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের বাগেরহাট মহকুমার প্রেসিডেন্ট জনাব লতিফুর রহমান, বার-এট-ল এবং তাহার অনুসারী প্রায় একশত কর্মীরা আত্মসমর্পণ করিয়া স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতেছে।" [এই তথ্যের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি] রজ্জব আলী সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে আহ্বান জানিয়েছেন, 'পবিত্র রমজান মাসে যারা আত্মসমর্পণ করিবে তাহাদের নিশ্চয় ক্ষমা করা হইবে।'

রজ্জব আলী জানিয়েছিলেন, মুক্তিযোদ্ধারা নির্মমভাবে "নিরীহ মুসলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাইতেছে। বিশেষ করিয়া প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন, [অস্পষ্ট] ওরফে খোকন যাহারা ভারতের প্রভুদের তুষ্ট করিবার জন্য অনেক নিরীহ মুসলমানদের রক্তে এই বাগেরহাটের মাটিকে রঞ্জিত করিয়াছে শেষ পর্যন্ত তাহারাও এই জালেমদের হইতে রক্ষা পায় নাই।" সবশেষে পাকিস্তানের হেলালী ঝাণ্ডার নিচে "সমবেত হয় চিরশত্রু ভারতকে দাঁত ভাঙা জবাব" দেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রচারপত্রটির কোন তারিখ নেই।"[৪৯]

স্বাধীনতা বিরোধীদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল জামালপুর। আলবদর বাহিনীর সৃষ্টি এখানেই। স্বাধীনতা বিরোধীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে দুটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। প্রথমটি একটি প্রচারপত্র। জামালপুর মহকুমা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি যথাক্রমে প্রিন্সিপাল আ. আজিজ এমএ ও মো. মক্তব হোসেন কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রচারিত। তারিখ ৩০.০৭.১৯৭১। ঐ সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল যাতে তারা নিজ নিজ সন্তানদের শিক্ষালয়ে পাঠান। শিক্ষালয়ে উপস্থিত থাকলে সরকার প্রচার করতে পারবে যে সব স্বাভাবিক। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত লিফলেটটি বিলি করা হয় 'ভাইসবদে'র উদ্দেশে—"সকল বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহ যথারীতিভাবে চালু থাকা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীগণের অনেকেই উপস্থিত না হওয়ায় তাহাদের নিজেদের এবং দেশ ও

---

৪৯. *ঐ*, তারিখ নেই।

জাতিসমূহ ক্ষতি হইতেছে বিধায় তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। আরও জানান যাইতেছে যে, আগামী ১২ই আগস্ট হইতে মহকুমার কলেজসমূহের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হইবে; কলেজসমূহের ছাত্রছাত্রীদিগকে যথারীতি পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।"

জামালপুর মহকুমা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি যথাক্রমে প্রিন্সিপাল আঃ আজিজ এমএ ও মো. মক্তব হোসেন কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রচারিত। তারিখ ৩০.০৭.১৯৭১।

এ সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল যাতে তারা নিজ নিজ সন্তানদের শিক্ষালয়ে পাঠান। শিক্ষালয়ে উপস্থিত থাকলে সরকার প্রচার করতে পারবে যে সব স্বাভাবিক। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত লিফলিটটি বিলি করা হয় 'ভাইসবদে'র উদ্দেশে—

ছাত্রছাত্রীদিগকে যথারীতি পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

"জামালপুর মহকুমা শান্তিকমিটির পক্ষ হইতে নিশ্চয়তা দেওয়া যাইতেছে যে, শান্তিপ্রিয় ও পাকিস্তানবাদী ছাত্রছাত্রীদের কোনরূপ ভয় বা ক্ষতির কোন কারণ নাই। তাহাদের অভিভাবকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন তাহাদের নিজ নিজ ছাত্রছাত্রীগণকে আগামী ১২ই আগস্টের মধ্যেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। অন্যথায় মনে করা হইবে যে, তাহারা দেশের শত্রুদের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। যাহার পরিণাম ভয়াবহ হইতে পারে।" বোঝা যাচ্ছে, হানাদার বাহিনীর পক্ষে তারা কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল।[৫০]

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে স্বাধীনতা দিবস আলোচনা কমিটি গঠন করা হয় জামালপুরে, যার আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যক্ষ মো. সুজায়াত আলী মিয়া। "জাতির বর্তমান দুর্যোগ মুহূর্তে এই আজাদী দিবস বিশেষভাবে উদযাপনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিকবৃন্দ এই দিবসে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিবে ইস্পাত কঠিন শপথ।"

আলোচনায় যে ১৩ জন অংশ নেন তারা হলেন—অধ্যাপক মো. গোলাম রাব্বানী কাজেম উদ্দিন আহম্মেদ, মো. মাহবুবুল আলম, অধ্যাপক আবদুল গনি, আশরাফ হুসেন, মো. সাইফুল ইসলাম, আবদুল বারী, প্রিন্সিপাল মো. সুজায়াত আলী মিয়া, অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক শরীফ হুসাইন, এসএম ইউসুফ আলী অধ্যাপক মো. ইকরামুদ্দৌলাহ ও কে এ সামাদ।

---

৫০. জামালপুর মহকুমা শান্তিকমিটি, *প্রচারপত্র*, ৩০.৭.১৯৭১।

তাদের বিষয় ছিল 'পাকিস্তানের আজাদী রক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা', 'দ্বিজাতিতত্ত্ব ও কায়েদে আযম', 'সাম্রাজ্যবাদী হিন্দুস্তানের দৃষ্টিতে পাকিস্তান' ইত্যাদি।[৫১]

শেরপুর সর্বদলের পক্ষে 'সার্কেল পিচ কমিটি' আল্লাহু আকবার ও পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে একটি প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে। তাদের মতে সর্বদলের আহ্বানে প্রতিবাদ দিবস। কারণ, প্রচারপত্রের বক্তব্য অনুযায়ী—"পাকিস্তানের সৃষ্টি চক্রান্তকারী ভারত কোন দিনই সহ্য করতে পারেনি। এর জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন উপায়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করে মুসলিমবিদ্বেষী ভারত বারবার হামলা করে দুনিয়ার বুক থেকে পাকিস্তানকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ভারত মানবতা বিসর্জন দিয়ে ১৯৬৫ সালে অতর্কিত বর্বর হামলা করেছিল 'চুরে'র [চোর] মতো আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে পাক সেনাবাহিনীর হাতে মার খেয়ে চক্রান্তকারী ভারত এদেশের মীর জাফর ও বিভীষণদের কাজে লাগিয়েছে পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য। ভারতীয় চর ও দুস্কৃতকারী পাক ভূমিতে পাঠিয়ে রাস্তা, ঘাট, পুল, সেতু ও জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে চাচ্ছে এবং সীমান্তে বিপুল পরিমাণ সৈন্য মোতায়েন করে অযথা গোলাবর্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি করছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী ভারতের নগ্ন হামলা ও বর্বরোচিত কাজের প্রতিবাদে শেরপুরের সর্বদলের পক্ষ থেকে আগামী ২৭শে নভেম্বর রোজ শনিবার প্রতিবাদ দিবস পালন করা হচ্ছে। প্রতিবাদ দিবসে বেলা ২ ঘটিকার সময় শেরপুর স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা যথাসময়ে যোগদান করে প্রতিবাদ দিবসকে সার্থক করে তুলুন।

ভারতের দালালদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হয়ে মিছিলসহ উক্ত সভায় যোগদান করে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

বি.দ্র. ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, ডিফেন্স পার্টি ও ইউসি চ্যায়ারমেন (চেয়ারম্যান) সাহেবদের উপর মিছিল আনার দায়িত্ব রহিল।"[৫২]

নেত্রকোনায় বারহাট্টা নানা শান্তিকমিটি গঠিত হয়। ঢাকায় কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পরপরই। প্রথম বৈঠকেই তারা তাদের উদ্দেশ্য ঠিক করে—

"দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সমবেতভাবে দুস্কৃতিকারী দলকে প্রতিহত করা ও তাহাদের খুঁজ [খোঁজ] খবর রাখা। পাকিস্তানের সংহতি বজায় রাখা, দুস্কৃতিকারীদের ভয়ে ভীত লোকদের মনবল [মনোবল] ফিরাইয়া আনা। দুস্কৃতিকারীগণ যাহাতে এলাকার যোগাযোগ অসুবিধা সৃষ্টি করিতে না পারে সে দিগে [দিকে] লক্ষ রাখা।"[৫৩]

---

৫১. *প্রচারপত্র*, ১৪ আগস্ট ১৯৭১।
৫২. শেরপুর সার্কেল পিচ [পিস] কমিটি, *প্রচারপত্র*।
৫৩. *কার্যবিবরণী*, ২৮.৪.১৯৭১।

তারিখ নেই, তবুও অনুমান করে নিচ্ছি মে-জুন মাসের দিকে কুড়িগ্রাম শান্তি কমিটি একটি বিজ্ঞপ্তি ছেপে বিলি করে। বোঝা যাচ্ছে, কুড়িগ্রামের পরিস্থিতি তখনও অস্বাভাবিক। মানুষজন তেমন নেই, দোকানপাট খোলেনি। পাকিস্তানিরা চাচ্ছে সারা বিশ্বকে দেখাতে সব স্বাভাবিক। তাই আহ্বান জানান হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক, সবাই যেন স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় খাঁটি ইসলাম পছন্দ পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে শান্তি কমিটি গঠনের আহ্বানও জানান হয়েছে। নিচে লিফলেটটি উদ্ধৃতি করছি—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কুড়িগ্রাম মহকুমাবাসীদিগকে জানান যাইতেছে যে, প্রায় দীর্ঘ দুই মাস যাবৎ কুড়িগ্রাম শহরে লোকজন না থাকায় এবং দোকানপাট বন্ধ থাকায় সাময়িক যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল, আল্লাহর রহমতে বর্তমানে উহা সম্পূর্ণ নিরসন হইয়াছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক দোকানপাটে বেচাকেনা, দৈনিক দুইবেলা বাজার, হাট এবং লোকজন বসত শুরু হইয়াছে।

সমস্ত কর্মচারীবৃন্দের কাজে যোগদানের ফলে যাবতীয় অফিস আদালতের কাজ, সকল স্থানে ট্রেন যোগাযোগ এবং মালপত্র নিরাপদে আমদানী-রপ্তানীর কাজ যথাযথভাবে চলিতেছে।

এমতাবস্থায় শহর এবং গ্রামাঞ্চলবাসী সকলপ্রকার নাগরিকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত আবেদন করা যাইতেছে যে—

১. আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বসতবাটি দোকানপাটে ফিরিয়া আসিয়া নির্বিঘ্নে পূর্বের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদিতে রত হউন।
২. মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পর্যায়ে সৎ চরিত্রবান খাঁটি ইসলাম পছন্দ পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে শান্তি কমিটি গঠন করত নিজ নিজ এলাকার শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা বজায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
৩. শিক্ষক মহোদয়গণ স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রীতিমতো কর্তব্যরত থাকিয়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আদর্শ শিক্ষায় তাহাদের মূল্যবান ভবিষ্যৎকে সুগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করুন।
৪. বিচ্ছিন্নতাবাদী, দুস্কৃতিকারী এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী মিথ্যা প্রচারকদেরকে সংশোধন করুন অন্যথায় প্রয়োজন হইলে এ ব্যাপারে থানার পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করুন।
৫. চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী এবং লুটতরাজকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমনের জন্য স্থানীয় শান্তিকমিটির মাধ্যমে থানায় রিপোর্ট করুন।

৬. হিন্দুদের পরিত্যক্ত (Abondened) বসতবাড়ি, দোকান, মালামাল এবং জমিজমায় কেহ বে-আইনীভাবে প্রবেশ আত্মসাৎ কিংবা বে-দখল করিলে শান্তিকমিটির মাধ্যমে থানায় রিপোর্ট করুন।

"স্থানীয় স্বাভাবিক অবস্থার সাথে স্ব স্ব উন্নতি বিধানই সামগ্রীকভাবে দেশের উন্নতি সাধন পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।"[৫৪]

কুড়িগ্রাম মহকুমা ও শহর শান্তিকমিটি গঠিত হয়েছিল জুন মাসে। তাদের প্রথম কার্যবিবরণী দেখেই অনুমান করা যায় আসলে এই শান্তিকমিটি গঠিত হয়েছিল হিন্দুদের জমিজমা দখলের জন্য। সভার দুইটি গৃহীত প্রস্তাব ছিল—

"১. যে সমস্ত হিন্দু গোলযোগ ব্যাপারে ভয়ে নিজ ঘরবাড়ি ও জমিজমা ছাড়িয়া সীমান্ত এলাকা পার হইয়া ভারতে চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকরণ ও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করণ।

২. উক্ত হিন্দুদের স্থাবর সম্পত্তি ও জমিজমার তালিকা প্রস্তুত ও উক্ত তালিকা অনুযায়ী ইউনিটের ভূমিহীন ও দুস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে পাক সরকারের ইতিমধ্যে প্রচারিত নির্দেশানুযায়ী তহশীলদারের সহিত যোগাযোগ করিয়া উঠবন্দি হিসাবে বিলিবণ্টন পূর্বক চাষাবাদের ব্যবস্থাকরণ। এখানে উল্লেখ করা হইল যে উল্লেখিত অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তির তালিকা যাহা প্রস্তুত করা হইবে তাহার এক কপি টাউন কমিটি অফিসে জমা দিতে হবে।"[৫৫]

লুটপাট কীভাবে হতো সে সংক্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে। হানাদার বাহিনীর সহযোগীরা তাদের কী কী ক্ষতি হয়েছে তা মহকুমা শান্তিকমিটিকে জানাত। তারা বরাদ্দ দিত, চিঠিগুলোর ধরন, একই রকম ছিল। একই ব্যক্তি হয়ত এ ধরনের দরখাস্ত লিখে দিত।

২০ জুলাই ১৯৭১ সালের একটি দরখাস্তে দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা—মো. রহিমদ্দিন কবিরাজ, সুফনতি, নাগেশ্বরি। তার বয়ান—

"আমি ভুরুঙ্গামারী থানার অন্তর্গত ৮ নং বলদিয়া ইউনিয়নের মনোরকুটি গ্রামের অধিবাসী। আমি গত নির্বাচনে [১৯৭০] জামাতে ইসলামের জাতীয় পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী জনাব কমরুদ্দিন সাহেবের পুলিং এজেন্ট ছিলাম।" এ কারণে, মুক্তিবাহিনী তার বাড়িঘর 'লুটপাট' করে। সে একদিকে পালিয়ে যায়, স্ত্রী পুত্র অন্যদিকে। তাদের খোঁজখবর সে জানে না। অতএব 'হুজুর' যেন সরকারী মঞ্জুরীকৃত অর্থ হতে "আমাকে অত্র এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরী ও ভরণ পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া গরীবকে প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা হয়।"

---

৫৪. কুড়িগ্রাম মহকুমা শান্তিকমিটি, *প্রচারপত্র*, [মে-জুন]।

৫৫. কুড়িগ্রাম শহর শান্তিকমিটির *কার্যবিবরণী*, ৩০.৬.১৯৭১।

এরপর সে তার সম্পত্তির পরিমাণ দিয়েছে—যার পরিমাণ ১১,৫৩৫ টাকা।

শামসের ই-মূর্ত্তজা একই এলাকার মুসলিম লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। এ কারণে তার বাড়িঘর লুটপাট করা হয়। "তথাকথিত বাংলাদেশ সরকার নাকি আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করে এবং চাষাবাদ করিতে নিষেধ করিয়া দেয়।" তার ক্ষতির পরিমাণ ১৮, ৩২০ টাকা।

এদের টাকা পয়সা দেয়া হতো যোগাসাজশ করে। শান্তিকমিটির কর্তারাও টু পাইস পেতেন। আর হিন্দুদের জমিজমা সম্পত্তি দেয়া হতো তাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে। এসব সম্পত্তি নিয়ে বাদ বিসম্পাদও হতো। একটি উদাহরণ—

শহর কমিটির সম্পাদক আগস্টের ২০ তারিখে মো. জাহাঙ্গীরকে জানায়, সে বিনা অনুমোদনে কুড়িগ্রাম শহরে মিশুয়া (অস্পষ্ট) পাড়ায় ননী গোপাল সাহার বাসায় "বেআইনীভাবে বসবাস করিতেছেন। উক্ত বাসা অন্য লোকের নামে বরাদ্দ হওয়ায় তার প্রয়োজন মোতাবেক আপনাকে দখল ছাড়িয়া দিতে হইবে। না হলে, আইন মোতাবেক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে।"[৫৬]

যশোর জেলা শান্তিকমিটির সম্পাদক আমজাদ হোসেন ১৬ জুলাই টাউন হল ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করেছিলেন। এ উপলক্ষে প্রচার সম্পাদক মৌ হারেজ উদ্দীন আহম্মদ একটি লিফলেট ছেপে প্রচার করেছিলেন। শহীদ দিবস উপলক্ষে সভা আহ্বান করা হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন সৈয়দ শামছুর রহমান। এই শহীদ কারা?

রাজাকাররা। লিফলেটের বয়ান—

"ভাইসব!

আচ্ছালামু আলাইকুম।

আসছে শুক্রবার বৈকাল ঠিক ৪টায় যশোর টাউন হল ময়দানে জেলার ২১ জন বীর রেজাকারের আত্মত্যাগের জন্য তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হবে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার্থে শত্রুর মোকাবেলায় উহারা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অমর হয়েছেন। আসুন দলে দলে সভায় যোগদান করে অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।"

যশোর জেলা শান্তিকমিটির সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ কায়েস উদ্দিন নামে এক অবাঙালি। লুটপাটে ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত। ২৪ জুন তিনি যশোর মার্শাল ল অথরিটির কাছে এক দরখাস্ত পেশ করেন। দরখাস্তের বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি প্রদান।

আবেদনে জানিয়েছেন, তিনি যে বাড়িতে বসবাস করেন সে বাড়িটির বারান্দা ভেঙ্গে গেছে। ডেপুটি কমিশনার তাকে বাড়ি ছাড়তে বলেছেন। সুতরাং তিনি এখন আশ্রয়হীন, সাহায্যহীন হয়ে পড়েছেন। কোথায় তিনি থাকবেন তা তিনি

---

৫৬. *আবেদনপত্র*, ২৯.৭.১৯৭১ এবং সম্পাদকের সুপারিশ ২.৮.১৯৭১।

জানেন না এ পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে যদি তাকে আশ্রয় দেয়া হয় তাহলে তিনি বাধিত হবেন।[৫৭]

নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি এরা সরকারি কর্মচারীদের নিয়েও মিটিং করে দিক নির্দেশনা দিত। প্যাডের একটি পাতা থেকে জানা যায়, নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন কাঞ্চু উদ্দিন ও সেক্রেটারি আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী।

লুটপাট ছাড়াও কী করত শান্তিকমিটি তার একটি উদাহরণ—৩১ আগস্ট সেক্রেটারি একটি চিঠি লেখে নাটোরের মিনার সিনেমার ম্যানেজারকে। তাকে জানানো হয় ১৩৮ জন রাজাকার প্রশিক্ষণার্থীকে যেন ঐ সিনেমার ৭-৩০ শো দেখানোর বন্দোবস্ত করা হয় যাতে 'get their mind refreshed.'[৫৮]

আগেই উল্লেখ করেছি নারী নির্যাতন শান্তিকমিটি সংশ্লিষ্টরা কম করেনি কিন্তু তা অনুল্লিখিত।

এর একটি উদাহরণ শান্তিকমিটির এক চেয়ারম্যানের চিঠি। মে মাসের ২৮ তারিখে [১৯৭১] বরিশালের ঝালকাঠি শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছলিমুদ্দিন মিয়া এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন কীর্তিপাশা ইউনিয়ন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান আজহার মিয়াকে। চিঠির ভাষা ও হাতের লেখা দেখে অনুমান করে নিতে পারি ছলিমুদ্দিন ছিলেন স্বল্প শিক্ষিত। চিঠিটি উদ্ধৃত করছি—

"ভাই সাহেব

সালামবাদ সমাচার, আপনার কীর্তিশালা কমিটিতে ইউনিট কমান্ডার হিসেবে আঃ রবের নাম শাহ আলম ছার পাশ করিয়া নিয়েছেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উত্তর দিকের শয়তান দমন করার জন্য যাইতে হইবে। আপনার এলাকার সব ইন্ডিয়ান দালালদের যত তাড়াতাড়ি পারেন ধরিয়া ক্যাম্পে পাঠাইবেন। ওদের হেদায়েত করার পর উত্তর দিকের অপারেশন শুরু করা হইবে। এদিকে ইতিপূর্বে পাঠানো অস্ত্র যেন ইন্ডিয়ার দালালরা খুঁজে নিতে না পারে। বেগ সাহেবের জন্য ভালো মাল পাঠাইবেন। রোজ অন্তত একটা অন্যদের জন্য মাল পাঠাইবেন। খোদা আমাদের সহায় আছেন। আল্লাহ হাফেজ।"

চিঠিতে উল্লিখিত 'শয়তান' হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা, 'ইন্ডিয়ান দালাল' হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। 'বেগ সাহেব' স্থানীয় পাকি কমাণ্ডার। 'ভালো মাল' মানে নারী। অর্থাৎ, মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগদের দমন করে 'শান্তি' প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য। অন্যদিকে, স্থানীয় সেনা কমান্ডার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়মিত নারী 'সাপ্লাই' ছিল প্রধান কাজ। এভাবে কত নারীর সম্ভ্রম যে তারা নষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা নেই এবং তাদের ধারণা এসব 'উত্তম' কাজ এবং আল্লাহ এ

---

৫৭. যশোর জেলা শান্তিকমিটি, *প্রচারপত্র*, ১৬.৭.১৯৭১।
৫৮. সেক্রেটারির *চিঠি*, ৩১.৮.১৯৭১।

জন্য তাদের সহায়তা দেবেন। এভাবেই পাকিস্তান ও তার সহযোগীরা ধর্মের নামে মুসলমান নারী পুরুষকে হত্যা করেছিল।[৫৯]

লাকসাম পিস কমিটির একটি কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে—

১. তথাকথিত মুক্তিবাহিনী ও তাদের অর্থকড়ি দিয়ে যারা সাহায্য করছে তাদের সনাক্ত করে তাদের নামের তালিকা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠানো হোক।

২. লাইসেন্স বিহীন বন্দুক রাইফেল বা অন্যকিছু পেলে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

৩. হিন্দুদের উৎখাত করতে হবে তবে মালি, মেথর, ধোপা ও জেলেরা এর আওতায় পড়বে না।

৪. বৌদ্ধদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যাতে তারা সুখে শান্তিতে পাকিস্তানে বসবাস করতে পারে। ইউনিয়ন ইউনিয়নে বৌদ্ধদের সংখ্যা কেমন তা জেনে জানাতে হবে।

৫. আওয়ামী লীগের যারা আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেছে তাদের একটি ফর্মাল ডিকলারেশন দিতে হবে এই মর্মে যে—

   (a) That the defunct Awami Legue works for the disintegration of Pakistan and separation of East Pakistan for virtual amalgamation with India.

   (b) The said political party spreads class-hatred among the Muslim of Pakistan, encourages their racial and Provincial clashes and regionalism to the great harm of Pakistan.

৬. প্রাক্তন এবং বর্তমানে যারা সামরিক বাহিনিতে আছে তাদের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।[৬০] ইত্যাদি।

এই কমিটির একটি সভার খবর প্রকাশিত হয়েছিল ২৬ অক্টোবর ১৯৭১ সালে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে। খবরটি ছিল এরকম—"সম্প্রতি লাকসামে শান্তিকমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানানো হয়। শান্তিকমিটির সভাপতি তার ভাষণে দুস্কৃতকারী ও ভারতীয় চরদের প্রতিরোধ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। দশ হাজারেরও অধিক লোক সভায় যে কোনো

---

৫৯. আজহার মিয়াকে ছলিমুদ্দিন মিয়ার চিঠি, ২৮.৫.১৯৭১।

৬০. Resolution 7 Central Peace Committee Meeting, Laksam 6.5.1971.

মূল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য পুণরায় শপথ গ্রহণ করে।"[৬১]

শান্তিকমিটির আবার কিছু সংশ্লিষ্ট কমিটি ছিল। এরকম একটি ছিল ঢাকার মোহাম্মদপুরের 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি সংরক্ষণ অ্যাকশন কমিটি'। আগস্টের ৯ তারিখে তারা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা গোপনে তাদের বিশ্বস্তদের মধ্যে বিলি করে। নিচে তার অনুবাদ দেয়া হলো—

"১. উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং বিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক বিষয় করা হোক। বাংলা সাইনবোর্ড, নম্বর প্লেট ও নাম অপসারণ এবং সংস্কৃত ধরনের বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান হরফ ব্যবহার করতে হবে।
২. যে কাফের কবি নজরুল ইসলামের ছেলেদের হিন্দু/বাংলা নাম রয়েছে তার রচনাসহ বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির হিন্দু প্রভাবিত অংশসমূহ বর্জন করতে হবে।
৩. পূর্ব পাকিস্তানের রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় করতে হবে উর্দু অনুষ্ঠানের জন্য।
৪. আমাদের পবিত্র ভূমিতে পাকিস্তানবিরোধীদের আসতে দেওয়া হবে না (যেমন, ইহুদিবাদী দুশ্চরিত্র ইসলামের শত্রু এডওয়ার্ড কেনেডি)।
৫. বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতির কারণে বাঙালি সরকারি কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের ওপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখতে হবে, (পরে তাদের সামরিক বিচার করে হত্যা করতে হবে)।
৬. জাতির স্বার্থে উচ্চপদ থেকে বাঙালি অফিসারদের দু'বছরের জন্য অপসারণ করতে হবে।
৭. রাজাকার বাহিনীর বেতন এবং শান্তিকমিটির ব্যয় নির্বাহের জন্য হিন্দু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
৮. কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে ইউ.এস.এস.আর.ইউ. কে এবং অন্যান্য শত্রু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।
৯. বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য বাস্তুহারাদের সাহায্য দ্রব্য এবং উর্দুভাষী খাঁটি পাকিস্তানিদের মধ্যে বিতরণের জন্য বাত্যা বিধ্বস্তদের সাহায্য তহবিল ব্যবহার করতে হবে।
১০. বীর পাকিস্তানি ও আমাদের সত্যিকারের বন্ধু রাষ্ট্র চীনের সৈনিকদের নামে শহরগুলোর নামকরণ করতে হবে।
১১. বর্তমান জাতীয় পুনর্গঠনের সময় তিন মাসের জন্য বিদেশি সাংবাদিক ও অনভিপ্রেত ব্যক্তিদের বহিষ্কার করতে হবে।"[৬২]

---

৬১. বিস্তারিত, *একাত্তরের ঘাতক দালালরা* পৃ. ৬৫-৬৬।

জামালগঞ্জ থানা শান্তিকমিটির সভাপতি ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ ওরফে নাককাটা লাল মিয়া। মনসুর জামালগঞ্জ, তাজিরপুর ও ধর্মপাশায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। মানুষজন তাকে লাল বান্দর বলেও ডাকতো।

জুলাই মাসে লাল মিয়া তার অনুচরদের নিয়ে কাজিরগাঁ পুরো জ্বালিয়ে দেয়। কিছু মহিলাকে ধর্ষণ করে। ৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে পিটিআই নির্যাতন সেলে নিয়ে আসে এবং সেখানে হানাদার বাহিনীর সহায়তায় তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। হালিব হাওড় এলাকায় এক নৌকা ভর্তি শরণার্থী হত্যা করে। সুরমা নদীর কালিপুর ঢাকায় ৫ জন হিন্দু শরণার্থীকে পানিতে চুবিয়ে হত্যা করে। লক্ষীপুরে তার নিজের বাড়ি ও জামালগঞ্জ হাইস্কুলে লালবান্দর তৈরি করেছিল নির্যাতন কেন্দ্র। ১১ আগস্ট লাল মিয়া ও তার অনুচররা সাচনা বাজার লুট করে। ঐ মাসেই হত্যা করে ৬ জনকে। জামালগঞ্জে পাকিস্তানিদের ১০/১২ বাঙ্কারে সে মেয়ে সরবরাহ করতো।[৬৩]

কুষ্টিয়ার খোকসা থানার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আকিমুদ্দিন। বাংলাদেশ সরকার তার নানা অপকর্মের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। পত্রিকায় সে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল—

"বাদী আর.সি. সাহা খোকসা থানার অধীনে জানিপুর গ্রামের অধিবাসী। বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় খোকসা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান অভিযুক্ত আকিমুদ্দিন কুষ্টিয়া শহর থেকে ৩৮ জন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর লোককে নিয়ে আসে এবং জানিপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলে অবস্থান করায় তাদেরকে চেয়ারম্যান ও অন্যচারজন অভিযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করে। এ সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পাকিস্তানি সেনাদের সহায়তায় ১৯৭১ সালের ২৪শে মে'র রাত থেকে গণহত্যা শুরু করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর বেআইনী দখলকে সমর্থন দেয়। এসব কজন অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাদীর বাড়িতে ডাকাতি করে এবং ডাকাতি করার সময় অমি কুমার সাহা নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে।"[৬৪]

লাকসামের বাগমারা ইউনিয়ন শান্তিকমিটির সভাপতি ছিলেন মুহাম্মদ জাকারিয়া ওরফে আদম শফিউল্লা। কুমিল্লা, লাকসাম এলাকায় এখনও লোকে তাকে রাজাকার আদম শফিউল্লাহ বলে চেনে। মুক্তিযোদ্ধা মেসবাহকে হত্যা করেন শফিউল্লাহ। আবুল কাসেম হৃদয় তার অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"লাকসামের হত্যাপুরী সিগারেট ফ্যাক্টরিতে গ্রাম থেকে পল্লীবালা ও কূলবধূদের ধরে এনে উলঙ্গ করে কারখানার ছাদের ওপর দু'হাত উপরে তুলে সারাদিন রেলিং বিহীন ছাদের ওপর হাঁটানো হতো। অনতি দূরে যাত্রীবাহী ট্রেন

---

৬২. ঐ, পৃ. ৬৬-৬৭।

৬৩. মহিবুর রহমান, প্রতিবেদন, *দৈনিক জনকণ্ঠ* ১৩.৪.২০০০।

৬৪. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১.৭.১৯৭২।

থামিয়ে যাত্রীদের এ দৃশ্য দেখানো হতো। রাতে দিনে বিভিন্ন কোঠায় মেজর গার্দিজি ও তার দোসররা চালাত তাদের ওপর নির্মম পাশবিক নির্যাতন। চাবুকের আঘাতে এবং পাশবিক অত্যাচারে জর্জরিত রাতের গভীরে প্রায়ই ভেসে আসত মা-বোনদের বুকফাটা করুণ আর্তনাদ। হত্যা করে তাদের ফেলে দেয়া হতো গর্তে।"[৬৫]

আনসার আলী ছিলেন সাতক্ষীরায় তালা থানার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান। আনসার মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের নির্যাতন করে লাশ ফেলে দিতেন কপোতাক্ষ নদে। আনসার তালায় রাজাকার সৃষ্টি করেন। এক প্রতিবেদনে জানা যায়, রাজাকাররা তার নেতৃত্বাধীনে থেকে—

"এলাকার সুন্দরী গৃহবধূ, তরুণীদের ক্যাম্পে আটকে রেখে নরপশুরা পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। বেশ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে এই গং হত্যা করে তাদের পুরুষাঙ্গ কেটে মুখে ঢুকিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে।"[৬৬]

অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম ছিলেন দিনাজপুরের শান্তিকমিটির সভাপতি। দিনাজপুর শহরের মুন্সিপাড়ায় ডা. বাহারের দোতলায় স্থাপন করেন শান্তিকমিটির অফিস।

অভিযোগ আছে, ঝানঝিরা গ্রামের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি। পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর নাসেরকে নিয়ে ঐ গ্রামটি ঘিরে ফেলেন ২৮ অক্টোবর। কাশেম তাদের খবর দিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে আছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা হটে যান। হানাদাররা দু'জন মুক্তিযোদ্ধাসহ ১৪ জনকে আটক করে হত্যা করে। এছাড়া তার অফিস ব্যবহার হতো নারী ধর্ষণের জন্য।[৬৭]

আবদুল মজিদ তালুকদার ছিলেন শান্তাহার শান্তিকমিটির সভাপতি। অভিযোগ আছে, পাক বাহিনী ও রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে ২১০ জন বাঙালিকে হত্যা করে। কয়েকটি গ্রামও জ্বালিয়ে দেয়া হয় অনুচরদের সাহায্যে। সান্দিরা নামে এক গ্রামে হত্যা করা হয় ৯০ জনকে।[৬৮]

আবদুল্লাহ হেল ওয়াছেক টাঙ্গাইল শান্তিকমিটির নেতা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে "নারী সরবরাহ, হিন্দুদের মুসলমান বানানোর জন্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।"[৬৯]

বরিশালের নলছিটি শান্তিকমিটির সভাপতি ছিলেন আমির গাজী। তার জামাই ইউসুফ আলী খান। শ্বশুরের নির্দেশে জামাই শান্তিকমিটি নির্দেশাবলি

---

৬৫. আবুল কাশেম হৃদয়, প্রতিবেদন, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৫.১.২০০১।
৬৬. ফখরে আলম, 'প্রতিবেদন', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২১.১.২০০১।
৬৭. সাজেদুর রহমান শিরু, 'প্রতিবেদন' *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১১.২.২০০১।
৬৮. মো. হারেজুজ্জামান, 'প্রতিবেদন', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১.২.২০০১।
৬৯. ঐ, ১৩.৩.২০০১।

পালন করতেন। শ্বশুর-জামাই মিলে নলছিটিতে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। অভিযোগ অনুসারে ১৯৭১ সালের ১১ ও ১৩ মে এবং ১৩ ও ১৭ নভেম্বর শান্তি কমিটির নির্দেশে ইউসুফ বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড চালায়। ১১ মে থানার দারোগাকে দিয়ে শান্তিকমিটি ১২ জন ব্যবসায়ীকে ডেকে আনে। থানায় তাদের দু'দিন আটকে রেখে ১৩ মে সুগন্ধা নদী সংলগ্ন তামাকপট্টির খালে ১২ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ১৩ নভেম্বর হানাদার বাহিনীকে নিয়ে চাচৈরে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ও ১৭ নভেম্বর ৪ জনকে হত্যা করে। ইউসুফের অনুরোধে হানাদার বাহিনী নদীর পাড়ে কয়েকশো বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়।[৭০]

কালীগঞ্জ থানা শান্তিকমিটির সেক্রেটারি ছিল সামছুর রহমান। স্বাধীনতার পর তাকে ও কালিগঞ্জ থানার ওসি ইউসুফ আলী চৌধুরীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। *দৈনিকসংবাদ* অনুসারে—"কালিগঞ্জ থানার শান্তিকমিটির সেক্রেটারি সামছুর রহমান ওরফে শাহজাহান মিয়াকে অগ্নি সংযোগের কাজে ও পাকবাহিনীকে সহায়তা করার দায়ে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। গতবছর ১৬ জন প্রায় ১০০০ পাক বাহিনী আসামীদের সহায়তায় বদ্দীর গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং তার বাড়ির মোট ১৬টি ঘরে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলে। এতে তার প্রায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। বাদী বলেছেন তিনি আওয়ামী লীগ কর্মী ও তার এলাকার মুক্তি সংগ্রামের একজন সংগঠক ছিলেন বিধায় ইউসুফ আলী চৌধুরী উক্ত শান্তিকমিটির সেক্রেটারী সাক্ষাতে তাকে নানারকম ভয় দেখায় এবং তার কাছ থেকে মুক্তির বিনিময়ে ৫০ হাজার টাকা ও আটজন যুবতী মেয়ে দাবী করে।"[৭১]

তৎকালীন ঈশ্বরদী থানার মুলাডুলি ইউনিয়ন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ইসহাক আলী খা। ঐ ইউনিয়নের ৯ জনকে হত্যার অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। ইসহাক ঐ সময় মুলাডুলি ও দাশুরিয়া এলাকায় রাজাকার বাহিনীও গড়ে তোলে এবং তাদের নিয়ে লুটপাত, হত্যা ও ধর্ষণ করত।[৭২]

তালেবুর রহমান ছিলেন কলাপাড়া থানা শান্তিকমিটির সদস্য। মুসলিম লীগ সদস্য তালেবের বাড়ি ছিল মিঠাগঞ্জে। প্রথমে এলাকার শহীদ মিনার ভাঙেন তালেবুর। তার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন, মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেয়া এবং চুরির অভিযোগ আছে। এলাকার বাসিন্দাদের মতে, তার অত্যাচারে মানুষ এত অতিষ্ঠিত ছিল যে স্বাধীনতার পর তার খোঁজ পড়ে। তালেবুর তখন দুই বছর মেয়ে সেজে পালিয়ে ছিলেন।[৭৩]

---

৭০. কাজী খলিলুর রহমান, প্রতেবেদন, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২.৪.২০০০।

৭১. *দৈনিক সংবাদ*, ৮.৯.১৯৭২।

৭২. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, প্রতেবেদন, ৯.২.২০০০।

৭৩. শওকত মিল্টন, মেজবাউদ্দিন নান্নু, 'প্রতিবেদন' *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৪.১.২০০১।

পার্বতীপুর থানা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন নঈম কাজী। তার নৃশংসতা ছিল অকল্পনীয়। নঈম ও তার অনুচররা কোনো একটি গ্রাম টার্গেট করে সেখানে যেত। "কয়লা চালিত ২২৮ নং ইঞ্জিনটি ঘাতক বাহিনী টেনে নিয়ে যেত টার্গেট পয়েন্টে। সেখানে জবাই করে হত্যা করা হতো কিছু মানুষকে। কিছু মানুষকে ধরে এনে রেল ইঞ্জিনে শুইয়ে রেখে তার ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়া হতো ঘাতক ট্রেন। আবার কাউকে কাউকে হাত-পা বেঁধে ঘাতক ইঞ্জিনের অগ্নিগর্ভ বয়লারে জীবন্ত নিক্ষেপ করা হতো। রশি পাওয়া না গেলে ইঞ্জিনের বয়লারে নিক্ষেপ করার আগে ঐ ব্যক্তির হাত দু'টি কেটে দেয়া হতো। প্রচণ্ড তাপে খৈ ফোটার মতো করে ফুটত মানুষের হাড়। আর সেই শব্দ শুনে পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করে উঠত নঈম কাজী ও তার দলবল। শোনা যায়, শেষ দিকে হত্যার নেশায় এত বেশি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল নঈম কাজী যে, প্রতিদিন অন্তত ৫ জন করে লোককে এভাবে পুড়িয়ে মারা হতো। একবার টার্গেট পয়েন্টে গিয়ে কোন লোকজন না পেয়ে ঘাতক বাহিনীরই একজনকে পুড়িয়ে মারে নঈম কাজী।" পার্বতীপুরে এমন কোনো গ্রাম ছিল না যেখান থেকে নঈম কাজীর নেতৃত্বে/পরামর্শে তার অনুচররা লোক ধরে এনে হত্যা করেছে।[৭৪]

পিয়ারা মিয়া ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার শান্তিকমিটির সভাপতি। করাচিতে থাকতেন তিনি, মুক্তিযুদ্ধের আগে নবীনগর ফিরে আসেন এবং শান্তি কমিটি প্রতিষ্ঠা করে সভাপতি হন। নবীনগরে পাকিস্তানী সৈন্যদের তিনিই প্রথম পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন। তার পরামর্শে পাকবাহিনী ইব্রাহিমপুর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে থাকার অভিযোগে এক ছাত্রকে হত্যাও করা হয়।[৭৫]

ফরিদপুরে শান্তিকমিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে 'ইয়ুথ পিস কমিটি'। এই কমিটি ফরিদপুরের আলবদর বাহিনীর সঙ্গে মিলে একত্রে কাজ করেছে। এরা মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এনে জবাই করে নদীতে ফেলে দিত যেটা ছিল আলবদরদের ট্রেডমার্ক।[৭৬]

কুষ্টিয়ার শান্তিকমিটির সদস্য ও রাজাকার বাহিনীর প্রভাবশালী সদস্য ছিল মজিদ বিহারি। এই লোক কুষ্টিয়ার তখড়ুয়াপাড়ার বাহাদুর বিশ্বাস লেনের দিরাজ শেখের পরিবারের ৮ জন ও কোহিনূর মিলকো ব্রেড অ্যান্ড বেকারির মালিক পরিবারের ১৬ জনকে হত্যা করেন।[৭৭]

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের মজিবর রহমান ছিলেন সিরাজগঞ্জ মহকুমা শান্তিকমিটির সদস্য। ১৭ জুন সিরাজগঞ্জে প্রথম

---

৭৪. সাজেদুর রহমান শিলু, 'প্রতিবেদন' *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৪.৪.২০০০।

৭৫. রিয়াজউদ্দিন জালি, *ঐ*, ১২.৩.২০০১।

৭৬. আবু সাঈদ খান, *মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর*, ঢাকা।

৭৭. এম এ রকিব, 'প্রতিবেদন', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৪.২.২০০১।

মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তা পরিচিত ভদ্রঘাটের যুদ্ধ নামে। সে যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর কয়েকজন নিহত হয়। মজিবরের প্ররোচনায় পাকিস্তানি সৈন্যরা শিয়ালকোল গ্রামে ঢুকে অনেককে গুলি করে হত্যা করে। এ ছাড়াও মজিবুর বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিজে হত্যা করে ও কয়েকজনের গ্রামের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।[৭৮]

নড়াইল জেলা শান্তিকমিটির সভাপতি ছিলেন জামায়াত নেতা 'মওলানা' সলেমান। তিনি ও তার ভাই রাজাকার কমাণ্ডার রুহুল কুদ্দুস মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস নড়াইলে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। পানি উন্নয়ন বোর্ডে ছিল তার ক্যাম্প। ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে তরফদার বাড়ির নয় জনকে ধরে এনে প্রথমে নির্যাতন করে তারপর মাটি চাপা দেয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঙালি সমর্থকদের ধরে এনে চিত্রা নদী তীরে হত্যা করত। অনেক হিন্দু ও আওয়ামী লীগের বাড়ি ঘর এই দুই ভাই লুট করে। দখলও করে।[৭৯]

গোপালগঞ্জের কাশিয়ারী থানা শান্তিকমিটির সভাপতি ছিলেন ডাক্তার সলেমান সরদার। তার নেতৃত্বে রামদিয়া বাজারে আগুন দিয়ে লুট করা হয়। খুন করা হয়েছে প্রায় এক ডজনকে। নারী ধর্ষণের অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে। হরকতউল জিহাদের কাশিয়ারী থানার সভাপতি ছিলেন তিনি পরবর্তী সময়ে।[৮০]

'মওলানা' ও 'প্রিন্সিপাল' হান্নান ছিলেন ঢাকার রূপগঞ্জের শান্তিকমিটির সাধারণ সম্পাদক। রূপগঞ্জের রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন মওলানা। রূপগঞ্জে কমপক্ষে আটজন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা ও বেশ কিছু যুবতী ও গৃহবধূ ধর্ষণের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে।[৮১]

আলাউদ্দিন সিকদার ছিলেন পটুয়াখালির গলাচিপা থানার শান্তিকমিটির সাধারণ সম্পাদক। ২৬ এপ্রিল তার সহযোগিতায় হিন্দু অধ্যুষিত পুরান বাজার এলাকায় হানাদার বাহিনী অগ্নিসংযোগ করে। এরপর আলাউদ্দিন পাকিস্তানিদের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর ধনাঢ্য হিন্দু নিবারণ কবিরাজ, আওয়ামী লীগের সম্পাদক আলী আজম খানের বাড়িতে আগুন দিয়ে লুটপাট করে তাদের হত্যা করা হয়। এ ছাড়া ডিসেম্বর পর্যন্ত সালাউদ্দিন আরো কয়েকজনকে হত্যা করে।[৮২]

সাতক্ষীরার আশাশুনি থানা শান্তিকমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এ এম রিয়াছত আলী। জামায়াত নেতা ছিলেন সে এলাকার। কালীগঞ্জের বীর

---

৭৮. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯.৩.২০০১।

৭৯. সাজেদ রহমান ও রিফাত বিন তাহা, 'প্রতিবেদন' *ঐ*, ১৫.১.২০০১।

৮০. মোজাম্মেল হোসেন মুন্না, *ঐ*, ১৯.১.২০০১।

৮১. *ভোরের কাগজ*, ১৩.১১.২০০৭।

৮২. *সাপ্তাহিক*, ১৮.১২.২০০৮।

মুক্তিযোদ্ধা ইউনুসকে হত্যা করে। রিয়াছত। "শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ থানায় মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার খলনায়ক এই রাজাকার।"[৮৩] একই ধরনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায় জামায়াত নেতা ঠাকুরগাঁ শান্তিকমিটির সম্পাদক 'মওলানা' তমিজউদ্দিন।[৮৪]

উলিপুর শান্তিকমিটির সদস্যর পরিকল্পনা করে হাতিয়া ইউনিয়নে গণহত্যা চালায়।[৮৫]

এটি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তবে, প্যাটার্নটি একই রকম। এখানে সামগ্রিকভাবে এবং শান্তিকমিটির কয়েকজন চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের বয়ান আছে। এখন কল্পনা করুন, সারা দেশের কথা। ঢাকা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত শান্তি কমিটি বিস্তৃত ছিল। প্রতিটি শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যরা লুট খুন জখম ধর্ষণের সঙ্গে কমবেশি জড়িত ছিল। এবং প্রতিদিনই তারা এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাহলে, সারা দেশের মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

শান্তিকমিটির সদস্যরা কেমন ছিল তা নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকটি কেস স্টাডি দেয়া হয়েছে। যে কয়জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এরা সবাই ছিলেন শান্তিকমিটির প্রভাবশালী সদস্য।

---

৮৩. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২১.৩.২০০১।

৮৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৮.১.১৯২২।

৮৫. মনোরঞ্জন রায়, 'উলিপুর' আবু মো. দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ২খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২০২।



তৃতীয় পর্ব

শান্তিকমিটির কতিপয় সদস্য: কেস স্টাডি

১১

যে চারজন নিয়ে আলোচনা করছি তারা হলেন শান্তিকমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মেজর (অব.) মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন, রাজশাহী শান্তিকমিটির প্রধান মোহাম্মদ আয়েনউদ্দিন, কুষ্টিয়া শান্তিকমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট সাদ আহমদ এবং মৌলভীবাজার শান্তিকমিটির মোঃ মিছির উল্লাহ। এদের নিয়ে আলোচনার প্রধান কারণ এরা চারজন আত্মজীবনী লিখেছেন। সেই আত্মজীবনী বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছি একজন শান্তিকমিটির সদস্য বা একজন স্বাধীনতা বিরোধী বা একজন রাজাকারের মানস গঠন কেমন। কেন তারা রাজাকার হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার পরও রাজাকার থাকতে চেয়েছেন। এটি বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা সম্ভব হবে ১৯৭১ সালে রাজাকার, শান্তিকমিটির সদস্য বা একজন আলবদর কেন তারা হয়েছিলেন এবং কেন এতো খুন জখম ধর্ষণ করেছেন এবং কেন তারা অনুতপ্ত হননি। এইসব অন্যায় কর্মকাণ্ডগুলিকে তারা আদর্শ বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমান বিবেচনা করেছেন।

যেসব গ্রন্থ বিশ্লেষণ করেছি সেগুলি হলো—

১. মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন, *আমার দেখা ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ*, বুলবুল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৪৪, দাম ১৫০ টাকা।
২. মোহাম্মদ আয়েনউদ্দিন।
৩. সাদ আহমদ, *মুজিবরের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন*, ঢাকা।
৪. মোঃ মিছির উল্লাহ, *স্মৃতির প্রেক্ষাপটে মৌলভীবাজার*, ১৯৮৭, পৃ. ১০০, দাম ২৫ টাকা।

প্রথমেই শুরু করা যাক মেজর (অব.) মোহাম্মদ আফসারউদ্দিনের আত্মজীবনী দিয়ে। আমার মনে হয়েছে তিনি একজন বিভ্রান্ত বা কনফিউজড ব্যক্তি। ব্রিটিশ আমলে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ায় সহায়তা করেছিলেন এবং বাঙালিদের প্রতি যে অবিচার হচ্ছে

তাও তিনি অনুধাবন করেছিলেন। অন্তত তার লেখা তা-ই বলে। অবসর গ্রহণের পর রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছেন, নিজ গ্রামে জনহিতকর কাজ করেছেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও অন্তিমে তার পরিচয় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে সহায়তা করার জন্য গঠিত শান্তি কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। অর্থাৎ তিনি রাজাকার ছিলেন।

কেন তিনি শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তার একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যার সঙ্গে অন্য রাজাকারদের দেয়া ব্যাখ্যার কোনো অমিল নেই। সে প্রসঙ্গে পরে আসবো। তাঁকে 'কনফিউজড' বা বিভ্রান্ত বলছি এ কারণে যে তিনি নিজেকে বাঙালি মনে করেন। বৃহৎ বঙ্গ রাষ্ট্র কামনা করেন আবার পাকিস্তানি আমলেও বিশ্বাস করেন। অন্যদিকে হিন্দু, বিশেষ করে বর্ণহিন্দু ও ভারতবিদ্বেষ তাঁর প্রবল। অন্য রাজাকাররা বাঙালি বা বাঙালিত্ব বা বাংলাদেশে বিশ্বাসী নয়। আফসারউদ্দিনের আবার বাংলাদেশ মেনে নিতে আপত্তি নেই। এখানেই অন্য রাজাকারদের সঙ্গে তার পার্থক্য। কিন্তু, তার লেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজাকারি চিন্তার মৌল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পার্থক্য নেই। রাজাকারি চিন্তার মৌল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশ হিসেবে ভারত এবং সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু সম্পর্কে বিশেষ কিছু ধারণা। আফসারউদ্দিনের লেখায় সেই ধারণা-ই বারবার ফিরে ফিরে এসেছে।

আফসারউদ্দিন তিনটি বই লিখেছেন। *আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ*, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও আমার সৈনিক জীবন* এবং *আমার দেখা ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।* বই তিনটির মধ্যে শেষোক্তটিই আমাদের বিচার্য। আফসারউদ্দিন ফাউন্ডেশনের পক্ষে বুলবুল প্রকাশনী বইটি প্রকাশ করেছে ১৯৯৩ সালে। ২৪৪ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম ১৫০ টাকা।

মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন কেন বইটি লিখেছেন? কারণ, তার "স্মৃতিপটে সঞ্চিত দীর্ঘ প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর এই উপমহাদেশের তিন দেশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মধ্যে যাহা আমার স্মরণে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে তাহা এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছি।" অর্থাৎ সব সত্য তার কাছে সত্য নয়, যা তার কাছে সত্য মনে হয় সেটাই সত্য। তবে এটাও তিনি বলেছেন, কারো কাছে সত্য যদি অন্যভাবে প্রতিভাত হয় তা হলে তিনি তা অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারেন।

বইয়ে তিনি আর্য আমল থেকে এরশাদ আমল পর্যন্ত 'সত্য' ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন এবং যে যে ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত তার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বইটি সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, স্মৃতিকাহিনীও নয়, দুইয়ের মিশ্রণ। তিনি পাঠকদের উদ্দেশে বলেছেন, বইটি পড়ে "তারা যেন বিবেচনা করেন আমার লেখাগুলি ঐতিহাসিক সত্য ও যুক্তিযুক্ত হলো কিনা।"

ঠিক আছে, আমরা সে বিচারে যাবো। তবে সে বিচারের আগে আরো দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই, তা হলো তাঁর লেখার ধরনটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

বইয়ের শুরুতে 'প্রকাশকের কথা'য় আফসারউদ্দিনের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনীর একটি প্রচারপত্র (১৯৮৯) উদ্ধৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় ১৯৮০ সালে এক 'মহতী জনসভায়' এ বাহিনী গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল চারটি—

* "বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়ত ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ, জুলুম ও শোষণ বন্ধ করা।
* বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা নিশ্চিত করণে জিহাদ করা।
* রুশ আক্রমণ প্রতিহত করতে ভ্রাতৃপ্রতিম আফগান মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য করা।" এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

দীর্ঘ এই প্রচারপত্রে উদ্দেশ্য বিবৃত হওয়ার পর দেখা যায় বাকি সব বক্তব্য ভারতের বিরুদ্ধে। মুজাহিদ বাহিনীর নাম ভারতবিধ্বংসী মুজাহিদ বাহিনী দিলে তা আরো যুক্তিযুক্ত হতো।

প্রচারপত্রের মূল বক্তব্য হলো, ভারত তার প্রতিবেশী সব রাষ্ট্রকে 'তাঁবেদার রাষ্ট্র' করতে চায়। বাংলাদেশকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চায়। "এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহু গুপ্তচর ও গেরিলাবাহিনী তৈয়ার করেছে। দিল্লী সরকারের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই এই গেরিলা বাহিনী পরিকল্পনা মোতাবেক তৎপরতা শুরু করে দিবে। খুব সম্ভব প্রথম পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নরহত্যা, লুটতরাজ ও শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতার জন্য রিক্রুট পাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তারপর সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার বিষয়বস্তু তৈয়ার করবে।"

দেখা যাচ্ছে, রুশ আগ্রাসন বা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসন ঠেকানোর চেয়ে কল্পিত ভারতের আগ্রাসন ঠেকাতে মুজাহিদ বাহিনীর 'সর্বাধিনায়ক' মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন উৎসাহী ছিলেন। তার চারটি 'হুঁসিয়ারী"র মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

"সকল দল ও দেশপ্রেমিক জনগণকে ভারতীয় আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।"

খুব সম্ভব নব্বইয়ের দশকে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা এনডিপি নামে একটি দলও গঠন করেছিলেন। বইয়ের শুরুর দিকে সে দলেরও একটি প্রচারপত্র সংকলন করা হয়েছে। এ প্রচারপত্রের (১৯৯২) মূল বক্তব্য—

"আপনারা যারা স্বাধীন বাঙলাদেশের আশেপাশে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত জীবন অতিবাহিত করছেন তাদের নিকট আমাদের প্রস্তাব আসুন, স্বাধীনতাহীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে আপনাদের রাজ্য কয়টি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যোগ দিন। আমরা বাঙলা ভাষাভাষী সকলে মিলে এক স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী মহাবাংলাদেশ গঠন করি। দুনিয়ার বুকে বাংলা ভাষাভাষীদের এক মহাজাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। এপার বাংলা, ওপার বাংলা, সকল বাংলা লীন হোক এক মহা বাংলাদেশে।"

ভারতীয় আধিপত্য প্রতিরোধের জন্য খুব সম্ভব এই কৌশল। এবং আরো ঘোষণা করেছেন—"আমরা যদি হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলে সকল ধর্মাবলম্বি (হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান) একত্রে সুখে-দুঃখে এক বাংলাদেশের মাটিতে বসবাস করতে পেরে থাকি, তবে আজও পারব। কোন স্বার্থান্বেষীর বাধা আমরা মানবো না।"

উত্তম বক্তব্য। বেশ সেক্যুলার সেক্যুলার মনে হয়। তা হলে, দেখা যাক ইতিহাস বর্ণনাটা তিনি কীভাবে করেছেন। তবে, এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, 'গ্রন্থকারের আরজ' এ তিনি জানিয়েছেন, যে নতুন বাংলাদেশ তিনি গঠন করতে চান সেখানে "দেশরক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের নিয়মিত সামরিক বাহিনীর শক্তি বহুগুণ বর্ধিত হবে।"

রাজাকারদের সামরিক বাহিনীপ্রীতি একটি ঐতিহ্য। এর কারণে, পাকিস্তান আমলে সামরিক বাহিনী সম্পর্কে একটি মিথ গড়ে তোলা হয়েছিলো সাধারণ মানুষকে দমিত রাখার জন্য। যেমন, একজন পাকিস্তানি সৈন্য চারজন ভারতীয় সৈন্যের সমান। এই ইমেজ সৃষ্টি করতে গিয়ে এ ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে পাকিস্তানে ওপরে আল্লাহ, নিচে মিলিটারি। এই ধারণা বলবৎ থাকায় পাকিস্তান কী ধরনের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তা পাঠকমাত্র-ই জানেন। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে, পাকিস্তানিদের মতোই এক দাসজাতির বিকাশ হতো। রাজাকাররা যা চেয়েছিল, যা তাদের কাম্য নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়। এ কারণে এখনও দেখা যাবে, রাজাকারি চিন্তার মানুষমাত্রই 'দৈনিক ইনকিলাব'—এর গ্রাহক যা পাকিস্তানদের মুখপত্র। এবং ১৯৭১ সালের পর আজ নতুন শতাব্দীতে এসেও দেখা যাচ্ছে প্রাক-১৯৭১-এর মতো বাংলাদেশের মানুষ বিভক্ত হয়ে গেছে সুস্পষ্ট দুটি মতাদর্শে।

১২

বইয়ের শিরোনাম দেখে মনে হতে পারে, লেখক তাঁর জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন এ গ্রন্থে। কিন্তু, আসলে তা নয়। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস

বর্ণনা করতে চেয়েছেন। বইয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠা থেকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা বর্ণনা করেছেন। এই ইতিহাস থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ইতিহাসকে বিচার করেছেন।

'প্রাচীন ভারতের কিছু কথা'য় তার মতামত এরকম—

"১. সেই আর্যদের আমলেও দেখা গেছে যে ভারত বেশ কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল তারা কখনও পূর্ণ ভারতকে এক রাষ্ট্রের অধীন করতে পারেনি যদিও তারা ধর্মে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ছিল।"

এই অদ্ভুত মন্তব্য কী কারণে? কারণ আর কিছুই নয়, তিনি দেখাতে চেয়েছেন ভারত সবসময় বিভক্ত ছিল এবং বিভক্ত থাকবে। থাকুক, আর কী রাজ্য ছিল তখন ভারতে? আর্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু হলে বাকিরা কী ছিল? হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কি আর্যদের থেকে?

২. "মিথ্যা প্রচারে ভারতীয় আর্যরা পৃথিবীর গুরু।"

এই মন্তব্যের কারণ, মহাভারত। কিন্তু, মুশকিল হচ্ছে যে, ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার। এক ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থসমূহকে খুব কমই বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করলে নিজের ধর্মের জোর থাকে কই?

ছয় পৃষ্ঠার মধ্যে কোম্পানি আমলে চলে এসেছেন লেখক। এবং অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন 'কলিকাতায় রাজধানী হিন্দুদের পোয়াবারো।' কেন এ শিরোনাম, বোঝা দুষ্কর।

'ঢাকায় ইংরেজদের হত্যাকাণ্ড' সম্পর্কে বক্তব্য—

৩. "মুঘল আমলে তা হলে দেখা যায় কি বিপুল সংখ্যক মুসলমান তখন ঢাকায় ছিল। তা না হলে এতগুলি বিরাট মসজিদ ও ঈদগা নির্মাণের প্রশ্নই আসত না, এখন প্রশ্ন হলো এই যে, বিরাট ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া তাতে সেই মোঘল আমলের জনগোষ্ঠীর বংশধরদের পুরনো শহর ছাড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? কারণ, সেই আমলের সকল মুসলমানদের ইংরেজ ও তাদের দালালরা শত্রু মনে করত। এ জন্য তাদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার সাক্ষী পুরানো ভিক্টোরিয়া পার্ক। বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক। যেখানে হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে ব্রিটিশরা ফাঁসি দিয়েছে। যা-ও বা কিছু লোক বেঁচে ছিল তাও প্রাণ ভয়ে শহর ছেড়ে কোথাও পালিয়ে গেছে।"

মোঘল আমলে ঢাকায় লোকসংখ্যা কতো ছিল এবং কোন ধর্মের কতো ছিল সে সম্পর্কে আফসারউদ্দিনের কোনো ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। আর ভিক্টোরিয়া পার্কে ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো দশজনকে। যারা অভিযুক্ত হয়েছিল ১৮৫৭ সালের 'বিদ্রোহের' সঙ্গে।

৪. হিন্দুরা "ভারতকে প্রথমে দ্বিখণ্ডিত (পণ্ডিত নেহেরু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট) পরে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে (ইন্দিরা গান্ধী যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট) ভারত উপমহাদেশকে তৃখণ্ডিত করা হলো, ভারত উপমহাদেশ আরও কত খণ্ড হয় তা ভবিষ্যতই বলতে পারে।"

অর্থাৎ, ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো মুসলমানদের কারণে নয়। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি বা বাঙালিরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেনি। কারণ, পাকিস্তান তো ভেঙেছেন ইন্দিরা গান্ধী।

"তা হলে ইতিহাসের বিচারে কাদের লাভ হলো? ভারতীয় বাংলা ভাষাভাষীদের না বাংলাদেশীয়দের?" এ প্রশ্নের পর তার সিদ্ধান্ত হলো—

৫. "মহা বাংলাদেশ কায়েমই ভারতীয় বাঙালিদের বাঁচার উপায়—

তবে এখনও উপায় আছে : আমরা যেমন পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হয়েছি তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের আশেপাশে যত বাংলা ভাষাভাষী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে যেমন পশ্চিমবঙ্গ, সাবেক কুচবিহার, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব বাংলা ভাষাভাষী সকলে মিলে ভারত থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে একত্রে মিলেমিশে এক অখণ্ড ও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী মহা বাংলাদেশ গঠন করা যায়। আবারও দুনিয়ার বুকে সকল বাংলাভাষাভাষীদের নিয়ে এক মহাজাতি আসলে সুপ্রতিষ্ঠ করা যায়। যদি হিন্দু মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলের সকল ধর্মাবলীরা (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান) একত্রে সুখে দুখে এক বাংলাদেশের মাটিতে বসবাস করতে পারে তবে আজও পারবে।"

তার পরই আবার বলছেন "আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পশ্চিম বাংলার ভাইবোনেরা আমাদের যে সর্বতোরকম সাহায্য করেছেন, প্রায় ১ কোটির মতো উদ্বাস্তু বাঙালিদের খাদ্য বাসস্থান সহ সার্বিক সাহায্য করেছিলেন তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। আজ যদি সীমান্তের ওপারের বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনদের প্রয়োজন হয় তবে বাংলাদেশ ততোধিক যথা সর্বস্ব দিয়ে বাঙালীদের কাছে এ দেশের ঋণ পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না।"

যিনি বিশ্বাস করেন হিন্দুদের জন্য সর্বনাশ হয়েছে তিনি আবার হিন্দুদের বাংলাদেশে আনতে চাচ্ছেন কেন? এ হিন্দুভীতির কারণ যদি ভারত আরও খণ্ডিত হয়।

৬. "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভারতীয় কংগ্রেস যতই দাবী বা গর্ব করুক, আসলে ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করেছেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি—আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৭. ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান হলো। ভারতীয়রা তো খুব খুশি (যেন মুসলমানরা খুশি হয়নি)। তাই মাউন্টব্যাটেন "ও ব্রিটিশ রাজকে খুশী করার জন্য একজন স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিককে প্রথম গভর্ণর জেনারেল না করে বরং আরো কিছুদিন ব্রিটিশের গোলামী করবার খুশীতে ভারতে ব্রিটিশ রাজের শেষ প্রতিনিধি ব্রিটিশ সন্তান লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল করে আরও কিছুদিন ব্রিটিশের সেবাদাস প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ করা হলো। আরও কিছু কারণ থাকতে পারে যে, প্রায় হাজার বছর মুসলমান ও খ্রিস্টানের নিকট পরাধীন থেকে রাজ্য শাসনে ভারত তাদের আরও কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। তাই তারা মাউন্টব্যাটেনকে রাষ্ট্র শাসন বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে ট্রেনিংয়ের জন্য প্রায় এক বছর রেখে দিলেন—তারপর ভারতের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সাথে লেডি মাউন্টব্যাটেনের একান্ত ঘনিষ্ঠতার কারণে হয়ত মাউন্টব্যাটেনকে আরও কিছুদিনের জন্য দিল্লীতে রাখা পণ্ডিত নেহেরু প্রয়োজন মনে করেছিলেন তাই স্বাধীন ভারতের ইংরেজ নাগরিক প্রায় ১ বছর ভারতের রাষ্ট্র প্রধানের কার্য পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন।"

বোঝা যাচ্ছে অনগ্রসর পাকিস্তানের জন্য 'ট্রেনিংপ্রাপ্ত' কারো কোন দরকার ছিল না কেননা তারা মুসলমান। আফসারউদ্দিন হয়ত জানেন না, পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় সেনাপতি ও পূর্ববঙ্গের গভর্ণর ছিলেন ব্রিটিশ। পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে ও অনেক ব্রিটিশ প্রশাসক কাজ করে গেছেন।

পাকিস্তান হওয়ার পর মেজর গনির নেতৃত্বে তারা কয়েকজন মিলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করেন। "মাঝে মাঝে ভাবি", লিখেছেন আফসারউদ্দিন, "আমরা গুটি কয়েক বাঙালি অফিসার যদি সেদিন পাকিস্তান আমলে (১৯৪৮ সন) এই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা না করতাম তবে ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধে কারা নেতৃত্ব দিত? মেজর গনি অবশ্যই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পিতা (পাপা টাইগার) তাই আমিও এই রেজিমেন্টের চাচা (চাচা টাইগার) বলে গর্বিত হতে পারি।"

আফসারউদ্দিন জানিয়েছেন, "পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক চাকুরিরত অবস্থায় এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হিসেবে সারাটা পাকিস্তান সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হলো যে, বহু পাঠান, বেলুচি, সিন্ধু ও পাঞ্জাবীদের মনে বাংলাদেশিদের জন্য অফুরন্ত সম্মান, সহমর্মিতা ও মায়া মহব্বত রয়েছে।"

ভাবি, এতো মায়া মহব্বত ১৯৭১ সালে কোথায় উবে গেল? পাঠান, বালুচি, পাঞ্জাবি সৈন্যরা এসে পাখির মতো কেন বাঙালিদের গুলি করে মারলো?

১৯৬০ সাল পর্যন্ত এভাবে প্রথমে পুরো উপমহাদেশ তারপর পাকিস্তানের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন আফসারউদ্দিন। ১৯৩০-এর আগের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভাসাভাসা। কিন্তু সেই জ্ঞান নিয়েই বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করে গেছেন।

এই সমস্ত মন্তব্য তুলে ধরে যে, তিনি ছিলেন বিভ্রান্ত। ১৯৪৭-এ বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান চেয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমানও সেজন্য আন্দোলন করেছেন, তাতে অস্বাভাবিকতাটি কী? যাদের মোহভঙ্গ হয়েছে তারা বাংলাদেশ আন্দোলন করেছেন। আফসারউদ্দিনের মোহভঙ্গ হয়নি। নাও হতে পারে, এবং এ কারণে তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানরক্ষায় এগিয়ে গেছেন। মুশকিল হচ্ছে আফসারউদ্দিন সেটা মানতে রাজি নন। তিনি ভারতকে একবার হিন্দু রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করেন আবার পশ্চিমবঙ্গকে আহ্বান জানান পূর্ববাংলার সঙ্গে যুক্ত হতে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি পরস্পরবিরোধী মনে হলেও মূল তত্ত্বটি এক। তা হলো, ভারতও হিন্দু। ভারত পাকিস্তান ভেঙেছে। অর্থাৎ হিন্দুরা মুসলমানদের হারিয়েছে। সুতরাং হিন্দুদের হারাতে হবে। অর্থাৎ ভারতকে ভাঙতে হবে। সেজন্যই এই উদাত্ত আহ্বান।

১৩

১৯৬২ সাল থেকে 'আমার জীবন'-এর উল্লেখ করেছেন আফসারউদ্দিন। এ বছর তিনি পেনশন নেন এবং তার ভাষায়, "নির্দলীয়ভাবে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যোগ দেই।" এর একটি হলো পূর্ব পাকিস্তান প্রাক্তন সামরিক সমিতি গঠন।

এসব প্রচেষ্টার কারণে নিজ এলাকায় পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনে বরিশালের হিজলা মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌর নদী ও উজিরপুর থেকে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পরপরই নিজের জেলার বিভিন্ন দাবিদাওয়ার কথা তুলে ধরতে লাগলেন। এ সম্পর্কিত কিছু পেপার কাটিংও দিয়েছেন। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানাতে থাকেন। ২৮ মার্চ ১৯৬৩ সালে 'পাকিস্তান অবজারভার' লিখেছিলো, আফসারউদ্দিন জাতীয় সংসদে বলেছিলেন— "East Pakistan were being treated like Negroes in America in respect of military training by the Government."

এরপর হঠাৎ দেখি তাঁর একটি উপশিরোনাম 'পাকিস্তান ভাঙবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরাই দায়ী', বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে বৈষম্যই তার মনে এ ধারণার সৃষ্টি করেছিলো। সামরিক বাহিনী সম্পর্কে তার বিভিন্ন সংসদীয় বক্তৃতা

"পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মহলে ও সামরিক বাহিনীর নিকট দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। আমার নামও এইভাবে আমার অলক্ষ্যে বাংলাদেশে গণমনে ছড়িয়ে পড়ল।" শুধু তাই নয়, "১৯৬৪ সনের শেষদিকে বা ১৯৬৫ সনের প্রথম দিকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির উপরের ক্লাসের একটি ছেলে এসে আমাকে বলল যার সারমর্ম এভাবে বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানীদের বাঁচতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। এজন্য ছাত্র ও যুবকদলের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। ঐ ছাত্রটি আরো বললো যে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডিপুটি হাইকমিশন তাকে কথা দিয়েছেন, এই মুক্তিযুদ্ধে যত অস্ত্র এবং টাকা পয়সা প্রয়োজন হবে তা ভারত সরকারের পক্ষে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন তার ব্যবস্থা দায়িত্ব নিবে। এখন তাদের দরকার শুধু এই বিদ্রোহ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একজন উপযুক্ত প্রাক্তণ সামরিক অফিসার। তাই এই নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমাকেই তারা মনে মনে বেছে নিয়েছে।"

আফসারউদ্দিনের মনে হয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তান তখন প্রস্তুত নয়। তা ছাড়া তার বুঝতে বাকি ছিল না যে "ভারত সরকার এই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে আরও ছোট ও দুর্বল করা।"

এর আগে তিনি বলছেন পাকিস্তান ভাঙার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা দায়ী। পাঁচ পাতা পরে বলছেন, ভারত পাকিস্তান ভাঙ্গতে চায়। ১৯৬৬ সাল থেকে আফসারউদ্দিন গুজব শুনছিলেন যে, নৌবাহিনী অফিসার ও জোয়ানরা স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিচ্ছে। "পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য দাবানলের মতন সকল জাহাজে এবং করাচী বন্দরের স্থায়ী নৌঘাঁটিতে বাঙ্গালি অফিসার ও জোয়ানদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চলছে।"

পাকিস্তান সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঘোষণা ও লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনকে আসামি করায় এই গুজবের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তার মতে, "বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্ব খতম করার উদ্দেশ্যে" শেখ মুজিবকে মামলার ১নং আসামি করা হয়। যে কারণে "বাঙালিদের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক হিসেবে তিনিও সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন আর এই ষড়যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মূল নায়ক লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নাম সাধারণ একজন বিদ্রোহীর সারিতে স্থান দেন।" মোয়াজ্জেম আফশোস করে বলেছিলেন "প্রকৃত বিদ্রোহ ও আগরতলা ষড়যন্ত্র নিজের জীবন বিপন্ন করলাম, আর ভাগ্যের কী পরিহাস এই ষড়যন্ত্রের ফল পেল শেখ মুজিবর রহমান।" ২৫ মার্চ মোয়াজ্জেম হোসেনকে গুলি করা হয় আর শেখ মুজিবকে বন্দি। "এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারেও কমান্ডার মোয়াজ্জেমের ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব সত্য বলে প্রতিপন্ন হলো।"

সবই ঠিক আছে। কিন্তু, প্রশ্ন হলো ১৯৬৬ সাল থেকে সবাই আগরতলা ষড়যন্ত্রের গুজবের কথা জানে অথচ পাকিস্তান সরকার দু'বছর পর কেন ব্যবস্থা

নিলো? ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত নয় কি? সরকার শেখ মুজিবকে আসামি করে ফায়দা লুটতে চেয়েছিলো সেটি ঠিক হতেও পারে এবং বঙ্গবন্ধু এর সমগ্র নেটওয়ার্কের মূলে নাও থাকতে পারেন কিন্তু মোয়াজ্জেম হোসেন নায়ক ছিলেন সবকিছুর এটি কল্পনাশক্তিরও বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। তিনি অন্যতম ছিলেন অবশ্যই কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, পাকিস্তানের মতো সামরিক বাহিনীতে এতো নিম্ন পর্যায়ের কয়েকজনকে দিয়ে ক্ষমতা দখল সম্ভব ছিল না। এর পেছনে দরকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শক্তি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতের একটা যোগাযোগ হয়ত ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের সেই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ছাড়া কারো পক্ষে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব ছিল না। আর মোয়াজ্জেম হোসেন আফসারউদ্দিনকে সে খেদ জানিয়েছিলেন কি না আজ তার সত্যতা নিরূপনো করার কোনো উপায় নেই। আর বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭১ সালে হত্যা সম্ভব ছিল না কারণ, তা হলে নয়মাস আর দীর্ঘায়িত হতো না মুক্তিযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ তখনই হয়ত ব্যবস্থা নিতো।

আবার ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকেই, জানিয়েছেন আফসারউদ্দিন, ছয়দফা ছয়দফা বলে চিৎকার শুরু হলো, লিখেছেন তিনি, "আমার নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার বহু শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিকট আমি জানতে চেয়েছিলাম ৬ দফা কী তা তারা জানেন কিনা? আমি আশ্চর্য হলাম শুধু আমার এলাকার শিক্ষিত লোকই নয় মুর্খ লোকতো দূরের কথা রাজধানী ঢাকার বহু শিক্ষিত লোকও ৬ দফা কী তা জানতেন না। তবুও প্রচারের জোরে ও মুখে তারা ৬ দফা ৬ দফা বলে চিৎকার দিতেন ও সমর্থন করতেন।"

তিনি বলতে চেয়েছেন হুজুগটাই ছিল বড় কথা। এবং মানুষজন ৬ দফা না বুঝে প্রচারঝড়ে পড়েছে। কিন্তু, ৬ দফার ৬ দফা মুখস্থ বলতে হবে এমন কোনো দিব্যি কাউকে দেয়া হয়নি। মূল বিষয় ছিল এর নির্যাসটি কী বা মানুষ তা বুঝেছে কি না? মানুষ জানতো ৬ দফা মানে স্বায়ত্তশাসন। সেই বোঝাই ছিল যথেষ্ট। এবং মানুষ তা অনুধাবন করেছিলো দেখেই রাস্তায় নেমেছিলো।

এক দিকে শেখ মুজিব আর অন্য দিকে ভুট্টো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। আইয়ুব খান, তিনি উল্লেখ করেছেন, অগণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা দখল করেছিলেন কিন্তু "এত জনহিতকর কাজ করেও দেশের উভয় অংশের জনগণের বিরোধিতা দেখে মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হলেন এবং বিনা রক্তপাতে শান্তিপূর্ণভাবে সর্বদলের নির্বাচিত নেতার নিকট শাসনভার অর্পণের জন্য গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন।"

বস্তুত আইয়ুব খানের গিবত গায়নি কোনো রাজাকারই। কারণ, আইয়ুব ছিলেন তাদের বেনেফেক্টর। এদের একটা অংশ আইয়ুব আমলে মৌলিক গণতন্ত্রের কারণে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। সরাসরি ভোটে তারা কখনও নির্বাচিত হতেন কি না সন্দেহ।

কীভাবে সত্য অর্ধসত্য মিলিয়ে বক্তব্য রাখতে হয় রাজাকাররা তা জানে। উপরের উদ্ধৃতাংশ তার প্রমাণ। আইয়ুব খান অগণতান্ত্রিক পথে এসেছিলেন এটি

দিবালোকের মতো সত্য কিন্তু পুরো অন্যায়টি ঢেকে দেয়া হয় একথা বলে যে তিনি অনেক 'জনহিতকর' কাজ করেছিলেন। এ কারণে, ক্ষুব্ধ হয়ে "শান্তিপূর্ণভাবে" "বিনা রক্তপাতে" শাসনভার হস্তান্তর করতে চাইলেন। এর কোনোটাই ঠিক নয়। 'জনহিতকর' কাজ করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব ফলে এটি বিশেষ কোনো ব্যাপার নয়। ধরা যাক একজন শিক্ষকের কথা। তাঁর কাজই হবে পাঠদান। এখন যদি প্রশংসা করা হয় তিনি পাঠদান করেছেন বলে তা হলে বিষয়টি কী দাঁড়ায়? যেন এটি তাঁর কৃতিত্ব, পাঠদান করা না হলে তো শিক্ষক হিসেবেই তিনি স্বীকৃত হবেন না।

তা ছাড়া, আইয়ুব খান শান্তিপূর্ণভাবে বা রক্তপাত ছাড়া ক্ষমতা ছাড়েন নি। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছেন। পারেন নি। এ প্রসঙ্গে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের বিষয়টি চেপে গেলেন কেন আফসারউদ্দিন? ঢাকাসহ সারা দেশে কি তখন লাশ পড়েনি?

এরপর হলো গোলটেবিল বৈঠক। সেখানে আইয়ুব খান নাকি শেখ মুজিবকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে বলেছিলেন, কিন্তু মুজিব তাতে রাজি হননি। শুধু তাই নয়, রাতে একা নৈশভোজে "৬/৭ ঘণ্টা কাটিয়েছেন"। এরপর ২৪ মার্চ ১৯৬৯ সালে একনায়ক আইয়ুব ক্ষমতা ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে "প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য" আফসারউদ্দিন পিন্ডি যান। সেখানে এক বাঙালি মেজরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এর যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিবরণটি উদ্ধৃত করছি—

আফসারউদ্দিন ইসলামাবাদ যাবেন আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করতে। পিন্ডি এয়ারপোর্টে তাঁর পরিচিত এক 'পূর্ব পাকিস্তানী মেজর'-এর সঙ্গে দেখা। তিনি তাকে বললেন, "স্যার, আমাদের সিনিয়র বাঙালি অফিসারদের বর্তমান চীফ অব স্টাফ ও রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান রাওয়াল পিন্ডি আর্মি হেড কোয়ার্টারে একত্রে জমা করে অর্ডার দিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানে যাতে আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদে নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেতে পারে তার জন্য পরিকল্পনা করে দৈনন্দিন ইয়াহিয়া খানের এডমিনিস্ট্রেশনকে পরামর্শ দেয়ার জন্য। ইয়াহিয়া প্রশাসন একান্তভাবে চেষ্টা করছে যাতে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খান মিলে মিশে শাসনক্ষমতা হাতে নিতে পারে।"

যদি ভাবেন বিনা উদ্দেশ্যে এই গল্প ফাঁদা হয়েছে তা হলে ভুল করবেন। রাজাকারদের একটি থিসিস হলো, ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে জিততে সাহায্য করেছিলেন যাতে দু'দলে মিলে ক্ষমতায় থাকতে পারেন। এই ইঙ্গিতটি আফসারউদ্দিন আগেই দিয়ে রাখলেন এই বর্ণনায়।

এরকম গল্প সৃষ্টি রাজাকাররাই করতে পারে। পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকদের অনেকের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি, এমনকি আলতাফ গওহরেরও যিনি ছিলেন আইয়ুবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, কিন্তু, এ ধরনের গল্প কেউ উপহার দেন নি। পরাজয় নিশ্চিত জেনে কেউ নির্বাচনে দাঁড়ায় এমন কারো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আফসারউদ্দিন এরপর আইয়ুব খানের সঙ্গে নৈশভোজ করেন। আইয়ুব তাকে জানান শেখ মুজিবকে তিনি শাসনভার নিতে বলেছিলেন—"আমিও (আইয়ুব খান) গোপন সূত্রে জানলাম যে শেখ মজিবুর রহমান ইতিমধ্যে দুইবার গোপনে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে নির্বাচনের পরে ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট থাকবেন আর শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এই গোপন আঁতাতের কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান আমার নিকট থেকে শাসন ক্ষমতা নিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।"

কিন্তু, এটিই শেষ কথা নয়। আইয়ুব খান প্রিয় ছিলেন আফসারউদ্দিনের। আইয়ুব খানকে হটিয়ে দেয়া তাঁর খুব একটা ভালো লাগেনি। কেন আইয়ুব খানকে চলে যেতে হয়েছিলো তা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন—

১. সিআইয়ের চক্রান্ত
২. ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার চক্রান্ত
৩. "বিদেশি অর্থপুষ্ট ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের অপচেষ্টা"
৪. পাঞ্জাবীদের অপছন্দ কারণ আইয়ুব ছিলেন পাঠান।

রাজাকারদের চিন্তায় সবসময় ঘোরে চক্রান্ত এবং সব ঘটনার জন্য অন্তিমে দায়ী হয়ে দাঁড়ায় বিদেশি অর্থ অথবা সিআইএ বা র-এর ষড়যন্ত্র। কিন্তু, ইন্টারেস্টিং হলো, আইয়ুব খান আবার কবে পাঞ্জাবিদের স্বার্থবিরোধী কাজ করলেন? যা করেছিলেন তা তো পাঞ্জাবিদের স্বার্থেই করেছিলেন।

১৪

আইয়ুব খান গেলেন, ইয়াহিয়া খান এলেন। ইয়াহিয়া এবং মুজিব আঁতাত করলেন। তার ভাষায়—

"আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক আদেশ ছিল পরস্পর পরিপন্থী। তবুও ক্ষমতার ভাগাভাগির স্বার্থের আওয়ামী লীগ লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সক্রিয় আন্দোলন করেনি। ক্ষমতা লাভের আশায় আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়া খান বা তার লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের বিরুদ্ধে কোন প্রচার করেনি। ইয়াহিয়া খান সরকারও আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি যদিও তা ছিল পরস্পর

পরিপন্থী। এই দু'মুখো নীতি অবলম্বন করে কিছুদিনের জন্য দু'পক্ষেই নির্বাচন প্রচারণা চলতে লাগল।"

এই আঁতাত আরো দৃঢ় করলো, তার মতে, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়, "জিতবার জন্য ইয়াহিয়া খান পূর্বপরিকল্পিত মতে আওয়ামী লীগকে এবং এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে এই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় যে আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করলেন।" সমস্ত ত্রাণসামগ্রী আওয়ামী লীগকে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। সরকারি ত্রাণ ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। আফসারউদ্দিন ১৯৭০-এর নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। "আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে—এর কোন কারণ বা যুক্তি ভোটাররা আমল দেয়নি। যদিও আমার অকাট্য যুক্তিমতে এই নির্বাচনের পরবর্তীতে পাকিস্তান ভেঙ্গেই গিয়েছিল।"

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সদস্যদের নিয়ে রেসকোর্সে শপথ নেওয়ালেন। শপথনামা বিশ্লেষণ করে আফসারউদ্দিন লিখেছেন—"উল্লেখ্য এই শপথনামায় দেখা যায় আওয়ামী লীগ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করেছিলেন স্বায়ত্তশাসন তাদের লক্ষ্য ছিল। বাংলা ও পাকিস্তানের জয় তাদের কামনা ছিল। নির্বাচিত সদস্যরা স্বাধীন বাংলা কায়েম করবার বা ধর্ম নিরপেক্ষতার কোন শপথ নেয়নি। অথচ স্বাধীনতার পর আল্লাহকে বিসর্জন নিয়ে এই নির্বাচিত সদস্যগণই ভারতের অনুকরণে ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের প্রথম গঠনতন্ত্রে (১৯৭২ সনে) জুড়ে দিল। তাদের নির্বাচন প্রচার পত্রেরও বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর ধর্মকে গঠনতন্ত্রে গায়েব করে দিল। জনগণ কখনও তাদের এই ক্ষমতা দেয় নি।"

আফসারউদ্দিনের এই চিন্তার কোনো মৌলিকত্ব নেই। কারণ, সব রাজাকারই বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে এই মন্তব্য করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা-এই শব্দটি তাদের গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

এর পরের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে মেজর আফসারউদ্দিন এক বিবৃতিতে অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের "আহ্বান জানান।" *দৈনিক সংগ্রামে* প্রকাশিত পত্রিকার এই রিপোর্টটি তিনি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন—"আমার উপরিল্লিখিত বিবৃতির আবেদন যদি ইয়াহিয়া সরকার আমল দিত তা হলে হয়ত পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যরূপ লেখা হত। বাংলাদেশের কয়েক হাজার লোক ১৯৭২ সনে [১৯৭১ হবে] পাক বাহিনীর হাতে প্রাণ হারাত না, জুলফিকার আলী ভূট্টোর ফাঁসি হতো না। কোটি খানেক পূর্ব পাকিস্তানবাসী ভারতে সাহায্যপ্রার্থী শরণার্থী হতো না ইত্যাদি।"

এ মন্তব্যে হাসবেন না কাঁদবেন? যেখানে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পার্টিকে পাকিরা পাত্তা দিতে চাচ্ছে না সেখানে ইসলামী গণতন্ত্র দল ও মেজর (অব.) আফসার! যাহোক তার মন্তব্যের একটি শব্দ লক্ষ করুন—'কয়েক হাজার'। মুক্তিযুদ্ধে মাত্র

কয়েক হাজার নিহত হয়েছিলো পাকিদের হাতে? একথা পাকিরা হরদম বলে, আফসারউদ্দিনও বলবেন তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু, সেটি বলছেন কৌশলে, অনেক বাক্যের ফাঁকে যেন সহসা চোখে না পড়ে কিন্তু লিখিত দলিল থেকে যায়।

পূর্বোল্লিখিত তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা যায়, জনগণ যদি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে থাকে বাংলাদেশ স্বাধীন করার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ সংবিধান রচনার, তা হলে তারা কি ইয়াহিয়া বা ভুট্টো বা পাকি জেনারেলদের ক্ষমতা দিয়েছিলো সংসদ অধিবেশন না ডাকার? বঙ্গবন্ধু কেন ৭ মার্চের বক্তৃতা দিয়েছিলেন? ২৫ মার্চের আগে কি স্বাধীন বাংলাদেশ রূপ পেয়েছিলো? ২৫ মার্চ রাজাকারদের ধর্মপিতা পাকি জেনারেলরা যখন গণহত্যা শুরু করে তখন বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না ইসলাম গেল গেল বলে পাকিদের পা ধরে বসে থাকবে, যেমন রাজাকারা থেকেছিলো?

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আল্লাহকে বিসর্জন দেয়া—এই ধরনের বক্তব্য জ্ঞানপাপী ছাড়া কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় নেই, রাজাকারদের সবসময় তাদের ধর্মপিতাদের কথা বলতে হবেই এবং ধর্মের নামে মিথ্যা প্রচার করতেই হবে যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং সে সুযোগে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যায়। কারণ, রাজাকারদের মূল প্রপাগান্ডা লাইনটাই তাই। তবে, আফসারউদ্দিন দেখা যাচ্ছে খুশি ছিলেন না টিক্কাখানের ওপর। "প্রথমতঃ তার নাম এমন অদ্ভুত যা নিজেই প্রকাশ করে দিবে যে খুব অশিক্ষিত ও নিম্নস্তরের পাঞ্জাবী মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে ধীরে ধীরে কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে প্রমোশন পেয়ে লে. জেনারেল হয়েছে।" টিক্কা ও তিনি একসময় একই র‍্যাংকে কোয়েটায় এক বছর ছিলেন। এবং তিনি লক্ষ করেছেন—"লোকটা কোন দিন মদ খেত না ও পারত পক্ষে নামাজ ও রোজা ছাড়ত না।" তার মানে নিষ্ঠুর হলেও লোকটা খুব একটা খারাপ না। তিনি জানিয়েছেন, বেলুচিস্তানে 'নিষ্ঠুরতা' প্রদর্শনের কারণেই তাকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করা হয়েছিলো। এ তথ্য অনেকেই দিয়েছেন। কিন্তু, খুব সম্ভব এটি ঠিক নয়। পাকিস্তানের প্রবীন রাজনীতিবিদ মাজারি লিখেছেন, ভুট্টোর সময় বেলুচিদের জাতীয়তাবাদী স্পৃহা দমনের জন্য টিক্কাকে নিয়োগ করা হয়েছিলো এবং সাফল্যের সঙ্গে টিক্কা সে কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

তবে, মেজর আফসারের প্রশংসা করতে হয় এ কারণে যে ২৫ মার্চ ও শরণার্থীদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগে কোন মিথ্যা বিবরণ তিনি দেননি যা অধিকাংশ রাজাকার দিয়েছে। বা তার মনে হয়েছে ঐ ধরনের বক্তব্য তাঁর বিবরণের বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করবে।

২৫ মার্চের আগে তিনি উল্লেখ করেছেন, পাকিদের তৎপরতা দেখে তার মনে হয়েছিলো এরা হামলা করতে পারে এবং সে খবর তিনি পাঠিয়েছিলেনও শেখ সাহেবকে। ২৫ মার্চ আক্রান্ত হয় ঢাকা—"ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন হলগুলি আক্রমণ

করে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বহু ঘর বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থা সৃষ্টি করে আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়।" শরণার্থীরা বাংলা দেশ ত্যাগ করতে থাকে। "বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা স্টেটের জনগণ অকৃপণভাবে এইসব শরণার্থীর আশ্রয়দান ও সেবাযত্ন করেছেন। তা চিরদিন বাংলাদেশি জনগণ কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রাখবে। ভারত সরকার খাদ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করেছে—তা আমাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হবে। হঠাৎ, এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর পশ্চিম বঙ্গে আগমন যার মধ্যে অসংখ্য মা-শিশু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ এদের রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও এর মধ্যে বহু শিশুবৃদ্ধ বৃদ্ধাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।"

কিন্তু, হঠাৎ আফসারউদ্দিনের মনে হয়েছে, এটাতো ভারতের প্রশংসা হয়ে গেলো। তখনই আবার তাকে অন্যকথা বলতে হয়েছে। নিচের উদ্ধৃতিটুকু দেখুন—

"ভারতের জনগণ ও সরকার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের যথাসাধ্য প্রাণ ঢালা সাহায্য ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন কিন্তু দিল্লী সরকার (ইন্দিরা গান্ধী সরকার) ও ভারতের বর্ণবাদী হিন্দুদের মনে ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিকিমের মতো একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে করা এই বিশ্বস্ত রক্ষী বাহিনী দেশ শাসন করবে এবং সামরিক বাহিনী ভেঙ্গে দিবে। প্রকৃত প্রিয় এবং দীন ইসলামের অনুসারীদের নির্মূল করবে। রক্ষীবাহিনীর স্বাধীনতা উত্তর কার্যকলাপ আমার এই উক্তি বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে।"

প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় কি মুসলমান রাজত্ব ছিল? অদ্ভুত যুক্তি। প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রিয় কে যারা পাকিস্তান চায়। "দীন ইসলামের অনুসারীদের নির্মূল করতে হবে?" দীন ইসলামের অনুসারী কারা? যারা বাঙালিদের হত্যা ও ধর্ষণে সহায়তা করছে?

১৫

বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু 'পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে ভারতের স্বার্থ কী' আলাদা শিরোনামে এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তার মতে, সীমান্ত প্রতিরক্ষা ও ব্যবসার কারণে ভারত চায় পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হোক। এজন্য "ভারত বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ও তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল, চাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও চাইবে। আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতার পরে পরেই ভারতীয় বেসামরিক নৌযান আমাদের এই তিন নদী ব্যবহার করে সোজা রাস্তায় অতি অল্প খরচে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ

আসামে, মনিপুর, মিজোরাম, আগরতলা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় প্রভৃতি স্থানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এবং বাংলাদেশের জুট বোর্ডকে ঢাকা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেছিল। পরে অবশ্য স্বাধীনতা ও দেশপ্রিয় জনগণের চাপে জুট বোর্ড আবার ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা হয়। এবং পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ জলপথ যথেষ্ট ব্যবহারের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।"

পাকিস্তানের "অন্ধ স্বার্থপরতা ও একগুয়েমির" ও ভারতের "স্বার্থোদ্ধারের" জন্য বাংলাদেশ হলো। এখানে মূল প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ কি বাংলাদেশ চায়নি? বাংলাদেশের মানুষ না চাইলে কি কিছু হতো? মানুষ যা চেয়েছে তা-ই হয়েছে। এর প্রমাণ তার শেষোক্ত উক্তি। তবে, এটি নিশ্চিত যে জুট বোর্ড দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়নি।

যাহোক ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলো। যৌথবাহিনীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু যুদ্ধ তাঁর মতে, "উভয় পক্ষের সাহসিকতার সাথে সংঘটিত হয়েছিল।" লক্ষ করুন, পাকি বাহিনীর সাহসিকতা তিনি প্রমাণিত করতে চান যদিও তারা পরাজিত। কিন্তু পরাজয়টা কেন?" যেহেতু নৈতিক বল, গোলা বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী করার সুযোগ ভারত ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূল ছিল তাই সকল যুদ্ধ ক্ষেত্রে যৌথভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর বিজয় সুনিশ্চিত হতে লাগল।"

অর্থাৎ, না হলে পাকিরাই যুদ্ধ জিততো যা তিনি বা তারা চেয়েছিলেন। তার এই মনোভাবটি অপ্রকাশিত থাকে না। এ পর্যায়ে সবশেষে তিনি লিখছেন—"ভারত দেখতে চায়, যেহেতু ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর নিকট পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে সেহেতু এই বিজয় ভারতের একক ব্যাপার। মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ভারত গৌণ বলে প্রতীয়মান করতে চায়।"

শুধু তাই নয়, "এই আত্মসমর্পণ দলিলে কোথাও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা তার প্রতিনিধির কারও নাম উল্লেখ নাই। পাকবাহিনী পাকিস্তান নাগরিক, বৈদেশিক নাগরিকের রক্ষণাবেক্ষণ বাংলাদেশের ভুখণ্ডে ভারতীয় কমান্ডিং ইন চীফের উপর বর্তিত। এখানেও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা কোন প্রতিনিধির নামও দেখা যায় না। এই আত্মসমর্পণ পত্রটি মুক্তিযুদ্ধের কোন গৌরব বা স্বীকৃতি বহন করে না।"

প্রায় সব রাজাকারই ১৬ ডিসেম্বর সম্পর্কে একই বক্তব্য পেশ করেছে। সুতরাং, আফসারউদ্দিন এর ব্যতিক্রম হবেন এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ এতো যে রক্তপাত, এতো যে শহীদ তার কোনো 'গৌরব বা স্বীকৃতি' রাজাকাররা দিতে নারাজ। কিন্তু দেশ তো স্বাধীন হয়েছে। সেটা স্বীকার করতে হয়। তাই লেখেন, "সে যা হোক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো।" মন্তব্যটি করতে বেশ কষ্ট হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

এরপর তিনি যে কটি বাক্য লিখেছেন তাতে আবার বিভ্রান্ত হতে পারেন পাঠক। লিখেছেন তিনি, "আমরা তখন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। এই ঐতিহাসিক দিবসটি আমাদের ও আমাদের উত্তরসুরীদের গর্ব ও আনন্দের দিবস বলে বিবেচিত হবে। এই দিবসটিতেই প্রকৃত বাঙালি জাতির, বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল, বিশ্বমানব সমাজে বাংলাভাষাভাষীদের একটি মাত্র স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।"

মনটা খুশি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু, হঠাৎ তিনি একথা লিখবেন কেন? কারণ, একটা অবশ্যই আছে। সেটি পরের অনুচ্ছেদে বোঝা যায়—

"ঢাকা মহানগরের মধ্যে অবস্থিত মুক্তিবাহিনী যাদের আমি কৌশল করে পাক-বাহিনীর হাত থেকে, নির্ঘাত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছি, মহাসংকটের সময় খাদ্য যোগিয়েছি তারাও আজ আত্মপ্রকাশের মহাআনন্দে উৎসব করছে। আমাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে আকাশের দিকে শত সহস্র গুলি ছোঁড়ে আমাকে তাদের সামরিক সালাম ও ভক্তি জানাল।"

কী বুঝলেন? এতোক্ষণ আফসারউদ্দিন যা বলছিলেন তা হলে তা ভুল? রাজাকারি মন হলে কীভাবে ইতিহাস লেখা হতে পারে তা তিনি দেখিয়েছিলেন মাত্র!

কিন্তু কেন? একপাতা পড়েই সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তিনি যুক্ত ছিলেন শান্তিকমিটি বা পিস কমিটির সঙ্গে।

পিস কমিটিতে যোগ দেয়ার কারণ কী বিশেষ করে "পূর্ব পাকিস্তানের সর্ব্বোচ্চ" কমিটিতে? কারণ স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার পরিজনদের "পাক বাহিনীর অত্যাচার ও জুলুম" থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এ পর্যায়ে পাকিবাহিনী যে "নরহত্যা, অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন"—এর কথা উল্লেখ করেছেন। একথা মুক্তিযোদ্ধারা জানতেন, তারা তাকে শুধু রক্ষা করেন নি, তার "অফিস ঘরে মুক্তিযুদ্ধের একটি অস্থায়ী" অফিসও স্থাপন করেছিলেন। এ ধরনের ঘটনার একমাত্র উল্লেখ তার বইতেই পাই।

যারা শান্তিকমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের সবার বক্তব্য একই রকম। খুব একটা হেরফের নেই। "পিস কমিটি বা শান্তি সমিতিতেও যে কিছু লুটেরা পার্টি যোগ দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি তা আমি বলব না। এই কমিটির সকল সদস্যই যে ধোয়া তুলসী পাতা ছিল তাও বলা যায় না। কিন্তু পিস কমিটির অধিকাংশই নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধন করে গেছেন। খুব কম লোকই দেশের ও দশের অমঙ্গল করে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করেছে।"

পিস কমিটি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন। পিস কমিটি গঠনের পর্যায়ে "স্থানীয় কয়েকজন রাজনীতিবিদ, প্রশাসক ও বুদ্ধিজীবী আমাকে কেন্দ্রীয় পিস কমিটিতে যোগ দিয়ে দেশবাসির উপর যে অত্যাচার

অবিচার ও জুলুমের বান ডেকেছে—তা আমার এককালের সহকর্মী ও বর্তমান গভর্ণর ও সামরিক শাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের নিকট জানাবার সুযোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তারা আমাকে পিস কমিটিতে যোগ দিয়ে এই মহাসংকটের সময় দেশবাসির খেদমত করলেও স্বাধীনতাউত্তর কালে আমার নিজস্ব বিপদ আপদ ও জেল ফাঁসির ঝুকি আছে তাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।"

তারপরও তিনি যোগ দিলেন পিস কমিটিতে কারণ "দেশের সদ্য নির্বাচিত আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা দেশকে কোন আত্মরক্ষার পরিকল্পনা না দিয়েই হঠাৎ করে যে যে পথে পেরেছে ভারতে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, তাই আমরাও নিজের বুদ্ধিমতে যেমন করে হোক মানুষকে বাঁচাবার পরিকল্পনা করেছি। বলা বাহুল্য আমরা স্বদেশে জনগণের মধ্যে থেকে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও জনগনের সেবা করেছি।" অর্থাৎ, ২৫ মার্চের পর যে এতো অত্যাচার হলো, গণহত্যা হলো তার জন্য আওয়ামী লীগও অনেকাংশে দায়ী।

আফসারউদ্দিন লিখেছেন "আমার হিজলা থানার ও.সি'কে হত্যা করে মুক্তিবাহিনী থানা লুঠ করে অস্ত্রপাতি নিয়ে যায়—তবুও পাক বাহিনী আমার চেষ্টার ফলে হিজলা থানাতে গিয়ে জনগণকে কোন রূপ অত্যাচার অবিচার বা অপরাশেন করতে পারেনি। লুটপাটতো দূরের কথা নিজের অতি কষ্টার্জিত সঞ্চয় আটকে পড়া মুক্তিযোদ্ধা ও বিপদগ্রস্থ জনগণকে সাহায্য করেছি। এইভাবে সুকৌশলে পিস কমিটির মধ্যে থেকে আমি জনগণের উপকার করেছি। যা পিস কমিটির বাহিরে থেকে করা সম্ভব হতো না।" হয়ত ঠিক। কিন্তু, এ কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তো রাজাকার হিসেবেই পরিচিত হয়ে রইলেন।

১৬

যাহোক ১৮ ডিসেম্বর ঢাকার এসপি 'সহানুভূতি' দেখিয়ে তাকে বন্দি করে জেলখানায় রেখে এলেন। জেলখানা সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু লেখেননি। অন্য রাজাকাররা কিন্তু কারাবাসের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে জানাবার চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশ সরকার তাদের ওপর কী অত্যাচার করেছিলো।

জেলখানা থেকে তিনি মুক্তি পেলেন দেড় বছর পর (১৯৭৩)। এবং জেল থেকে বেরিয়ে কী দেখলেন "স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আর একটি সরকার অবস্থান করছে—যার নাম রক্ষী বাহিনী।"

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর গেলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তাঁকে "বিশাল বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর আলিঙ্গন করলেন।" আফসারউদ্দিন রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার বর্ণনা করে দেশত্যাগ করবেন কি না জানালেন। বঙ্গবন্ধু বললেন থাকতে। এরপর রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

সেগুলি কতোটা সত্যি জানি না। কিন্তু, তাঁর বর্ণনা সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি আবার বলেন, ভারতীয় কারসাজিতে সবকিছু চলছিলো। এমনকি "ভারত প্রত্যাগত আমাদের সরকার ও সরকারি কর্মচারিদের আচার আচরণ ও ব্যবহার দেখে ভারত সন্তুষ্টির জন্য প্রায় সকল স্তরের অধিকাংশ মানুষও ভারতীয় হিন্দুর আচার আচরণ ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে গেল।" এমনকি "কিছুদিনের জন্য মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ছিল।" আর ২৫ বছর চুক্তি? "বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণ ২৫ শালা দাসত্ব চুক্তি নামে অভিহিত করেন।"

সত্যিই রাজাকারের মন বদলানো মুশকিল। সে মন বদলায় না।

১৭

আয়েন উদ-দীনের আত্মজীবনীর শুরুটা বেশ নাটকীয়। পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করেছে। আয়েন উদ-দীন সঙ্গী দু'জন রাজাকার নিয়ে পালাচ্ছেন নাটোর থেকে। পথে গাড়ির টায়ার ফেটে গেল। নাটোর স্টেশনে দেখা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রাজাকার অধ্যাপকের সঙ্গে। গাড়ি ফেলে তিনিও পালাচ্ছেন। আয়েন উদ-দীন চাওয়া মাত্র গাড়িটা তাকে দিয়ে দিলেন। ঝলমলিয়া ব্রিজের সামনে হানাদার বাহিনীর সেনারা আটকাল। অনুনয় বিনুনয় করলেন তাদের ব্রিজ পার হতে দিতে। পাকিস্তানীরা রাজি নয়। আয়েন তখন অনুরোধ জানালেন তাদের কমান্ডার কর্নেলের সঙ্গে দেখা করার। কর্নেল তা প্রত্যাখ্যান করলেন। শেষ রাতের দিকে আয়েন উদ-দীন ফিরে এলেন নাটোর। তখনকার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তিনি এভাবে—

সকাল দশটায় আত্মসমর্পণ করবে চির অপরাজেয় বলে খ্যাত পাকবাহিনী মিত্র শক্তির কাছে বিনা যুদ্ধে। ডিসেম্বরের যে সকালে সূর্যের আলো চিরদিন লেগেছে অপরিসীম ভালো আজ তা হঠাৎ করে মনে হলো একান্ত অপ্রীতিকর। মনে হলো, অত্যাসন্ন সকালের আলো যদি আজ বিলম্বে আসত। যদি রাত আজ আরও দীর্ঘ হতো খুব ভালো হতো।" এ অনুভব মিথ্যা নয়, সত্যি। রাজাকারের মনের সঠিক অভিব্যক্তি।

শহরে এসে উঠলেন তার দু'জন সাথীসহ এক বন্ধুর বাসায়। বন্ধু প্রথমেই তার কাছে টাকা চাইলেন এবং তিনি বুঝলেন যে, সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। পাশের বাড়িতে পালালেন এবং দেখলেন যে আশ্রয়দাতা তার পরিচিত। নাম হাসেম। তার পুত্র রহিম এবং নাতিসহ সেখানে থাকেন। রাজাকারদের প্রতি তার গোপন সহানুভূতি ছিল যদিও আয়েন উদ-দীন দেখাতে চেয়েছেন যে, মানবতার খাতিরে হাসেম তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার ভাষায়—"সেদিন আমার জীবন

ছির অনিশ্চিত, মৃত্যু প্রায় অবধারিত। তাই হাসেম সাহেব যখন দ্রুত এসে আমায় তাঁর বুকে চেপে ধরলেন, তখন আমার চোখে আনন্দাশ্রুর যে প্লাবন এসেছিল তা রোধ করতে পারিনি।"

এরপর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বাংলা ছায়াছবির টেকনিকে। খানিকটা বর্তমান, তারপর ফ্ল্যাশব্যাক। আবার খানিকটা বর্তমান, তারপর ফ্ল্যাশব্যাক। ঘরে আত্মগোপন করে আছেন আয়েন উদ-দীন। বাইরে, "স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রথম নাটোর আগমন উপলক্ষে আতশবাজি চলছে। শব্দের কারণ শুনে অবাক হইনি। হয়েছি অশ্বস্ত। বাংলার সাধারণ জনগণ অকৃতজ্ঞ নয়—কথাটা ভাবতেই বুকটা গর্বে ভরে উঠল। সংগ্রামী নেতার কথায় বিশ্বাসী বাঙালি মুসলিম জনতার কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ বাংলার ইতিহাসে ভরপুর।"

পড়ে মনে হবে, না রাজাকার মিথ্যা বলে কই? কিন্তু লক্ষ করুন—মুসলিম জনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা মুসলমানদের, সমস্ত বাঙালির নয়।

এরপর ফ্ল্যাশব্যাক। মুসলিম জনতার সূত্র ধরেই উল্লেখ করছেন তিনি প্রাক ১৯৪৭ সালের একটি উপনির্বাচনের ঘটনা। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের হয়ে আয়েন উদ-দীন ও তার বন্ধুরা নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন তখন। নির্বাচনে জিতল মুসলিম লীগ।

"অথচ" তার ভাষায়, "সামান্য সময়ের ব্যবধানে সেই জনতার সাথেই সংযোগ হারাল মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ। ফল হলো মারাত্মক। জনতা নেতাদের থেকে সরে গেল দূরে। শুধু রইল স্তাবক। ফলে ঝড়ের ঝাপটাতেই ঘর গেল পড়ে। দেশ ভাগ হয়ে গেল। জন্ম লাভ করল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।" এক অনুচ্ছেদে প্রায় পঁচিশ বছরের ইতিহাস। কিন্তু, প্রশ্ন জাগে, মুসলিম লীগ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেল দেখেই কি বাংলাদেশের জন্ম হলো? নাকি মুসলিম লীগের কুশাসন, পাঞ্জাবীদের সমর্থন, বৈষম্য সমর্থন প্রভৃতিও বাংলাদেশের জন্মের কারণ। এসব বিষয়ে কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দেন নি আয়েন উদ-দীন। কিন্তু, আলাদাভাবে অনুচ্ছেদ দু'টি পড়লে মনে হবে আয়েন উদ-দীন ঠিক কথাই বলছেন। কিন্তু প্রথম অনুচ্ছেদের আলোকে দ্বিতীয়টি পড়লে বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিপক্ষেই তিনি বক্তব্য রাখছেন। এই হলো রাজাকারের মন।

আবার বর্তমান। হাসেম গৃহে আত্মগোপন করে আছেন তিনি। সঙ্গী দুই রাজাকারের সঙ্গে দার্শনিক আলাপ করছেন। পরিবার পরিজনদের কথা মনে পড়ছে। ফ্ল্যাশব্যাক। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। "ঘটে গেল অঘটন। সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশের যাবতীয় ক্ষমতা হাতে নিয়ে আইন-শঙ্খলার নামে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তাতে অনেক ক্ষতি হলো। মারা গেলেন অনেক নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। যারা ছিল নিশ্চুপ নিরপেক্ষ তারাও হয়ে উঠল সচেতন। প্রবল গণআন্দোলনের মুখে তারাও ঢাকার বাইরে চলে গেল। রাজশাহীতে ২৫ মার্চ বেশ কয়েকজন লোককে সামরিক কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করল।"

অনুচ্ছেদটি পড়লে মনে হবে মিথ্যা তো বলেননি আয়েন উদ-দীন। কিন্তু, আমি বলি, রাজাকার সত্যি কথা বলতে পারে না অন্তত ১৯৭১ সম্পর্কে। আয়েন উদ-দীনের টেক্সটে কয়েকটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করুন। সামরিক বাহিনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল "আইনশৃঙ্খলা" রক্ষার জন্য। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যদি কিছু লোক নিহত হয় তা'হলে তাকে তো গণহত্যা বলা যায় না। কিন্তু ২৫ মার্চ কি তাই ঘটেছিল? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাটা পাকিস্তানী ভাষ্য। তারাতো নেমেছিল গণহত্যা করে বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহা দমনের জন্য। মানুষ দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল কি 'গণআন্দোলনের' জন্য? গণআন্দোলন তো মানুষ দেশে থেকেই করে। মানুষ তো চলে গিয়েছিল গণহত্যা থেকে বাঁচার জন্য। 'গণআন্দোলনের' জন্য মানুষ চলে গিয়েছিল এ কথা বিশ্বাস করলে দোষটা চাপানো যায় বাঙালি নেতৃবৃন্দের ওপর।

২৮ মার্চ। ছাত্র জনতা কারফিউ ভেঙে নেমে এলো রাজশাহীর রাস্তায়। "সে কি দৃশ্য! অভাবনীয় কাণ্ড। নিরীহ সহজ সরল মানুষের চোখে-মুখে সেকি অপরূপ দীপ্তি। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সে কি তীব্র প্রতিবাদ। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সে কি উদ্যত ফণা। আমার রক্তেও যেন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। স্থির থাকতে পারলাম না। ঘটনাটা ব্যক্তিগতভাবে জানবার জন্য লুঙ্গি, গেঞ্জি পরেই নিচে নেমে এলাম।"

মনে হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য তিনি অস্থিরতা বোধ করছিলেন। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে চলেই গিয়েছিলেন। জনতা তার কাছে এসে নেতৃত্বের দাবি জানাল। বিরাট মিছিল এসে থামল তার বাড়ির সামনে। জনতার ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে এলেন। "কিন্তু একি? জনতার হাতে নানা প্রকার লাঠি, হাঁসুয়া, দা, ফলা, সড়কি, ইটপাটকেল এবং কয়েকটি বন্দুক। তাদের চোখেমুখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, তারা উচ্ছৃঙ্খল-উন্মাদ। অবাঙালি নিধনের গগনবিদারী শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত।"

এভাবে মুক্তিযুদ্ধের পুরো বিষয়টা তিনি নিয়ে এলেন অবাঙালি নিধনে। সঙ্গে সঙ্গে এটা উল্লেখ করতে ভুললেন না যে, "গত ২৫ মার্চ থেকে আওয়ামী লীগ নেতারা পলাতক।" মানুষ তার নেতৃত্ব চায়।

এ পর্যন্ত বিবরণ দিয়েই আবার বর্তমানে ফিরে এলেন। সংবাদ পাওয়া গেল, মুক্তিবাহিনী আল-বদর, রাজাকারদের খুঁজছে। যে আশ্রয় দেবে তারও বিপদ হবে। মাইকেও এ ঘোষণা হতে থাকল।

রাজাকাররা ভয়ে ভীত। আশ্রয়দাতা হাসেমের পুত্র রহিম জিজ্ঞাসা করল বাবাকে, "আয়েন উদ-দীন সাহেবরা এখানেই থাকবেন?" হাসেম উত্তর দিলেন, নিরপরাধ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেয়ার চাইতে তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ অনেক শ্রেয়।" অর্থাৎ রাজাকাররা নিরপরাধ। রাজাকাররা যদি নিরপরাধই হয় তা হলে তারা পালাচ্ছিল কেন, বিভিন্ন জায়গায় লুকাচ্ছিল-ই-বা

কেন? এ উত্তর কিন্তু নেই আয়েন উদ-দীনের ভাষ্যে। ফ্ল্যাশব্যাক। ১৩ এপ্রিল ১৯৭১। আয়েন উদ-দীন গ্রামের বাড়িতে লুকিয়ে আছেন আওয়ামী লীগ কর্মীদের ভয়ে। কিন্তু কেন? তিনি বলেননি। দুপুর থেকে গ্রামের মানুষজন আয়েন উদ-দীনের বাড়িতে আশ্রয় নেবার জন্য আসতে লাগলেন। যেন কেয়ামতের দৃশ্য। জানতে পারলেন—পাকবাহিনী রাজশাহী-নাটোর রাস্তার দুই ধারের প্রায় এক মাইল বিস্তৃত জায়গা জুড়ে বাড়িঘর জ্বালাতে ও নরহত্যা, নারীধর্ষণ করতে করতে রাজশাহী শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। পাকবাহিনী অবশ্য ঐ গ্রামে এলো না। কারণ? সবার ধারণা "একমাত্র চাচার দোয়াতেই আল্লাহ মেহেরবানী করে সামরিক বাহিনীর গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছেন।"

তারপর কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বা পাকবাহিনীর কোন বিবরণ নেই। ২৮ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল এবং তারপরের ঘটনাগুলো কী? বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা সে ফাঁকটুকু ভরার চেষ্টা করব।

২৮ মার্চ রাজশাহী পুলিশ লাইনের পতন হয়। ২ এপ্রিল প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হয় ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে। ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল তারা রাজশাহীকে পাকবাহিনী মুক্ত করে। আয়েন উদ-দীন ঐ সময়মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ তিনি তো আগেই বলেছেন জনতা পাকিস্তানীদের হত্যা করতে চেয়েছে। সুতরাং জনতার ক্রোধ এড়াবার জন্য পালিয়ে গ্রামের বাড়িতে আত্মগোপন করেন।

১৩ এপ্রিল পাকবাহিনী দখল করে রাজশাহী যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন আয়েন উদ-দীন। ১৪ এপ্রিল ফিরে আসেন রাজশাহী।

বর্তমানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রী, তৎকালীন নগর আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জিন্নাতুন নেসা তালুকদার ও মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহিল বাকি এক প্রতিবেদনে জানান, "স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে আয়েন উদ-দীন ১৪ এপ্রিল '৭১ রাজশাহী শহরে মাইকিং করে। মাইকিংয়ের ভাষ্য ছিল, আবদুল্লাহিল বাকিকে জীবিত অথবা মৃত, দেহ অথবা মাথা যে এনে দিতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।" এবং সে থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আয়েন উদ-দীনের দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজশাহী পরিণত হয়েছিল আতঙ্কের শহরে। এপর গঠিত হয় শান্তিকমিটি। আয়েন উদ-দীন হন রাজশাহী শান্তিকমিটির প্রধান এবং প্রধান হয়ে তিনি কী করেছিলেন তা পরে উল্লেখ করব।

১৮

আবার বর্তমান, আয়েন উদ-দীন ও বন্ধু রাজাকাররা আতঙ্কিত। ভোর রাতে বন্ধু দু'জন রিক্সা চড়ে পালালেন। আয়েন রয়ে গেলেন। সকালে টিপু নামের এক মুক্তিযোদ্ধা এলেন হাসেমের সঙ্গে দেখা করতে। আয়েন লুকালেন চৌকির নিচে।

মুক্তিযোদ্ধা টিপু রহিমকে মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে যোগ দিয়েছিলেন সে কাহিনী বলছিলেন। এ কাহিনীর সঙ্গে মিল আছে বাংলাদেশের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার কাহিনীর। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তেমন বিকৃতি ঘটাননি আয়েন উদ-উদীন এবং এখানে বিকৃতি ঘটাবার প্রয়োজনও নেই। তবে, আমি এখানে এক দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেব। উদ্ধৃতিটি টিপুর বয়ানের এবং দেখাবার চেষ্টা করব রাজাকারের মন কীভাবে কাজ করে। "গণ্ডগোলের সময় গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। ছিলামও কিছুদিন বেশ আরামে। হঠাৎ এক রাতে গভীর অন্ধকারে, প্রায় তিনটার দিকে একদল সশস্ত্র লোক, গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। সদ্য ঘুমভাঙ্গা লোকজন দেখল যে, দুর্বৃত্তরা আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়িতে বাড়িতে আগুন দিচ্ছে। লুটপাট করছে বিবেক বিবর্জিত পশুর ন্যায় অসহায়-অবলা নারীদের অত্যাচার করছে। এবং পুরুষদের বিশেষ করে যুবকদের নির্মমভাবে হত্যা করছে। এরা কারা সে পরিচয় নেবার সময় তখন ছিল না। তাই বাড়ির কাছে এক জঙ্গলে আত্মগোপন করলাম।

হায়েনারা আমার এক অবিবাহিতা চাচাতো বোনকে ধরল। পাশবিক অত্যাচার করল। তারপর নির্মমভাবে বেয়োনেট চার্জ করে আমার চোখের সামনে, কয়েক হাত দূরে হত্যা করল। উত্তেজনায় পাগলপ্রায় হয়েছিলাম—চেয়েছিলাম হায়েনাদের টুটি চেপে ধরতে। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে মূর্খের মতো আত্মবলি না দিয়ে সময়মতো এই পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা আমাকে সংযম অবলম্বনে সহায়তা করল। নিষ্পাপ, নিরপরাধ বোনের অসম্মানজনক অপমৃত্যুতে জন্ম হলো আমার নতুন সত্তা। শান্তিপ্রিয় আমি হয়ে উঠলাম নির্মম ও কঠোর। নবজন্মের সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলাম দেশ ছেড়ে ভারত যাব। অবশ্য ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হবার পূর্বে কয়দিন ধরে বিবেকের সাথে সংগ্রাম করলাম। নাটোরে বিহারী হত্যার ব্যাপারে আমাদের গ্রামের কয়েকজন দুর্বৃত্ত জড়িত ছিল সত্য। তারা পাকবাহিনীর নাটোর আগমনের আগেই গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেছে অন্য কোথাও। প্রতিশোধ নেবার জন্য কিছু দুর্বৃত্ত লোক সামরিক বাহিনীর সহায়তায় নিরপরাধ গ্রামবাসীর ওপর নির্মম অত্যাচার করল এই হত্যার জন্য। মুসলমান হয়ে মুসলমানের রক্ত নিয়ে হোলি খেলল। এটা কোন যুক্তিতেই মানতে পারলাম না।"

"সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যেদিন রাতে জন্মভূমি ছেড়ে একদল যুবকের সাথে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিই, সেদিন সন্ধ্যায় পৈতৃক ভিটায় দাঁড়িয়ে কান্নার গতিরোধ করতে পারিনি। লাঞ্ছিত বোনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছি তার ওপর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ আজও নিতে পারিনি বলে। আব্বা-আম্মার কবরের মাটি জাপটে ধরে কেঁদেছি। চেয়েছি দোয়া। শপথ নিয়েছি আল্লাহর নামে মনে মনে যে, যারা ইসলামের অনুসারী হয়ে, মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে, মুসলমান মা-বোনকে শুধু বাঙালি হওয়ার কারণে বেইজ্জত

করেছে, নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছে নিঃশঙ্কচিত্তে, বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়িঘর জ্বালাতে, লুট করতে, তাদের খতম না করা পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাব। তারপর নানা গ্রাম, নদীনালা, মাঠ, ঘাট, পেরিয়ে বিভিন্ন স্থানে রাত যাপন করে, তিনদিন পরে, সাধারণ নাগরিকের বেশে ভারতের মাটিতে পা দিয়েই মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। মনে হলো যাদের সাথে আপন তাহজিব তমদ্দুন বজায় রেখে সহাবস্থানের সম্ভাব্য সব চেষ্টা করেও আমাদের পূর্বসূরিরা ব্যর্থ হয়ে, বাধ্য হয়ে ভারত ভূখন্ডকে কেটে দু'ভাগ করে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন; ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে আমরা সেই ভারতীয় নেতাদের কাছে দাঁড়িয়েছি আশ্রিত হিসাবে।"

টিপুর বক্তব্যটি এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক; বিশেষ করে তার বয়ানের শেষটুকু—"আমরা প্রত্যেকেই পাক বাহিনীর অত্যাচারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তারা জানে যত সত্বর ট্রেনিংয়ে পারদর্শী হয়ে উঠে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারবে এবং তত তাড়াতাড়ি তারা বাংলাদেশের নিরীহ ভাইবোনদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।"

এ ভাষ্য আয়েনের নয়, মুক্তিযোদ্ধার। এবং তিনি জানেন মুক্তিযোদ্ধার ভাষ্য মোটামুটি এরকমই হবে। এ ভাষ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা উল্লেখ করছেন এ কথা প্রমাণের জন্য যে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তার কোন ক্ষোভ ছিল না। পাঠকের মন যাতে নিউট্রালাইজ হয়ে যায় সে চেষ্টাই করেছেন এখানে। কিন্তু লক্ষ করুন, ১৯৭১ ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় নয়, গণ্ডগোলের সময়। টিপুর পাড়া যে আক্রান্ত হলো তার কারণ কী? কারা আক্রমণ চালিয়েছিল, তিনি তা বলেননি, কিন্তু বোঝা যায় বিহারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল ও সঙ্গে ছিল পাকিরা। এবং তারা আক্রমণ করেছিল এ কারণে যে "নাটোরে বিহারী হত্যার ব্যাপারে আমাদের গ্রামের কয়েকজন দুর্বৃত্ত জড়িত ছিল।" এভাবে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে যায় মূলত বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা এবং মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির যোগ দেয়ার কারণ হয়ে ওঠে বিহারী কর্তৃক বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। শুধু তাই নয়, ভারতে পা দিয়েই টিপুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দীর্ঘ ২৫ বছরের পটভূমিকা এভাবেই আয়েন উদ-দীন আড়াল করে ফেলেন।

এরপর আবার আয়েন উদ-দীন ফিরে যান ১৯৩৭ সালে। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর মা-ই তাঁকে বড় করে তোলেন। এ পর্যায়ে আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে জীন ডিকসন পর্যন্ত বহু ব্যক্তিত্বের গল্পগাথা পরিবেশিত হয়েছে। তারপর যুক্তফ্রন্টের কাল। কফিল উদ্দিন আহমদ পদত্যাগ করেছেন সে নিয়ে উত্তেজনা চলছে। যুবক আয়েন উদ-দীন যুক্তফ্রন্টের হয়ে কাজ করেছিলেন। এ নিয়ে স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা হান্নানের সঙ্গে ছিল তার দ্বন্দ্ব। যে দিন কফিল উদ্দিন পদত্যাগ করেন সেদিন হারাধনের চায়ের দোকানে আয়েন ও তার বন্ধুরা এসব নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন। পরদিন সকালে শোনেন হান্নান খুন হয়েছেন এবং তার বড়

ভাই ও চাচাকে এ কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার "বড় ভাই শুধু ধার্মিকই নন, সাদামাটাও বটে। তাঁর সরলতা, সহনশীলতা অন্যের প্রতি মায়ামমতা, ধার্মিকতা, পরোপকারিতা আমাদের ঐ অঞ্চলের প্রবাদের মতোই ছড়িয়ে পড়েছিল।" এরপর জানা গেল আয়েনকেও আসামী করা হয়েছে। তার জামিনের প্রশ্ন এলে উকিল বলেছিল—"আমার বিশ্বাস ফুলের মতো চেহারার এই ছাত্রটির সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে তার জামিন মঞ্জুর করা হবে।" জামিন মঞ্জুর হয়নি।

আয়েন উদ-দীনকে জেলে নেয়া হলো। এ পর্যায়ে জেলের বিবরণ ও নানা গল্পকাহিনীর অবতারণা করেছেন। গল্পের ভিতর গল্প। মাঝে মাঝে বর্ণিত হয়েছে তার বিভিন্ন সাহসী কার্যকলাপ। এক সময় তিনি জামিন পেলেন। বাড়ি ফিরে দেখলেন মা মারা গেছেন। ৪০ থেকে ১৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসব কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। ১৭৩ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে ধর্ম নিয়ে আলোচনা। যেমন, "ধর্মের প্রতি অনীহা আজকের যুব সমাজের একটা স্বাভাবিক রীতি।" কথাটা সত্য। "ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা, প্রগতিশীলতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা" সমাজের এক বিরাট সমস্যা।

এই যে সোয়া শ' পৃষ্ঠার কাহিনী-এর নির্যাস কী? নির্যাসটি হলো তিনি যুক্তফ্রন্টের হয়ে কাজ করেছিলেন দেখে তাকে হত্যা মামলায় জড়ানো হয় এবং তিনি জেল খাটেন। যুক্তফ্রন্টের হয়ে যারা লড়াই করেছে তাদের অনেককেই তো জীবনে নিগ্রহ সইতে হয়েছে, যেমন, শেখ মুজিব। এ রকম একটা ধারণা তিনি তৈরি করতে চান পাঠকের মনে। সুতরাং তাকে রাজাকার বলা কতটা যুক্তিযুক্ত? এরই সঙ্গে শেষে যোগ করে দেন রাজাকারিত্বের মূল কথা। ধর্ম নিরপেক্ষতার মানে ধর্মহীনতা। উল্লেখ্য ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আদর্শ। প্রগতিশীলতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু রক্ষণশীলতা (অর্থাৎ রাজাকারি আদর্শ) মানে শান্তি। এই কথাটুকুই তিনি আসলে পৌঁছে দিতে চান পাঠকের কাছে।

কিন্তু, তার খুনের মামলার কী হলো? এর বিস্তারিত বিবরণ আর আমরা পাইনি। মামলা থেকে ছাড়া পান এটি আমরা জানি। কিন্তু অকথিত থেকে যায় অনেক কিছু। সে সব অকথিত বিষয়ের আমরা সন্ধান পাই অন্য সূত্র থেকে।

গণতদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুস সোবহান। তিনি সামান্য আলোকপাত করেছিলেন এ বিষয়টির ওপর। বলেছিলেন তিনি—"আয়েন উদ-দীন (খুব সম্ভব তখন সে সবেমাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে) আমার বাবা আব্দুস সালামকে খুন করে। সেই হত্যা মামলায় আয়েন উদ-দীন এক অথবা দুই নম্বর আসামী ছিল এবং জেলেও ছিল। কিন্তু জুরীদের মধ্যে দু'জন মুসলিম লীগের সমর্থক ও মাদ্রাসার শিক্ষক থাকায় আয়েন উদ-দীন ছাড়া পায়।" আয়েন যৌবন থেকেই

খুন-খারাবির সঙ্গে যুক্ত। এটি ছিল এক ধরনের অভ্যাস যা ১৯৭১ সালে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। এ জন্যই বোধহয় সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রবাদের, যে, কচুগাছ কাটতে কাটতেই মানুষ ডাকাত হয়। রাজাকারি শিক্ষাটাও ছেলেবেলা থেকে শুরু হয়।

১৯

আয়েন উদ-দীনের আত্মজীবনী থেকে আমি সুদীর্ঘ দু'পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতি দেব। কথোপকথনের ভঙ্গিতে এখানে তিনি তুলে ধরেছেন শান্তিকমিটির কেন দরকার ছিল। শান্তিকমিটি না থাকলে কত ক্ষতি হতো। এভাবে, মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তি কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, আয়েন উদ-দীন ছিলেন রাজশাহী জেলা শান্তিকমিটির সভাপতি। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া উচিত নয়। দীর্ঘ ফ্ল্যাশব্যাকের মাঝে হঠাৎ এ দুই পৃষ্ঠা 'বর্তমান'। ফলে, নানা ঘটনার বর্ণনায় এটা মিশে যায়, আলাদা কোন বিষয় হয়ে ওঠে না। পাঠকের মনে বরং এ ধারণা গড়ে উঠতে পারে যে, শান্তিকমিটি করা হয়েছিল তো কী হয়েছিল? শান্তিকমিটির সদস্যরা তো অনেককে পাকিদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সে বিষয়টি ভুলে গেলে তো চলবে না আমাদের। সে জন্য এই দুই পৃষ্ঠা আলাদাভাবে পড়া উচিত। এতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, রাজাকার কখনও অনুতপ্ত হয় না তার কৃতকর্মের জন্য এবং সবসময় সে তার রাজাকারির মূল কথা কোন না কোনভাবে ছড়িয়ে দিতে চাইবেই।

আয়েন উদ-দীন লিখেছেন—

এমন সময় রথীন বাবু বললেন, "হানাদার বাহিনীর লাল চক্ষুকে উপেক্ষা করে, আপনি যে শান্তিকমিটির বাইরে ছিলেন এ জন্য আপনার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। বাংলাদেশে ও বাঙালির প্রতি আপনার যে প্রীতি মমত্ববোধ তা যদি সকলের মধ্যে থাকতো তাহলে, আমরা আরও সহজেই জারজ পাঞ্জাবীদের নির্বংশ করতে পারতাম।"

"শান্তিকমিটি না থাকলে কত তাড়াতাড়ি তোমরা দেশ স্বাধীন করতে পারতে তা জানি না রথীন তবে একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, সামরিক বাহিনীর নির্দেশ মেনে শান্তিকমিটি গঠন না করলে তোমরা যে সাড়ে ছয় কোটি লোক এখানে ফেলে গিয়েছিলে তাদের অনেককেই খুঁজে পেতে না, যে সমস্ত শহর বন্দর আজও বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মচঞ্চল হয়ে আছে তাদের চিহ্নও থাকতো না" প্রত্যয় নিয়ে বললেন হাসেম সাহেব।

—"শান্তিকমিটি গঠন করেও কি দালালেরা পেরেছে বাংলার মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে, মায়ের, বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে, আমাদের সম্পদ বাঁচাতে।"

অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করলেন রথীন বাবু। রথীন বাবুর স্বরে যে উষ্মা প্রকাশ পেয়েছিল তার অর্থ এতই সহজ যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে শান্তিকমিটির পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য পেশ করে গৃহস্বামী কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলেন বলে আমার মনে হলো। কী করে তাঁকে এই আলোচনা থেকে বিরত করা যায় সেই কথা ভাবছিলাম, এমন সময় আবার মুখ খুললেন তিনি। বেশ দৃঢ়তার সাথে বললেন "শান্তিকমিটি গঠন করার পরেও কিছু দুস্কৃতকারী ও শয়তানের প্রভাবে অনেক নিরপরাধ বাঙালি ভাই জীবন হারিয়েছেন সত্য, অনেক সতী সাধ্বী নারী হারিয়েছেন সতিত্ব, লুণ্ঠিত হয়েছে অনেক নিরপরাধ মানুষের সম্পদ। কিন্তু একথা তার চাইতেও বেশি সত্য যে, যদি সেই চরম দুর্দিনে, যখন তোমরা দেশবাসীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গেলে, যদি সামরিক জান্তার কথা না শোনা হতো তাহলে কমপক্ষে দশ গুণ লোক মরত, বিশগুণ নারী নির্যাতিত হতো ও এক শ' গুণ সম্পদ লুণ্ঠিত হতো। দেখ রথীন অপরাধীর অপরাধের পরিমাপ করতে হলে কোন পরিবেশে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, অপরাধী সেই অপরাধ না করে জীবন বাঁচাতে পারতো কিনা, যে ব্যক্তিকে অপরাধী বলে গণ্য করা হচ্ছে সে উপস্থিত না থাকলে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তার চাইতে অনেক কম কিংবা বেশি অপরাধ সংঘটিত হতে পারতো কিনা, এগুলি ঠান্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করে তবেই একজনের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া উচিত"। একটানা কথাগুলো বলে থামলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য যদিও অকাট্য যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তবুও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ষোড়শ বাহিনীর বন্ধনহীন মানসিকতা ও বিশৃঙ্খল পরিবেশের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। মনে হলো, এখনই বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু তেমন কিছু হলো না। তিনি বললেন "যে অপূর্ব ত্যাগ তিতিক্ষা, যে রক্তক্ষয়, যে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তোমরা দেশ স্বাধীন করেছ তা ভুলবার নয়। ভাবীকালের স্বাধীনতাকামী বিশ্ব মানুষের জন্য তোমরা হলে আদর্শ দৃষ্টান্ত। অনাগত কালের মুক্তিকামী মানুষেরা তোমাদের আদর্শ অনুসরণ করে ছিঁড়ে পেলবে পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খল একথা ভাবতেও বাঙালি হিসাবে, গর্বানুভব হয় আমার মনে। আমার আবেদন, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহনের কামনা নিয়ে আদম সন্তানকে হত্যা করো না তোমরা। পরাজিত শান্তি কমটির সদস্য, রাজাকার, মোজাহিদ, আলবদর ও আল শামসের পরিবারের সদস্যদের নির্যাতন করো না, তাদের বাড়ির ধ্বংস করে দিও না। তাতে স্বাধীনতার অমর্যাদা হবে। "আপনি কি বলতে চাইছেন, বুঝলাম না কাকাবাবু"—প্রতিবাদের সুর সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো রথীন বাবুর কণ্ঠস্বরে, বললেন "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে বেইমানী করে রাজশাহীর কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির চেয়াম্যান আয়েন উদ-দীন যে অপরাধ করেছিলেন সে জন্য ঝলমলিয়ার ক্রুদ্ধ জনতা তাঁকে হত্যা করে তাঁর মাথা নিয়ে ফুটবল খেলেছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা পৈশাচিক হলেও মীরজাফরদের জন্য এটাই একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি। এখন

আপনি যদি একথা মনে করেন যে, এ জাতীয় ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর কলঙ্ক লেপন করবে, তাহলে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।" রথীন বাবুর কথায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জীবিত আছি কিনা অতি সন্তর্পণে হাত পা নেড়ে পরীক্ষা করছিলাম। আমার মাথা কেটে নিয়ে কেউ ফুটবল খেলছে একথা চিন্তা করতেই আমি শিউরে উঠেছিলাম। আবার কথা বললেন হাসেম সাহেব, "শুধু মনে করা নয় রথীন আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, বিরাট আত্মত্যাগ ও বিপুল সংগ্রাম করে তোমরা যে গৌরবের প্রাসাদ গড়ে তুলেছ, এ জাতীয় ঘটনার অপকীর্তিতে সে প্রাসাদের বিলুপ্তি ঘটবে—স্বল্প সময়ে সে স্থানে জন্ম নেবে অপযশ। দোয়া করি, জাতির জীবনে সে দুর্ভাগা দিন যেন না আসে। তবে আমাদের ভুলের জন্য একান্তই যদি সেদিন আসে তবে আজ যে নিষ্পাপ জনতা তাদের প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে আমাদের স্বাধনিতা সংগ্রামের সূর্য সৈনিকদের—খোশ আমদেদ জানাচ্ছে তারাই তোমাদের বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে, হয় সমূলে শেষ করে দেবে, নইলে ঝেঁটিয়ে দেশের মাটি থেকে চিরতরে বিদায় করে দেবে।"

"আপনি যাই বলুন কাকাবাবু", বললেন রথীন বাবু, "স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করতেই হবে। স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হলে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।"

"খুবই সত্য কথা", বলে উঠলেন হাসেম সাহেব, "তবে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কে বা কারা এবং দেশের যথার্থ শত্রুর আসল পরিচয় কি তা নির্ধারণ করে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।"

"বিপ্লবোত্তর সময়ে সব দেশেই এটা হয়ে থাকে। ফরাসী বিপ্লবের পরে হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে, তাই বলে বিপ্লবের ধারা ব্যাহত হয়নি" কিছুটা উত্তপ্ত স্বরে জবাব দিলেন রথীন বাবু।

হেসে উঠলেন গৃহস্বামী। একটা কাশি দিয়ে, গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন "ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাস জ্ঞানের অভাব জাতীয় জীবনে টেনে আনে দুর্ভোগ।" কথা কয়টা বলে, কিছুটা বিরতি দিয়ে, মন্টুকে ডেকে আর এক কাপ করে চা সবাইকে দিতে আদেশ দিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আমার মনে পড়ল। বিপ্লবোত্তর ফরাসীতে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের নির্মম হত্যার কাহিনী অসত্য নয়, তবে তার ফলে ফরাসী বিপ্লবের স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়নি একথা মিথ্যা।"

সুতরাং বিষয়টা কি দাঁড়াল? শান্তিকমিটি মানুষজনকে রক্ষা করেছে। স্বাধীনতা বিরোধী কে?—এ নিয়েও বিতর্ক আছে। সেটার নিষ্পত্তি না হলে কাউকে শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। ফরাসী বিপ্লবের পর অনেক নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা—"ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাস জ্ঞানের অভাব জাতীয় জীবনে টেনে আনে দুর্ভোগ।" অর্থাৎ রাজাকারদের বিরুদ্ধে যা

লেখা হচ্ছে তা হচ্ছে ইতিহাস বিকৃতি। তবে, আয়েন উদ-দীনের একটি কথা ঠিক। ইতিহাস জ্ঞানের অভাবে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ হেনস্থা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। আর রাজাকাররা ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে, নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করবে।

আয়েন উদ-দীনের ফরাসী ইতিহাসের কাহিনীর বর্ণনা শেষ হয় ১৮৫ পৃষ্ঠায়। সেখানেই পেয়ে যাই তাবত বর্ণনার সারমর্ম। বা যেই অনুচ্ছেদটি লেখার জন্য ব্যয় করেছেন প্রচুর পৃষ্ঠা। আমি এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

হাসেম বলছিলেন রথীনকে—

"একটা কথা, পরাজিত দুষমনকে যতদূর পারবে ক্ষমা করবারই চেষ্টা করো। বাংলাদেশের পুনর্গঠনের পথে আত্মনিয়োগ কর। হিংসাত্মক পথে তা হবে না।" আমার স্মরণ হলো ইতিহাসের কথা। বিশ্বে মহৎ ব্যক্তিরা কোনদিনই পরাজিত শত্রু, আশ্রয়প্রার্থী অথবা বন্দীদের হত্যা করেনি। ধরেনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র, এমনকি তাদের সাথে অসদ্ব্যবহারও করেনি।"

বাঙালি আয়েন উদ-দীনদের এ থিসিস মেনে নিয়েছিল। এবং আজ তার কাফফারা শুধতে হচ্ছে আমাদের।

২০

আয়েন উদ-দীনের আশ্রয়দাতা হাসেম আসলে কে? আয়েন প্রথমে এর পরিচয় দেননি। ১৯৫ পৃষ্ঠায় এসে সে পরিচয় পাওয়া যায়। মুক্তিবাহিনী ঘেরাও করে হাসেমের বাড়ি। তিনি জানতে চান কী তাঁর অপরাধ? অপরাধ হলো, জানান একজন মুক্তিযোদ্ধা, "প্রথম অপরাধ হলো, আপনার ছোট ছেলে হানাদার বাহিনী নাটোরে আসার পর তাদের সক্রিয় সহযোগিতা করেছে এবং অনেক বাঙালির ঘরবাড়ি লুটপাট করেছে এবং অগ্নি সংযোগ করেছে। দ্বিতীয় অপরাধ হলো, আপনারা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শত্রু নাসের মাহমুদের লুটপাটের সম্পদ গচ্ছিত রেখেছেন এবং তাকে নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন। শেষ এবং তৃতীয় অপরাধ হলো কিছুক্ষণ আগে অন্যায়ভাবে মুক্তিবাহিনীর লোকদের অপমান করেছেন।"

মূল কাহিনী হলো, রহিম চায় তাদের বাড়ি থেকে আয়েন উদ-দীন চলে যাক। এদিকে মুক্তিবাহিনী খবর পেয়ে গেছে হাসেমের বাসায় আছে লুটের মালামাল। সুতরাং তারা তাদের বাড়ি সার্চ করতে চাচ্ছে। আয়েন উদ-দীন অবশ্য এসব 'ষোড়শ বাহিনী'র কার্যকলাপ বলে উল্লেখ করছেন। হাসেম তার পুত্রকে জানায়, শান্তিকমিটির লোকদের প্রতি তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পাক বাহিনী, রহিমকে হত্যা করতে চেয়েছিল। নাসের মাহমুদ তখন রহিমকে বাঁচায় এবং

হানাদার বাহিনীর মেজরের কাছে নিয়ে যায়। এভাবে আমরা জানতে পারি শান্তি কমিটিও কত উপকারী ছিল। তবে, এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, মানবিকতা নয়, হাসেম আয়েনকে আশ্রয় দিয়েছিল সে নিজে রাজাকার বলে বা রাজাকারের মতাদর্শে বিশ্বাস করে বলে। রাজাকারের মন বোঝার জন্য এ দু'টি পৃষ্ঠাও মূল্যবান। তাই দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও আমি তা উদ্ধৃত করছি—

"১৬ই ডিসেম্বরের পরে পরেই তার রূপ হয়েছিল ভয়ংকর—তার অনেক অপকীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শহরে। নরহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ছাড়াও রাজাকার শান্তিকমিটির পরিবারবর্গের সাবালিকা নাবালিকা নারীদের প্রতি তার লোমহর্ষক অত্যাচারের বিবরণ ভারতের অত্যাচারী বর্গীদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনীকে ম্লান করে দিয়েছিল।

খোন্দকার পরিবারের সাথে কাজী পরিবারের বিরোধ দীর্ঘদিনের। কারণ সম্পত্তি। খোন্দকার সাহেব অনেকবার চেয়েছেন বিরোধের অবসান কিন্তু জানুর একগুঁয়েমির জন্য সম্ভব হয়নি। একান্ত অনাহূতভাবে সে বাড়ির উপর চড়াও হয়ে এমন ব্যবহার করবে তা খোন্দকার সাহেবের কাছে অপ্রত্যাশিত না হলেও, ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। কাজীর অশালীন ব্যবহারে গুমরে গুমরে ফুলছিলেন তিনি, এমন সময় বাড়ি ফিরলেন তাঁর পুত্র। বাড়িতে ঢুকে অনেক সুটকেস বাক্স ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে তাকতে দেখে বোধহয় তাঁর মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তাই বেশ অসহিষ্ণু স্বরে আব্বাকে সম্বোধন করে বললেন "তখনই বলেছিলাম যে এসব ঝামেলা বাড়িতে রেখে কাজ নেই কিন্তু তবু আপনি আমার কথা শুনলেন না। এখন ঠ্যালা সামলান।" ছেলের অভদ্র মন্তব্যে একেবারে জ্বলে উঠলেন হাসেম সাহেব। প্রায় চিৎকার করে বললেন "দূর হয়ে যা বেয়াদব আমার সামনে থেকে। অকৃতজ্ঞ কোথাকার।" তারপর একটু থেমে বললেন "যেদিন পাক বাহিনী নাটোরে প্রবেশ করে তোমার বুকের উপর সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরে, তোমাকে জাহান্নামে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিল সেদিন নাসের মাহমুদ নিজের জীবন বিপন্ন করে তোমাকে রক্ষা করেছিল, তার আমানতকে ঝামেলা বলতে তোমার এতটুকু লজ্জা করলো না?"

চুপ করে রইলেন পুত্র। ঘটনা সম্যক অবগত হবার জন্য ঔৎসুক্য দেখা দিল আমার মাঝে। কাউকে ডাকবো কিনা ভাবছি এমন সময় গৃহকর্তা ঘরে প্রবেশ করে আমার চৌকিতে বসে টেবিলস্থিত খানার প্রতি নজর দিয়ে বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন "খানা খাননি?" জবাব না দিয়ে, সলজ্জ হেসে, খানা খেতে শুরু করলাম। ক্ষীণ হাসির আভা দেখা দিল তাঁর চোখে মুখে।

খাচ্ছিলাম। হাসেম সাহেব বললেন "জনাব, যে লোকের কৃতজ্ঞতাবোধ নেই তার মনুষত্ব নেই। আর মনুষত্বহীন মানুষ পশুর চেয়েও হীন। তার ভবিষ্যত অন্ধকার।" প্রতিউত্তর দেবার প্রয়োজনও ছিল না উপায়ও ছিল না। তাই নীরবে খাচ্ছিলাম আমি। তিনি বললেন "আয়েন সাহেব, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন

অকৃতজ্ঞতাই আমাদের অধঃপতনের কারণ। যে ইসলাম অকৃতজ্ঞতাকে পাপ বলে ঘোষণা করলো সেই ইসলামের অনুসারী হয়েও আমরা কত বড় অকৃতজ্ঞ হয়েছি চিন্তা করতে পারেন", বলে চললেন তিনি। "১২ই এপ্রিল সকালে পাক বাহিনী যখন নাটোরে প্রবেশ করলো তখন সমস্ত আওয়ামী লীগাররা—মায়, এস.ডি.ও ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারি শহর ছেড়ে চলে গেছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে নিরপরাধ বিহারী মুসলমানদের লাশ। অনেক দুস্কৃতকারীর সাথে হত্যা করা হয়েছে বহু অবাঙালিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধের কারণে। এমনকি রাজনীতির সাথে কোন প্রকারেই সংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রায় ত্রিশজন বিহারী কুলিকে স্টেশন থেকে নিরাপত্তার নামে নাটোর জেলহাজতে নেবার পথে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের মৃতদেহ ফেলে রেখেছে রাস্তার ধারে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। অনেক মৃত দেহের হাত নেই, কারো বা পা নেই, কারো ধড় থেকে মাথা করা হয়েছে বিচ্ছিন্ন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অধিকাংশই উলঙ্গ—তাদের মৃতদেহ যেন তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যাঙ্গোক্তি। এমনি পরিবেশে নাটোরে প্রবেশ করলো পাক বাহিনী। শহরের অবস্থা দর্শনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। সে এক চরম দুঃসময়। পাক বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে সত্য বক্তব্য পেশ করে, কিংবা তাদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে, এমন একটি লোক নেই সারা নাটোর শহরে। ফলে বেশ কিছু অঘটন ঘটলো। অপমৃত্যুর শিকার হলো অনেক বাঙালি মুসলমান। যাঁরা পাক-বাহিনীর আগমনকে খোশআমদেদ জানিয়েছিলেন তাঁদেরও অনেকে হয় মারা গেলেন অথবা অত্যাচারিত হলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো বাঙালি মাত্রেই। যারা ইসলাম পন্থীর দাবিতে শহরে রয়ে গিয়েছিল তারাও পালাতে শুরু করলো পল্লীর অভ্যন্তরে। ঠিক এমনি সময়ে রহিম পালাচ্ছিলো গ্রামের দিকে। কিন্তু ধরা পড়ল পাক বাহিনীর হাতে। ঘটনাস্থলেই জীবন শেষ হবার কথা কিন্তু ভাগ্যবলে তাকে পাক বাহিনী নিয়ে এলো নাটোর ক্যাম্পে। এই দুঃসংবাদ যখন আমার কাছে পৌঁছলো তখন কি করা যায় চিন্তা করতে গিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় বাড়িতে হাজির হলো নাসের মাহমুদ। মনে হলো সাহায্যের জন্য বেহেশত থেকে নেমে এলেন রহমতের ফেরেশতা। আমার কথা শুনে কালবিলম্ব না করে, আমাকে নিয়ে হাজির হলেন পাক বাহিনীর ক্যাম্পে।

"কিছু দিন লুকিয়ে থেকে সেদিনই" বলে চললেন তিনি, "নাসের মাহমুদ পল্লীর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে শহরে এসেছিলেন। তাঁর শুকনো চোখ মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা ছিল না যে তাঁর তখনও খাওয়া হয়নি। তাই তাঁকে কিছু খাবারের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি সোজা সামরিক বাহিনী ক্যাম্পে হাজির হয়ে আমাকে সহ দেখা করলেন জনৈক মেজর সাহেবের সঙ্গে। রহিম নিরপরাধ বলে আবেদন করলেন তাঁর মুক্তির। মেজরকে জানালেন আমার পরিচয়। কিন্তু বিপরীত কাণ্ড ঘটলো। গর্জে উঠলেন মেজর—"কাঁহা থা, তোমহারা মুসলিম লীগ

কা বাচ্চা জিস ওয়াকত নাটোরমে বেকসুর বিহারীকো মারা? ইয়ে মুসলিম লীগার নেহী হ্যায়, ইয়ে জালেম—ইন সবকো হাম জাহান্নাম মে ভেজেঙ্গে", মেজরের দুর্ব্যবহারে আমার বৃদ্ধ শরীরেও উত্তাপ অনুভব করলাম কিন্তু জবাব দিলাম না। মনে হলো, সত্যি তো কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম যেদিন নাটোরে দীর্ঘদিন যাবত কার্যরত নিরীহ ও দরিদ্র কুলিদের শুধুমাত্র অবাঙালি হবার অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল। তাই আমার মুখ দিয়ে কথা বের হয়নি। কিন্তু নাসের মাহমুদ চুপ করে থাকেননি। তিনি বিনয়ের সাথে মেজরের প্রতিটি যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। শেষে মেজরকে বোঝাতে না পেরে দেখা করেছেন ব্রিগেডিয়ার নিয়াজীর সাথে। চমৎকার উর্দুতে তাঁকে সমগ্র পরিস্থিতি বুঝিয়ে মুক্ত করেছেন রহিমকে। তাছাড়া সেদিন থেকেই নাটোরের প্রতিটি বিপদগ্রস্থ মানুষের সেবায় তিনি গেছেন এগিয়ে। সেই লোকটি গত ১৬ই ডিসেম্বরের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যখন আমার কাছে এসে জানালেন যে, তিনি আমার কাছে তাঁর কিছু মালামাল আমানত রাখতে চান তখন কি করে বলবো যে পারবো না। পারতেন আপনি ঐ অবস্থায় একজন মহান মানুষের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে?"

বোঝা যাচ্ছে, পাক বাহিনীর সহযোগি খুনী হচ্ছে 'মহান মানুষ'।

২১

লুটের মালামাল উদ্ধারের পর মুক্তিবাহিনী চলে গেছে। হাসেম ক্লান্ত। আয়েন উদ-দীন আতঙ্কিত।

রাজাকার-আলবদরদের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিবাহিনী খোঁজ করছে। এ সময় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক রাজাকারদের দণ্ড দেয়ার কাহিনী আছে। লক্ষ করবেন যে, এ ভাষ্য আবার হাসেম বা আয়েনের নয়। এ ভাষ্য রহিমের মুখ থেকে দেয়া হয়েছে। রাজাকারদের প্রতি যার তেমন সমবেদনা নেই। রহিম বলে হাসেমকে "শুধু মারা নয় আব্বা সে এক নির্মম কাণ্ড।" এ কাহিনী কতটুকু সত্য জানা যাবে না। কিন্তু এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা যে কত নিষ্ঠুর তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর সঙ্গে যদি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার ও চিত্রাবলি সংযুক্ত করা যেত তা হলে এ বর্ণনা গুরুত্ব পেত না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই রাজাকারের কাহিনীতে তা না হওয়ার কথা। আয়েন উদ-দীনের সে বর্ণনা আমি এখানে উল্লেখ করছি না। তার প্রতিক্রিয়া—

"তন্ময় হয়ে শুনছিলাম হৃদয়বিদারক ঘটনা। ভুলে গিয়েছিলাম নিজের অস্তিত্ব। হঠাৎ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে চোখ তুলে চাইতেই দেখলাম হাসেম সাহেবের চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুর ধারা। ফিরিয়ে নিলাম চোখ। আবার কথা বললেন রহিম সাহেব, 'শুধু পিপরুলেই নয়, আব্বু আজ দুপুরে

তেবাড়িয়াতেই আরও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। শান্তিকমিটির সদস্যকে খুঁজে না পেয়ে মুক্তিবাহিনী তার নিরপরাধ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে নির্মমভাবে হত্যা করে আগুন দিয়ে তার সমস্ত ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।' 'চুপ করো রহিম চুপ করো, আমি আর এসব কথা শুনতে চাই না', আর্তকণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন অসুস্থ হাসেম সাহেব। চুপ করলেন রহিম সাহেব। ঘরে নেমে এলো পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। আমার পরিবারের কথা চিন্তা করতেই সমস্ত দুনিয়াটা আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল।"

তারপর আবার ১৮ ডিসেম্বরের ফ্ল্যাশব্যাক। কীভাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন হানাদার বাহিনীর আশ্রয়স্থল নাটোর ওয়াপদা কোয়ার্টার্সে। একবার আত্মসমর্পণের কথাও মনে হয়েছিল। যাক, সকালে রহিমকে পাঠান হলো, পরিস্থিতি জানতে। আর হাসেম জানালেন, "জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের যে ঘটা লক্ষ্য করছি তাতে সত্যি উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই। যে বিষয়টিকে এতদিন অমূলক আশঙ্কা বলে মনে করছি, মনে হচ্ছে তাই সত্য হতে যাচ্ছে।" জাতির ভাগ্যাকাশে কী সেই দুর্যোগ? তার বিবরণ নেই। মনে হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশ দখল ও রাজাকার নিধনই হলো জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ। এই দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে অন্যান্য কাহিনী।

২২

আয়েন উদ-দীনের কাহিনীর ২১৪-৩৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার বিষয়বস্তু এ রকম—হানাদার পাকি বাহিনীর সদস্যদের কত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে—মুসলমান হয়ে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার! বিহারীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছে। সেই কংগ্রেসী আমল থেকে বিহারীদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। অর্থাৎ মুসলমানরা সব সময় নিগৃহীত হচ্ছে সুতরাং মুসলমানদের বিভেদ কাকে আনন্দ দেবে? আনন্দ দেবে হিন্দু ভারতকে। এই মূল থিসিসটি বর্ণিত হয়েছে তার কলেজ জীবন, বিবাহ, নেপোলিয়ন, নিক্সন, রাসেল প্রমুখের নানাবিধ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে—সেই পুরনো কৌশলে। দেড় শ' পৃষ্ঠার অবান্তর কাহিনীই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই থিসিস সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরার জন্য। এখানেও আমি পাঠকদের অনুরোধ করব, আলাদাভাবে সেসব ঘটনা বিচার করতে, না হলে রাজাকারের মন সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে না। বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে কাহিনীর বর্ণনায়, শব্দের প্রয়োগের দিকে। আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

১. পাকি মেজর আসলাম মার্চ মাসে তার বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। পথে আশ্রয় পেলেন মালিক আব্দুল্লাহ নামে নব্বই বছরের এক

বৃদ্ধের গৃহে। আবদুল্লাহ আওয়ামী লীগের জয়লাভে খুশি হলেও, "ইদানীং নানা দুঃসংবাদ শুনে ব্যথায় ভরে গেছে তার মন। বিশেষ করে মুসলমান হয়ে মুসলমানের রক্তপাতের অশ্রুতপূর্ব কাহিনী তাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।" মেজরকে তিনি আশ্রয় দেন। কিন্তু তার পুরো পরিবার এর বিরুদ্ধে। মেজর ধরা পড়ে। "প্রকাশ্য দিবালোকে নিরস্ত্র ও নিঃসহায় মুসলমানের অপমৃত্যুর সংবাদ দারুণ আঘাত হানে বৃদ্ধ আব্দুল্লাহ প্রামাণিকের হৃদয়ে। শোকাভিভূত হয়ে শয্যা নেন এবং মুসলমানদের অধঃপতনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। যাদের পূর্বপুরুষেরা ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী চরম শত্রুকেও আত্মসমর্পণের পর ক্ষমা করছেন—দিয়েছেন বন্দীর যথাযোগ্য মর্যাদা, যে জাতি কোন দিন কোন অপরাধে মুসলমান তো দূরের কথা কোন বিজাতীয় বৃদ্ধ, নারী ও শিশুর করেনি কণামাত্র অসম্মান সেই জাতির এই কলঙ্কময় পরিণতিতে পাগল হয়ে উঠলেন প্রামাণিক।" এবং তারপর এই শোকে মারা যান প্রামাণিক। তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি নাটকীয় ভাষণ দেন। এ ভাষণে রাজাকারি থিসিসের রূপরেখাটি পাওয়া যায়। তাই এখানে তা উদ্ধৃত করছি—

"জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে এর বেশি বলবার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু আমি এক মহাদুর্যোগের পরিষ্কার আভাস দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও প্রাণভিক্ষাকারী মানুষের উষ্ণ রক্তে তোমরা যে রক্তস্নান করলে তার প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ, মারাত্মক। সেদিন না আসুক সেই মোনাজাত করি। কিন্তু যদি আসে, আর যে যাই করুক, তোমরা অবশ্যই তা থেকে দূরে থেকো। শত্রু যত বড়ই হোক ক্ষমাপ্রার্থী হলে, ক্ষমা কর। দুশমন যত অপরাধই করুক, আত্মসমর্পণ করলে বন্দীর যথাযোগ্য মর্যাদা দিও। বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে অসম্মান করো না—সম্ভাব্য সব রকম সম্মান দান করো। ভুলে যেও না তোমাদের গর্বের বাদশাহ শেরশাহ, দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যত নির্মম ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকুন না কেন, হুমায়ুন পত্নীকে মায়ের সম্মান দান করেছিলেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে বন্দিনীকে প্রেরণ করেছিলেন স্বামীর কাছে।"

পিতার বক্তব্য শুনে, তাঁর মর্মব্যথার কারণ উপলব্ধি করে সন্তানেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন—কাতর কণ্ঠে চেয়েছিলেন ক্ষমা। নাতি-নাতনিরাও দাদুর প্রতি অসম্মানের পরিণতির কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে আনন্দানুভব করেছিলেন বৃদ্ধ। প্রাণভরে তাদের সুখী ভবিষ্যতের জন্য দোয়া করে বলেছিলেন, "তোমরা ভেব না, আমি তাদের ক্ষমা করতে বলছি যারা কায়েদে আজমের সাধের পাকিস্তানকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছে—আমি তোমাদের আমরণ সংগ্রাম করতে অনুরোধ করব ঐসব জালেম, অত্যাচারী, লম্পট, দায়িত্বজ্ঞানহীন মুষ্টিমেয় নেতা-উপনেতাদের বিরুদ্ধে, যারা দেশসেবার নামে লক্ষ কোটি দরিদ্র জনতাকে নির্মম ও নির্দয়ভাবে শোষণ করেছে, যারা মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম

করেছে, যারা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ক্রীড়নক হিসাবে অগণিত জনতার সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছে, যারা ইসলামের নামে মুসলমানদের সাথে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যারা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সর্বোপরি যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে জাতিকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিয়েছে।

"আমার শেষ অনুরোধ", বলেছিলেন প্রামাণিক, "তোমরা জেহাদ করো অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে—তা সে শাসক এখানকার হোক—কিংবা করাচী-লাহোর-পিন্ডি-ইসলামাবাদের হোক। তোমরা কোন প্রকারেই অগণিত শোষিত মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করো না—বাঙালি, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী, পাঠানীর জিগির তুলে নিজেদের একতায় ফাটল ধরাতে দিও না। মনে রেখ, নিজের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে তোমরা পাঞ্জাবী শোষকের প্রভাবমুক্ত হতে পারলেও বিভেদের ফলে যখন দুর্বল হয়ে পড়বে তখন অন্য শক্তিশালী শাসক তোমাদের ঘাড়ে চাপবে এবং যে শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সংগ্রাম করছো তার চাইতেও তারা বেশি শোষণ করবে।"

২. দ্বিতীয় কাহিনী মেজর আসলামের অধীনস্থ দুই জোয়ানের। এ কাহিনীতে বাংলা সিনেমার নানা উপাদান আছে। ফ্যান্টাসি, বাঘের খেলা, বীরত্ব, ট্র্যাজেডি। কাহিনীটি পুরো আয়েন-উদ-দীনের ভাষ্যেই উদ্ধৃত করব।

জোয়ান দুইজন রেল-লাইন ধরে এগোচ্ছিল। "এই লাইন ধরেই এসেছিল পাক বাহিনীর লক্ষ্যহীন সেই জোয়ান দু'জন গোপালপুর থেকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছাড়াও দীর্ঘপথ অতিক্রমের ক্লান্তি এবং সর্বোপরি দিনের আলো তাদের বোধহয় বাধ্য করেছিল নির্জন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণে। জংলী গ্রামের বিস্তীর্ণ জঙ্গল বোধহয় মনে হয়েছিল নিরাপদ স্থান। তাই তারা জংলী গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণে, রেল-লাইনের পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলে নিয়েছিল আশ্রয়। গভীর জঙ্গলের ভিতরে প্রকাণ্ড বটগাছের নিচে। বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা দেখে তারা শুয়ে পড়েছিল। ক্লান্তিজনিত কারণে ঘুমও এসেছিল উভয়েরই। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভাঙতেই তারা লক্ষ্য করল যে প্রকাণ্ড একটা চিতাবাঘ এক টুকরো বাঁশ নিয়ে খেলা করতে করতে বটগাছের দিকে এগিয়ে আসছে। অনভ্যস্ত চোখে বাঘের অদ্ভুত খেলা দেখে তারা রীতিমতো অবাক হলো—তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে, বাঘ পা দিয়ে বাঁশের টুকরাটাকে উর্ধ্বে নিক্ষেপ করছে। তারপর সেটা মাটিতে পড়বার আগেই দৌড়ে গিয়ে মুখ দিয়ে ধরে নিচ্ছে।

গভীর আগ্রহভরে জোয়ানেরা দেখছিল বাঘের খেলা। বাঘ তখনও আর্মীদের অবস্থান সম্পর্কে ছিল না অবহিত। সে ক্রমাগত এগিয়ে আসছিল বটগাছের দিকে। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো আর্মী জোয়ানদের। থেমে গেল তার খেলা—জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাইল তাদের পানে। সিপাহীরা অস্ত্র বাগিয়ে চকিতে নিজেদের প্রস্তুত করে নিল। মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধানে বাঘ ও জোয়ানরা চেয়ে রইলো পরস্পরের

দিকে। তারপর হঠাৎ এক বিকট চিৎকার করে বাঘ জোয়ানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য উদ্যত হতেই ট্রিগার চাপলো জোয়ানেরা। নিমিষে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো বাঘ, স্তব্ধ হলো তার আওয়াজ, রুদ্ধ হলো তার গতি। কিন্তু চাইনিজ স্টেনের ব্রাশ ফায়ারের প্রচণ্ড শব্দ গভীর অরণ্যের স্তব্ধতা ভেদ করে চলে গেল বহুদূরে, হতচকিত করে তুললো জংলী ও তার আশপাশের গ্রামের অধিবাসীদের।

বেলা তখন দশটার কাছাকাছি। জংলী ও আশপাশের লোকেরা জমায়েত হলো যেখান থেকে বিকট শব্দ ভেসে এসেছিল সেই অরণ্যের কাছে। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব সাধ্যমতো লাঠি-সোটা, সড়কি, বল্লম, দা নিয়ে হাজির হলেও ইতস্তত করছিল জংগলে প্রবেশ করতে। এমন সময় জঙ্গলের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলো কয়েকজন যুবক, যারা গভীর অরণ্যে, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে উৎপন্ন মূল্যবান পিপার ফল আহরণের জন্য প্রবেশ করেছিল।

পরিচিত যুবকদের দেখে দৌড়ে এলো গ্রামবাসীরা—জানতে চাইলো বিকট আওয়াজের কারণ। তারা বিবৃত করলো পূর্ণ ঘটনা। জানালো যে, তারা যখন গভীর অরণ্যে পিপার ফল তুলতে ব্যস্ত সেই সময় হঠাৎ লক্ষ্য করে একটা বাঘ। ভয়ে তারা সাত তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নিকটস্থ একটা বড় নিমগাছে। তারপর লক্ষ্য করতে থাকে বাঘের গতিবিধি।

বাঘ এগিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিম-উত্তর দিকে। যুবকদের দৃষ্টি ছিল বাঘের ওপর নিবদ্ধ। হঠাৎ তারা লক্ষ্য করলো উত্তর-পশ্চিমে, বটগাছের তলে সঙ্গীন উঁচিয়ে বসে আছে দু'জন জোয়ান। স্তম্ভিত হলো তারা। ভেবে পেল না কি করে এই জংগলে এলো তারা। আরও ভীত হয়ে উঠলো যুবকেরা। জোয়ানদের হাতে বাঘ মারা পড়বার অনেকক্ষণ পর অতি সন্তর্পণে গাছ থেকে নেমে তারা প্রাণের ভয়ে সব কিছু ছেড়ে আস্তে আস্তে পালিয়ে এসেছে। তাদের বিশ্বাস অনেক খান সেনা লুক্কায়িত আছে জংলী গ্রামের এই জঙ্গলে।

যুবকদের বক্তব্য শুনে হৈ চৈ পড়ে গেল সারা এলাকায়, দাবানলের ন্যায় এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো দূর-দূরান্তরে। দেখতে দেখতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কয়েক সহস্র লোক জমায়েত হলো জংলী গ্রামে। ওদিকে জোয়ান দু'জন বোধহয় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া গভীর অরণ্যে তাদের ভয় না থাকলেও জীবনের ভরসা ছিল না। কারণ হিংস্র জানোয়ারের অবস্থান এবং তাদের দ্বারা পুনরাক্রমণ সম্বন্ধে জোয়ানেরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। বোধহয় সেই কারণেই তারা ঐ জঙ্গলের উত্তর-পশ্চিম কোণে হাজির হয়ে কোন্ দিকে যাওয়া যায় সেটা পরীক্ষা করছিল। এমন সময় ঐ স্থান থেকে কিছুটা দূরে মাঠে কর্মরত কয়েকজন লোক তাদের দেখে চিৎকার করে ওঠে। নিমিষে জড়ো হয় অনেক লোক। সৈনিকেরা কি মনে করে আর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ না করে বের হয়ে আসে মাঠে।

মাঠে আসবার সাথে সাথে কয়েক হাজার লোক চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে, কিন্তু সাহস করে কেউই তাদের আওতার মধ্যে যায় না। সৈনিক দু'জন প্রথম অবস্থায় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা ফায়ার করলেও জনতার ক্ষতি হতে পারে, এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা দু'জনে ক্রমাগতভাবে পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে নাটোর-ঈশ্বরদী রেলওয়ে লাইনে উঠে পড়ে এবং দক্ষিণ দিকে যেতে থাকে। জনতা চতুর্দিকে ব্যূহ রচনা করে রাখলেও তাদের ধরবার বা মারবার কোন কার্যকরি ব্যবস্থা করতে সাহসী হয় না। কারণ সৈনিক দু'জনের কাছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং পর্যাপ্ত রাউন্ড গুলি তাকায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সবাই ভীত ছিল।

জোয়ান দু'জন রেলপথ ধরে সামান্য কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জনতার মধ্য থেকে দু'একজনকে আহ্বান করে এবং তাদের খাবার পানি দেবার জন্য জানায় আকুল আবেদন। কিন্তু কেউই তাদের সামনে যেতে সাহস পায় না। ফলে সৈনিকেরা তাদের হাতের অস্ত্র ও গুলিগুলো রেলপথসংলগ্ন ডোবায় ফেলে দিয়ে জনতার কাছে আবেদন করে পানির জন্য। ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে জানায় যে তারা নিরপরাধ। সরকারি চাকুরে হিসাবে তারা সরকারের নির্দেশ পালন করা ছাড়া আর কিছুই করেনি এবং তারা মুসলমান হিসাবে আর এক মুসলমান ভাইয়ের কাছে দাবি করে ন্যায়বিচার।

ন্যায়বিচারের নাম শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ে উত্তেজিত জনতা। নিরস্ত্র জোয়ানদের লক্ষ্য করে দূর থেকে শুরু করে প্রচণ্ড ইটপাথরের বৃষ্টি। অসংখ্য ইটপাথরের আঘাতে জোয়ান দু'জন স্বল্প সময়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। ফলে উন্মত্ত জনতা হায়েনার মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাটি, সড়কি, দা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তাদের দেহ।

অপরিসীম অত্যাচারের মধ্যেও একমাত্র কালেমা পাঠ ছাড়া তারা আর কিছুই বলেনি, প্রাণভিক্ষা চায়নি কিংবা এক ফোঁটা চোখের পানিও ফেলেনি। শুধু একজন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে পানির কথা বলেছিল। প্রতিউত্তরে তার মুখে প্রস্রাব করা হয়েছিল। যারা এই হত্যাযজ্ঞে শরিক ছিল তারাই পরবর্তীকালে অনুতপ্ত স্বরে একথা স্বীকার করেছে যে, তাদের ওপর অমন অমানুষিক অত্যাচার করা সমীচীন হয়নি।"

দেখুন শেষ বাক্যটি। হানাদার বাহিনীর সদস্যদের যারা হত্যা করেছিল তারা হয়েছিল অনুতপ্ত।

২৩

বাংলাদেশের মুসলমানদের ক্ষতি করেছে কে? বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে নানা অঘটন ঘটেছে। বাঙালি

জাতীয়তাবাদ খারাপ কেন?—আয়েন উদ-দীনের ভাষায়—"বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল আমাদের আন্দোলনের প্রধান এবং বলতে গেলে একমাত্র অবলম্বন। ফলে ভিন্ন ভাষাভাষী হয়েও সুদীর্ঘকাল ধরে যে মুসলমানেরা বাংলার মুসলমানদের কাছে আপন ভাইয়ের মতো সমাদর ও মর্যাদা পেয়ে আসছিল তারা রাতারাতি চরম শত্রু বলে পরিগণিত হলো—যে ভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান ভাই বাঙালি মুসলমানের প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালোবাসায় ধন্য ছিল তারা আমাদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ালো। সারা সাহিত্যে কাব্যে বাংলার মুসলমানকে ম্লেচ্ছ বলতে দ্বিধাবোধ করেনি, উপরে কেরানী, দারোয়ান, পাঁচক, খাজনা আদায়ী মণ্ডল এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ফকিরের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়নি, যারা আমাদের ছোঁয়া তো দূরের কথা ছায়া মাড়াতে রাজি হয়নি, যারা সুদীর্ঘকাল ধরে একান্ত নিরুপায় না হলে, বাঙালি মুসলমানদের চেয়ারে বসবার অধিকার দেয়নি, জাতীয়তাবাদের জয়গানে মুখরিত তারাই। এরাই রাজার বাড়ির সামনে দিয়ে জুতা পায়ে ছাতা মাথায় মুসলমানদের চলতে দেয়নি। বানিয়া ইংরেজের সহায়তায় মুসলমানদের চাকরি-বাকরি থেকে করেছে বিতাড়িত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে যাবতীয় সম্পত্তি থেকে করেছে নির্মমভাবে বঞ্চিত, শিক্ষা অঙ্গন থেকে বহিস্কৃত। ইংরেজানুকূল্যে কেরানী হতে বিরাট জমিদারীর অধিকর্তা হয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে মুসলমান প্রজাদের রক্ত শোষণ করে বাংলার মুসলমানকে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। খাজনা আদায়ের নামে মুসলমানদের পিঠে চাবুক মারতে সংকোচ বোধ করেনি—স্বীকার করেনি আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের অধিকার। তারাই একমাত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের কল্যাণে রাতারাতি হয়ে গেল পরম বন্ধু এবং তাদের সুপরিকল্পিত অপপ্রচারের জোরে মুসলমানরা হলো বিহারী, বাঙালি, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী ও পাঠানী।"

এই জাতীয়তাবাদের কারণে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। নাটোরে মোহাজেরদের হত্যা করা হলো। এক হিন্দু রাজনৈতিক নেতার বাসায় এসব সভা হতো। লক্ষ করবেন শব্দটি হচ্ছে 'হিন্দু রাজনৈতিক নেতা।' তারপর—

"এপ্রিলের দশ তারিখ অতি প্রত্যুষে দাবানলের ন্যায় চড়িয়ে পড়ল এক দুঃসংবাদ। স্তব্ধ বিস্ময়ে নাটোরবাসী শুনলো যে রাতের অন্ধকারে, নাটোর ট্রেজারীর সমুদয় টাকা লোপাট করে সংগ্রাম পরিষদের কার্যকরী সংসদের সদস্যবর্গ ও তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা সরে পড়েছে নাটোর থেকে—গাড়িযোগে চলে গেছে ভারতে। স্তম্ভিত হলো নাটোরের জনসাধারণ, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সারা নাটোর মহকুমার সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ কর্মিগণ।

নেতৃবর্গের হঠকারিতায় হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল সাধারণ কর্মীরা। উত্তেজনার জোয়ারে ভাটা পড়ায় বিবেকের দীপ উঠল জ্বলে। বিগত কয়দিনের কৃতকর্মের কথা চিন্তা করে আঁতকে উঠল কর্মীরা, বিবর্ণ হয়ে গেল সাধারণ মানুষেরা। প্রায়শ্চিত্ত করা যায় কিনা তা চিন্তা করার আগে ছড়িয়ে পড়ল লোমহর্ষক সংবাদ

পাকবাহিনী অপ্রতিহত গতিতে আসছে এগিয়ে এবং আসার পথে তারা বিধ্বংস করছে মানুষের বাড়িঘর, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে যাবতীয় সম্পদ, হত্যা করছে পুরুষদের। ধর্ষণ করছে নারীদের। স্বভাবগুণেই তারা চির নির্মম, চির কঠোর কিন্তু তাদের কঠোরতা অতীতের সব ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ তারা যেখানেই গেছে সেখানেই অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করেছে অবাঙালি হত্যার নির্মম ও মর্মস্পর্শী ছবি।"

পাকবাহিনি তখন পৌঁছে গেছে নাটোর। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কিছু দুস্কৃতকারী যারা লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ করেছে। কিন্তু এই দুস্কৃতকারী কারা? তারাই কি পরে রাজাকার হিসেবে যোগ দিয়েছিল হানাদার বাহিনীর সঙ্গে? এর উত্তর কিন্তু পাওয়া যাবে না আয়েন উদ-দীনের গ্রন্থে। এই যখন অবস্থা, তখন 'জনগণ' ছুটে গেল "নাটোরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পিডিপি, কেএসপির কাছে।" এরাই কিন্তু পরে হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে ওঠে। অবশ্য, এ ভাষ্যও নেই তার রচনায়। এই পটভূমিকায় নাটোরের "মহানুভব ব্যক্তি" মাহমুদের চেষ্টায় গঠিত হলো শান্তি কমিটি।

এই পর্যায়ে রাজশাহীতেও শান্তিকমিটি হয় এবং তার সভাপতি হন আয়েন উদ-দীন। কিন্তু কীভাবে তিনি শান্তি বাহিনীর সভাপতি হলেন এবং সে হিসেবে নয় মাস কী করেছিলেন তার কোন বর্ণনা নেই গ্রন্থে, কিন্তু বিবরণ আছে বিভিন্ন রসালো প্রেমের গল্পের।

আয়েন উদ-দীন মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তার কর্মকাণ্ডের কোন বিবরণ রেখে যাননি তার গ্রন্থে। আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত সেসব কাজকর্মের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে যে উপ-নির্বাচনের আয়োজন করেছিল আয়েন উদ-দীন তাতে রাজশাহী-১৩ আসন থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। শান্তিকমিটির সভাপতি হিসেবে হানাদার বাহিনীকে তিনি নিয়মিত 'দুস্কৃতকারী'দের তালিকা সরবরাহ করতেন। তার সে ধরনের দুটি চিঠি পাওয়া গেছে যাতে মোট ৪০ জনের নামের তালিকা ছিল। পূর্বোল্লিখিত আব্দুস সোবহান গণতদন্ত কমিশনকে জানান নয় জনকে আয়েন উদ-দীন হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সম্পত্তি দখলের জন্য এপ্রিলের শেষের দিকে হারুনুর রশীদ ওরফে হারাধনকে হত্যা করেন। এই হারাধনের চায়ের দোকানেই যৌবনে আয়েন উদ-দীনরা আড্ডা দিতেন। এ তথ্য আয়েন উদ-দীনের খালু শ্বশুর আবদুল গনি মোক্তারের যিনি খুনের মামলায় আয়েন উদ-দীনের পক্ষে ওকালতি করে তাকে মুক্ত করেছিলেন। '৭১ সালের অক্টোবরে একটি গ্রাম ঘেরাও করে হানাদার বাহিনী ১০০ জনকে আটক করে। তাদের মধ্যে থেকে বেছে আয়েন ৫ জনকে হানাদার বাহিনীর হাতে সোপর্দ করেন। অভিযোগ, তারা আয়েনকে ভোট দেননি। জাতীয়

গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী—"মূলত '৭১ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে রাজশাহীতে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে যে শত শত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতে আয়েন উদ-দীনের নেতৃত্বাধীন শান্তিকমিটি, রাজাকার প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী জড়িত ছিল বলে গণতদন্ত কমিশনের মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়।"

ইতোমধ্যে আত্মগোপন থাকা অবস্থায় আয়েন উদ-দীন খবর পান তার স্ত্রী-সন্তানরা বহাল তবিয়তেই আছে। তাদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের আত্মীয় এক মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার। এ ক্ষেত্রে মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার যে মানবিকতা দেখিয়েছিল তার জন্য কিন্তু আয়েন উদ-দীন কোন পৃষ্ঠা খরচ করেননি। যাবতীয় পৃষ্ঠা খরচ করেছেন হাসেমের মানবিকতা তুলে ধরার জন্যে। এটিই হচ্ছে রাজাকারের মন।

এখানেই শেষ নয়। হাসেমের ছেলে আলম ধরা পড়ে। শেষ ক'পৃষ্ঠায় তিনি সে কাহিনী বর্ণনা করেন। আলম ছিল ছাত্রলীগ কর্মী। হানাদার বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে বলে "হয় মৃত্যু নয় সহযোগিতা।" আলম সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছিল। হানাদারদের পতনের পর খুব সম্ভব তার পিতা বলেছিল পালিয়ে যেতে (আয়েন উদ-দীন তা উল্লেখ করেনি)। কিন্তু আলম যায়নি। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশে কোন অন্যায় হবে না—হবে না মানবতার অসম্মান সে বিশ্বাস ছিল আলমের। আর তাই সে প্রতিবাদ করেছিল পিতার কথার। বলেছিল, "এটা তোমার ভুল ধারণা আব্বা। আমি এমন কোন মারাত্মক অপরাধ করিনি যে, মুক্তি বাহিনীর লোকেরা আমার উপর অত্যাচার করবে। দেশ স্বাধীন হবার দিন অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বরে শ্বশুর বাড়িতে সে বুঝেছিল তার ভুল এবং এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে আব্বার সিদ্ধান্ত ছিল কতো নির্ভুল।"

এখানে লক্ষ করুন "মারাত্মক অপরাধ" শব্দ দু'টি। আয়েন উদ-দীন নিজেই আগে লিখেছেন, "আলমকে সামরিক বাহিনীর সাথে সাথে ঘুরে দেখাতে হয়েছিল নাটোরের বিশেষ বিশেষ ভদ্রলোকের আবাসস্থল। বলা বাহুল্য, সামরিক কর্তৃপক্ষ এগুলোর ক্ষতি করেছিল অনেক।" এ কাজ আয়েন উদ-দীনও করেছিলো। এগুলি কিন্তু তার ভাষায় মারাত্মক নয়? তা'হলে মারাত্মক কাজ কোনগুলি?

এর কয়েকদিন পর মুক্তিবাহিনী হাসেমের বাড়ি ঘেরাও করে। আয়েন উদ-দীন হাসেমের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নেয় আরেক বাড়িতে। "যে বাড়িতে প্রবেশ করলাম তাকে পোড়োবাড়ি বললেও কোন অত্যুক্তি হবে না। একটি ঘরে ঢুকে ঘরের কোণে বসলাম। পায়ের দিকে চাইতেই লক্ষ্য করলাম যে, বাম পায়ের তালুর অনেকটা অংশ কেটে ঝরছে অঝোরে রক্ত।"

এখানেই রাজাকার আয়েন উদ-দীনের কাহিনী শেষ। আগেই বলেছি, আয়েন উদ-দীন কৌশলী, তাই কাহিনীর বর্ণনাকে অলঙ্কৃত করেছেন। অন্যান্য রাজাকারের আত্মকাহিনীর মতো তিনিও তার কাহিনীতে উল্লেখ করেননি, কেন

তিনি পালিয়ে ছিলেন, কী ছিল তার অপরাধ? মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কী করেছিলেন। কিছুই জানা যাবে না।

সোজা বাংলায় একজন রাজাকার ১৬ ডিসেম্বরের পর জানের ভয়ে পালাচ্ছিল। সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে, যুক্তি দিয়ে আয়েন উদ-দীন বোঝাতে চেয়েছেন পৃথিবীর মহামানবরা বিশেষ বিশেষ সময়ে পালিয়েছিলেন। তাদের অনুসরণ করেই তিনি পালালেন। এটিই হচ্ছে তার রচনা কৌশল। পুরো বইটিতে এ কৌশলই নেয়া হয়েছে। কিন্তু, মূল প্রশ্ন হচ্ছে, মাও সেতুং বা শোয়েকার্নো বিপ্লব বা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছিলেন। এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশলগত কারণে মাঝে মাঝে হটে গিয়েছিলেন। কিন্তু জনাব আয়েন উদ-দীন কী কারণে পালাচ্ছিলেন? এ কথা কিন্তু কোথাও বলা হয়নি। এভাবেই রাজাকাররা তাদের রাজাকারিত্ব সবসময় ঢেকে রাখতে চেয়েছে।

তার বইটি পড়লে শুধু বোঝা যায়, মুক্তিযুদ্ধটা ঠিক ছিল না। আর জয়ের পর মুক্তিযোদ্ধাদের দেখানো উচিত ছিল 'মানবতা'। কিন্তু রাজাকাররা যে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছিল সেখানে কিন্তু মানবতার প্রশ্ন নেই। কারণ, তারা রাজাকারিত্বের বিরোধিতা করেছিল। এই হলো রাজাকারের মন, রাজাকারের মনের বৈশিষ্ট্য।

২৪

সা'দ আহমদ পেশায় অ্যাডভোকেট। এখন তার নাম ডাক তেমন শোনা যায় না বটে কিন্তু ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়ার রাজাকার হিসেবে মশহুর ছিলেন তিনি। শান্তি কমিটির প্রধান হিসেবে কুষ্টিয়া অঞ্চলে যা যা করার তা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর গ্রেফতার হন, কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তারপর সাধারণ ক্ষমায় ছাড়া পেয়ে যান। ১৯৯০ সালে তার লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়, নাম *মুজিবের কারাগারে পৌনে সাত'শ দিন*।

কী বলতে চেয়েছেন তিনি? তার ভাষায়—"এই বইতে কারাজীবনের কাহিনীই শুধু ভাষায় রূপ পায়নি, এতে স্থান পেয়েছে এই দেশের একটি অধ্যায়ের ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস, একটি নূতন রাজনৈতিক ভূখণ্ডে সর্বগ্রাসী ভাঙ্গনের করুণ আর্তনাদ, সর্বনাশা বিভেদ ও অনৈক্যের সয়লাব এবং নব্য শাসক ও শোষকের 'পৌনেসাতশ' দিনের সীমাহীন লুণ্ঠন ও নির্যাতনের কাহিনী।"

এবার শব্দগুলি অনুগ্রহ করে লক্ষ করুন। তিনি স্বাধীনতার পর দুই বছরের কাহিনী মূলত বিধৃত করতে চান যেখানে শাসক ছিলেন 'শোষক'। এবং সে সময়টা ছিল 'সীমাহীন লুণ্টন ও নির্যাতনের সময়; যখন বাংলাদেশে খালি শোনা গেছে 'সর্বগ্রাসী ভাঙ্গনের করুণ আর্তনাদ।' এর আগে বা ঠিক ১৯৭০-৭১-এ সয়মটা কী ছিল? নিশ্চয় সুসময়,—তাই বলতে চান সা'দ আহমদ।

অন্যান্য রাজাকার স্বাধীনতার পর যা আশা করেছিলেন সা'দ আহমদও তাই চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ১৭ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ হবে আবার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগের মতো। ১৯৭১ এ কী হয়েছিল তা কেউ মনে রাখবে না। ভাই বুকে জড়িয়ে ধরবে বোনের ধর্ষণকারিকে, পিতা কাঁধে হাত রাখবে পুত্রের হত্যাকারীর, বিধবা স্ত্রী সানন্দে আসন পেতে দেবে স্বামীর হত্যাকারীকে। কেন তা হলো না এটিই তার বা তাদের বড় ক্ষোভ। লিখেছেন সা'দ—

"দেশ স্বাধীন করার আন্দোলনের ধারা প্রকৃতি সম্পর্কে একটি গণতান্ত্রিক দেশে মতপার্থক্য স্বাভাবিক তবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটির প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নের কারও মনে কোন দ্বিমত ছিল না। আশা ছিল পৃথিবীর মানচিত্রে যে নূতন দেশের পত্তন হল তাকে গড়ে তোলবার ডাক পড়বে সবার। অতীতের রাজনৈতিক মত পার্থক্যের দরুন নূতন রাষ্ট্রশক্তির ছোবল দিয়ে কাউকে দংশন করা হবেনা, আর সমৃদ্ধি ও উন্নতির পূর্বশর্ত শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিজয়ী দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা দলমত নির্বিশেষে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবেন। কিন্তু নুতন রাজনৈতিক ভূখণ্ডে নব শাসকরা সেবা, ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধনে সর্বস্তরের মানুষকে না বেঁধে শুধুমাত্র ঘৃণা, আক্রোশ ও প্রতিশোধের বহ্নি জ্বালিয়ে যাত্রা শুরু করলেন এবং সাড়ে তিন বছর শাসন ও শোষণ করে প্রকৃতির অমোঘ বিধানে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হলেন।"

সমস্যা হচ্ছে এতদিন পরও আবার দালাল-অদালাল কথা তোলা হচ্ছে। এ সব না তুলে জিয়াউর রহমানের মতো কেন সমন্বয়ের রাজনীতি করা হচ্ছে না এ ক্ষোভটা তার প্রকট। মনে রাখা দরকার যে সেই সময় নতুন করে ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছিল। বিষয়টি পছন্দ হয়নি রাজাকারদের। তাই সা'দ আহমদ ভূমিকায় লিখেছেন—

"দেড় যুগ পর তাদের উত্তরসূরীদের উৎকট পদধ্বনি আবার নূতন করে শ্রুত হচ্ছে নিজেদের দুস্কৃতিকে আড়াল করার প্রচেষ্টায় 'দালাল'-'অদালালের' পার্থক্য সৃষ্টির পুরানো হাতিয়ারকে ধারাল করে জাতীয় ঐক্যের ফাটল ধরানোর উন্মত্ত খেলায় তারা মেতে উঠেছে। বৈরী প্রতিবেশীর আগ্রাসী থাবার মোকাবিলায় দুর্জয় জাতীয় ঐক্য যে মুহূর্তে বেশী কাম্য সেই সময়কেই বেছে নেওয়া হয়েছে এই সর্বনাশা খেলার জন্য। আদর্শহীন ও লক্ষ্যহীন সরকারের প্রচারযন্ত্রও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। রাষ্ট্র পরিচালনায় সীমাহীন ব্যর্থতা, জনগণের ধূমায়ীত অসন্তোষ, বিপর্যস্ত জনজীবনের পুঞ্জীভূত সমস্যা ঢাকা দেবার কৌশল হিসাবে প্রতি বছর ঘটা করে 'দালালদের কে কোথায়' প্রচারের নামে রেডিও, টিভি, পত্রিকা মারফত ঘৃণা ও প্রতিশোধের বহ্নিকে জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টা চলছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তীর ১৯ বছর পরও আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রচারণার শিকার।"

সা'দ লিখেছেন—"সময়' বা 'কালই' হচ্ছে সাক্ষী, সময়ই ইতিহাস হয়ে তার বিশাল পাঠাগারে সব কিছু ধারণ করে রাখে। তাই তথাকথিত 'দালালদের' একটি

বক্তব্য ইতিহাসের পাঠাগারে অবশ্যই রক্ষিত থাকা উচিত" এবং সে কারণেই এই গ্রন্থ রচনা। আর রাজাকাররা কীভাবে ভ্রান্ত দলিল রেখে যাচ্ছে তা তুলে ধরার জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

২৫

বারো অধ্যায়ের ১৯২ পাতার বই *মুজিব কারাগারে পৌনে সাত'শ দিন*। বইটি উৎসর্গ করেছেন তার স্ত্রী ও "সেই সব সংগ্রামী বন্ধু, সাথী ও মর্দে মুজাহিদদের উদ্দেশে, যাদের ত্যাগ কোরবানী ও ঝরানো রক্তে এই দেশে তাওহিদের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের দুর্গম পথে হাজার কাফেলার যাত্রা শুরু হয়েছে" ইত্যাদি। অর্থাৎ ১৯৭১-এ যারা সাথী ছিল তারা অর্থাৎ রাজাকাররা। এখানেই সে কথা আবার প্রমাণিত হয়—যে একবার রাজাকার সে সবসময় রাজাকার। রাজাকারি ভোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কারণে আড়াই দশক পর জেনারেল নিয়াজী তার লেখা বই উৎসর্গ করেন রাজাকারদের।

সা'দ আহমেদের কাহিনী শুরু ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। জনতা চলছে রেসকোর্সের দিকে। মতিঝিলের একটি ইমারতে বসে সা'দ বিষণ্ন মনে তা দেখছেন এবং তার মনে হয়েছে—"শুধুমাত্র কয় বিঘা জমি নিয়ে একটি দেশের জন্য গর্ব করার কিছু নেই। একটি দেশের আসল বস্তু হচ্ছে মানুষ। মানুষ এখানে সুখী কিনা, শোষণমুক্ত কিনা, সামাজিক বিচার ও ন্যায়নীতি এ সমাজে আছে কিনা এটাই দেখার বিষয়। বেইনছাফীতে ভরা একটি বিরাট ভূখণ্ডের চাইতে ইনছাফ ও কল্যাণ বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বর্গমাইলের একটি রাষ্ট্রও অনেক শ্রেয়।" এখানেই প্রশ্ন ওঠে পাকিস্তানে ইনসাফ ছিল কিনা? ছিল না। তা'হলে সা'দ আহমদদের পাকিস্তান নিয়ে গর্ব করার কি আছে? মানুষ যদি একটি দেশে আসল হয়, তা' হলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সবাই বাংলাদেশ চেয়েছিল এবং সে আশা যদি পরিপূর্ণ হয় তা'হলে নতুন রাষ্ট্রে গর্বিত না হওয়ার কি থাকতে পারে। জানি, সা'দ এর কোন উত্তর দিতে পারবেন না।

নতুন সরকার আসার পর কি হলো? "কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অভাবে পাক বাহিনীকে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ক্ষতিসাধনে সাহায্যকারী ছাড়াও নিষিদ্ধ দলগুলোর সদস্য ও কর্মী যারা অতীতে আওয়ামী লীগের মতাদর্শের সাথে একমত হতে পারেনি, উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উর্দুভাষী জনসাধারণ, পাক আমলে অনুষ্ঠিত স্কুল কলেজের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী, রেডিও টেলিভিশনে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণকারী বক্তাগণ, বিদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ ইত্যাদি সবাইকে দালাল হিসাবে আখ্যায়িত করা শুরু হল।" বাক্যটি লক্ষ্য করুন। মুক্তিযুদ্ধ কি আওয়ামী লীগের ছিল, না আপামর

জনসাধারণের ছিল? আর যে সব কর্মের কথা তিনি বলেছেন তাতে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা কি একধরনের সহযোগিতা করেনি পাকিস্তানী হানাদারদের। যদি তাই হয়ে থাকে তবে তাদের দালাল না বলে কী আখ্যা দেয়া যেতে পারে?

তারপর 'ভয়াবহ খবর' সব পেতে থাকলেন সা'দ। যে সব অঞ্চল "ভারতীয় সেনাদের দখলে চলে যায় সেখানে পাইকারী হত্যা ও নির্যাতন শুরু হয়েছে সংজ্ঞাবিহীন দালালদের উপর।" অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীও এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু, অনেক রাজাকারই তাদের কাহিনীতে জানিয়েছেন ভারতীয় বাহিনী তাদের 'প্রটেক্ট' করেছে। আর পাইকারিভাবে দালাল নিধন করতে পারলে তো আজ ত্রিশ বছর পর আবার দাবি উঠত না ঘাতকদের বিচারের। সা'দ আহমদের মনে হয়েছে—"কোন আইন লংঘনের জন্য আমি অপরাধী? অন্ততঃ ১৯৭২ সনের ২৩শে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রচলিত এবং জারিকৃত কোন আইনে আমি দোষী নই। সুতরাং আমি 'অপরাধী' এই ধারণাই বা মনে স্থান দেব কেন?"

মনে হচ্ছে সা'দ আহমদ নিস্পাপ শিশু। তিনি জানেন না কেন তিনি দোষী। শুধু শান্তি কমিটিতে থাকার কারণেই তিনি অপরাধী। কিন্তু, সব রাজাকারই মনে করে, তারা দোষী নয়। তাদের শুধু শুধু হেনস্থা করা হচ্ছে। পাকিস্তান রক্ষার জন্য তারা খুন, ধর্ষণ করেছে। এটাতো কোন অপরাধ নয়। যে কারণে, কোন রাজাকার আজ পর্যন্ত অনুতাপ প্রকাশ করেনি।

এর মধ্যে সা'দের ভাষায় তাকে 'হাইজ্যাক' (অর্থাৎ ধরে নিয়ে যাওয়া হয়) করা হয় এবং মুক্তিপণের মাধ্যমে তিনি মুক্তি পান। ইতোমধ্যে খবর পান যে, কুষ্টিয়ায় রাজাকারদের ধরা হচ্ছে, হত্যাও করা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। এটি তার মনে বেদনার সৃষ্টি করে। তার মনে হয়েছে, তিনি শান্তি কমিটিতে ছিলেন বটে কিন্তু অপরাধতো করেননি। আর, তার ভাষায়, "শান্তিকিমিটি করে আমরা সামরিক বাহিনীর কোন অন্যায় কাজে সাহায্য করি নাই বরং এই দেশে সামরিক বাহিনী যে আগুন জ্বালিয়েছিল এবং সে আগুনে দেশের মানুষ পুড়ছিল তা শান্ত করার জন্য জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রশ্নে এই শান্তিকমিটি গঠন করা হয়েছিল?"

বাংলাদেশে যারা ছিলেন তাদের কি এই বক্তব্য বিশ্বাস করতে হবে? তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "সরকারের হিসাব গ্রহণ যোগ্য হলেও অর্থাৎ এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিলেও [যেন এ হিসাব মিথ্যা] এদেশের সাড়ে ছয়কোটি মানুষ দেশের মাটি কামড়ে ছিল এবং তারা পাক সামরিক বাহিনীর অত্যাচারেরও শিকার হয়েছে। স্বাধীনতার পর বেশ অনেক দিনই মুক্তিবাহিনীর ধারণায় এই সাড়ে ছয় কোটিই ছিল দালাল এবং তাদের উপর যেকোন অত্যাচার করা জায়েজ মনে করা হত ”

এই বাক্যের মাধ্যমে সা'দ রাজাকার ও দেশের অবস্থানরত মুক্তিযুদ্ধে জয়ের আকাঙ্ক্ষা মানুষদের এক করে ফেলেছেন এবং সবার সমবেদনা

পাওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু, তিনি ভুলে গেছেন দেশে অবস্থানরত মানুষ রাজাকারদের কখনই তাদের অংশ বলে মনে করেনি। মনে করেছে তারা হানাদার পাকিস্তানীদের সহযোগী। রাজাকার এবং মানুষে তারা পার্থক্য করেছে এবং তা এখনও বিদ্যমান।

২৬

বাংলাদেশে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। সবার আশা বঙ্গবন্ধু এসে হাল ধরলে সব ঠিক হয়ে যাবে। রাজাকাররাও সে আশা করছিল, তবে তা অন্যকারণে। এবং কেন রাজাকাররাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বঙ্গবন্ধুর প্রতি সে বিবরণ দিয়েছেন সা'দ দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

১০ জানুয়ারি শেখ সাহেব ফিরলেন। "কিন্তু দুভার্গ্য—শেখ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় জনতাকে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ না দিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির বাণী শুনালেন। তিনি ঘোষণা করলেন, দালালদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কোন মতেই মায়া করা হবে না।"

এই ঘোষণা দালালদের ক্ষুব্ধ করেছে। এর বিপরীতে তাদের যুক্তি লক্ষ্য করার মতো। লিখেছেন সা'দ—"পাক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বহু তিক্ততা সৃষ্টি হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। বহু মানুষের রক্ত ঝরে উভয় দেশের মাটিই লাল হয়েছিল। কোটি কোটি মানুষ ব্রিটিশের শাসনযন্ত্রের অংশ হিসাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির শুভলগ্ন পর্যন্ত ব্রিটিশের হয়ে কাজ করেছিল। কিন্তু এসব কারণে না ভারতে না পাকিস্তানে কাউকে দালাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, আর না কাউকে হয়রানি করা হয়েছে। ভারত বা পাকিস্তানে দালাল আইন রচিত হয়নি। সংজ্ঞাবিহীন দালালদের বিরুদ্ধে শেখ সাহেবের হুঙ্কার মুক্তিবাহিনী, আওয়ামী লীগ কর্মী ও নব্য দুস্কৃতিকারীদের মনে জিঘাংসা জাগিয়ে তুলল। কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল কলেজ, রেশনের দোকান, মায় ফুটপাতের ক্ষুদে হকার সর্বত্রই এ আগুন ছড়িয়ে গেল। হিন্দুস্তানে পালিয়ে যাওয়া এক কোটি বাদে অবশিষ্ট সাড়ে ছয় কোটিই তটস্থ, সন্ত্রস্ত—না জানি কখন দালালির অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা নিশ্চিহ্ন হতে হয়।"

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ দুটোর পরিপ্রেক্ষিত, প্রকৃতি যে একেবারে আলাদা তা সা'দ বিচার্য মনে করেন নি। এবং আবারও লক্ষণীয় সবসময় রাজাকারদের তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত সাড়ে ছয়কোটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করছেন কৌশলগত কারণে যাতে রাজাকাররা যে অপরাধ করেছে তা বাধ্য হয়ে করেছে সে কথা প্রমাণের জন্য।

দালাল আইন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সা'দ লিখেছেন—

"কিন্তু একি? এ সংসারে অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে মন চায়না তবুও বিশ্বাস করতে হয়। বিচারপতি রাষ্ট্রপ্রধান গদিতে আসীন হয়ে প্রথমেই যে ফরমান জারী করেছেন, তাতে ইনছাফের ভিত্তি শুধুমাত্র নড়েই উঠেনি বরং ধ্বসে গিয়েছে। বিচারের মূল কেন্দ্রে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের ১৯৭২ সনের ৫নং ফরমান বা হুকুম যা হাইকোর্ট অব বাংলাদেশ ১৯৭২ বলে পরিচিত, গত ২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা হাইকোর্টকে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে এবং সেস্থলে নতুন হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়েছে। এ আদেশ জারী হয়েছে ১৯৭২ সনের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে। এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য হলো যে নতুন রাষ্ট্রের নতুন হাইকোর্টকে সর্বপ্রকার রিট জারী করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। অর্থাৎ ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত পরাধীন বাংলাদেশের পরাধীন ঢাকা হাইকোর্ট সরকারি যন্ত্রের বেআইনী কার্যকলাপ ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে পরাধীন দেশের নাগরিককে নিরাপত্তা দানের জন্য যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করত তা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন ঢাকা হাইকোর্ট প্রয়োগ করতে পারবেনা। অপূর্ব স্বাধীন দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট পদক্ষেপ।"

দালালদের জন্য দালাল আইন করা হবে নাতো কী হবে? রাজাকারদের বক্তব্য একটি তারা যা করার করেছে কিন্তু তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া যাবে না। শাস্তি দিতে গেলেই 'ইনসাফ' আর থাকে না। কিন্তু শাস্তি না দিলে যে সাতকোটির বিরুদ্ধে 'ইনসাফ' চলে যায় এ যুক্তিটি স্বাভাবিকভাবেই তারা এড়িয়ে গেছে। দুঃখের বিষয়, আমরাও তাই করেছি।

ক্রুদ্ধ হয়ে সা'দ লিখেছেন—"প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে দেশের প্রচলিত আইনের চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে কতকগুলো অত্যাচারমূলক ধারা এই হুকুমের মধ্যে সামিল করা হলো।" এবং আশ্চর্য হয়ে তিনি লিখেছেন, কেউ এর প্রতিবাদ করল না। তার একবারও মনে হয়নি, নরঘাতকদের কাঠগড়ায় নিলে কেউ তার পক্ষে কথা বলবে কেন? তারপর তিনি লিখছেন—

"দালাল পাকড়াও করার নামে এবং দালালের বাড়িঘর তল্লাসের নামে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার মহাসুযোগ এইসব আইনগুলো সৃষ্টি করে দিল। সুতরাং তারা জানাল খোশ আমদেদ এবং চর্তুগুণ উদ্দীপনার সাথে দালাল নিধন ও দালালদের সম্পত্তি লুটপাট শুরু হলো। দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল দৈনিক পত্রিকাগুলোর কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ না করাই ভালো। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ইয়াহিয়া সরকারের গুণগানে মুখর ছিল তারা এখন বর্তমান সরকারের নজরে 'গুড বয়' হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, যা সি, আই, ডি পুলিশের পক্ষেও সম্ভবপর নয়, সে কঠিন কাজও তারা করছে। সামরিক

শাসনামলে কোন মুসলিম লীগ, জামায়াত, পি.ডি.পি নেতা বা রাজাকার আলবদর কোথায় কত শত, হাজার বা লক্ষ নরনারী হত্যা করেছে তা এরা অবলীলাক্রমে নিজেদের অফিসে বসে বলে চলেছে, কাগজের পাতায় ছাপিয়ে চলেছে। কোন ডোবা বা ইন্দারা থেকে উদ্ধারকৃত কোন কংকাল বা হাড়ের স্তূপের ফটো দেখেই এরা বলে দিচ্ছে, কোন প্রগতিশীল ব্যক্তিদের লাশ এগুলো আর কোন ধর্মান্ধ ব্যক্তি হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগের স্বীকার মতে যে পঁচিশ হাজার পাক সেনাকে এদেশে হত্যা করা হয় বা আন্দোলনের নয় মাসে মুক্তিবাহিনী বিভিন্ন স্থানে দালাল হিসাবে যাদেরকে হত্যা করে এবং উর্দূভাষী নরনারী বিভিন্ন সময়ে যারা মৃত্যুর শিকার হয়, তাদের কোন কংকাল বা হাড়ের চিহ্ন এদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল সাংবাদিকরা দেখতেই পেলেন না। রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক জারীকৃত হুকুমনামাগুলোর এবং বিশেষ করে দালাল আইনের জারী গান গাইতে এরা শুরু করেছে। সামরিক বাহিনীর যে কোন কু-কর্মকে সরকারের প্রতিপক্ষদের উপর এমনকি নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হচ্ছে। আমার সম্পর্কে লিখা হলো 'কুষ্টিয়ায় প্রখ্যাত দালাল সা'দ আহমদের বাসার নিকটে একটি ইন্দারার মধ্যে বহু মাথার খুলি পাওয়া গেছে ... ।' বহু বিশ্লেষণ দিয়ে আমাকে বিভূষিত করা হয়েছে এবং আমি যে একজন বিরাট খুনী সে রায়ও তারা দিয়ে দিয়েছে। আমার নিজের বাড়িতে বা বাড়ির পার্শ্বে কোন ইন্দারার অস্তিত্ব ছিলনা বা নাই। অনেকগুলি বাড়ি পার হয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে রেল কর্মচারিদের বাসার কাছে ওদের ব্যবহৃত একটি ইন্দারা আছে। ওখানে কোন মাথার খুলি পাওয়া গেছে বলে কারো জানা নেই। তবে যদি পাওয়া যায়ই সেটা কি আমার বাড়ির পাশ হলো? আর শহরের কোন প্রান্তে বা অপর কোন স্থানে ইন্দারা থাকলে নিশ্চয়ই তাও আমার বাড়ির পাশে অবস্থিত একথা বলা চলে না।"

এখানে কয়েকটি বক্তব্য আছে, ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সে সব পত্রিকা পাকিস্তানের গুণগান গেয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সময় যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তারা স্বাধীনভাবে বেরুত নাকি পাকি বাহিনীর নির্দেশে প্রকাশিত হতো। সা'দ বলছেন, নয়মাসে তারা যে সব হত্যাকাণ্ড করেছেন সেগুলির চাক্ষুষ কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেনি। সামরিক বাহিনীর কার্যাবলি প্রতিপক্ষের ওপর চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তিই বা কী আছে আর প্রতিবাদই বা কী করব। ব্যাপারটা এরকম। গোলাম আযম এখন যদি বলেন, বাংলাদেশ হয় নি। আপনি, আমি এর বিরুদ্ধে কী যুক্তি দেব?

এ পরিপ্রেক্ষিতে সা'দ তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন যা আগে উল্লেখ করেছি এবং তা মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন। *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়*—গ্রন্থেও একই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সে রিপোর্টটি আমি উল্লেখ করছি—"কুষ্টিয়া জেলা জামাতে ইসলামী ও শান্তি কমিটির সভাপতি সাদ আহমেদ। স্বাধীনতার পর তার বাড়ির কাছে একটি কূপ থেকে ২৫টি মাথার খুলি ও নরকঙ্কাল আবিষ্কার করা হয়। দালালীর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় কিন্তু অত্যন্ত লঘু শাস্তি দিয়ে তাকে নিস্কৃতি দেওয়া হয়।"

২৭

অবশেষে সা'দ আহমদ গ্রেফতার হলেন। জেলে নেয়ার পর উচ্চপদস্থ এক পুলিশ অফিসার এসে তাকে সালাম করে, সাদরে ভেতরে নেয়ার বন্দোবস্ত করলেন। এ ধরনের ঘটনার কথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। হত্যা করেও যে রাজাকাররা বেঁচে গেল তা আমাদের সাতকোটির কিছু মানুষের কারণে। এখন মনে হয়, সমাজের সেইসব লোকগুলোকেও রাজাকারদের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করা জরুরী ছিল। জেলে ঢুকেই সা'দ দেখেন—

"প্রায় লোকের শরীরে যখম। তাজা রক্তের প্রলেপ দেহের সর্বাঙ্গে মনে হলো বন্দী করবার পর প্রচুর মারপিট করা হয়েছে। অফিসে জনৈক সুঠাম দেহী ও সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোক প্রবেশ করলে সবাই উঠে দাঁড়ালো। সেই ফ্যান্সীকাট গোঁফওয়ালা দু'জন যুবকও তার কাছে এগিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দিল। কথাবার্তায় জানলাম উনি জেলার বাস্তব ক্ষেত্রে জেলের হর্তাকর্তা নাম নির্মল চন্দ্র রায়। মুক্তিবাহিনীর এই সদস্যদের যথেষ্ট ইজ্জত দেখালেন জেলার বাবু। ইতিমধ্যে কয়েকজন সিপাই পাশের কামরা থেকে একজন উর্দূভাষীকে নিয়ে আসলো জেলারের কাছে এবং বললো "এই সেই লোক"। লোকটি বৃদ্ধ, বয়স আশির উর্ধে, সাদা দাড়িতে, ফর্সা চেহারায় ও খুন ঝরা শরীরে তাকে অপূর্ব লাগছিল আমার কাছে। লোকটিকে দেখামাত্র জেলার গোটা কয়েক লাথি মারল। আর সেই সঙ্গে গোঁফওয়ালা যুবক দু'টির মধ্যে একজন বৃদ্ধের শরীরে উপর্যুপরী আঘাত হানতে লাগল। কি অপরাধ ছিলো বৃদ্ধের জানিনা—কেন মারা হলো, তাও জানিনা—তবে এরূপ মারপিট করবার কোন বিধান ধর্মে বা দেশের আইনে নাই তাই জানি। মনের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, কিন্তু আমিও বৃদ্ধের মতো বন্দী। মন দূর অতীতের রুদ্ধ দরজায় ঘা দিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে পঁচিশ বছর আগে আমরা মুক্তির একটি পথ বেছে নিয়েছিলাম। কালের ঘটনা প্রবাহে 'মুক্তিকে' অভিশাপ মনে করে 'দেবতাদের কাছ থেকে বাঙালি হবার "বর" চেয়ে নিয়েছি।' জাতয়িতাবাদের আগুনে জীবনের পবিত্র মূল্যবোধ, মানবীয় অনুভূতিগুলোকে জ্বালিয়ে ছাই করেছি। আপন পরের পার্থক্য বিস্মৃত হয়েছি, অমৃত ও হলাহলের

পার্থক্য ভুলে গেছি। অতীতে নির্মল বাবুরা এইভাবেই মেরেছেন। কিন্তু অতীতে যা ছিল দোষনীয় বর্তমানে তা নয়। অতীতের মানবিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করতে আর সহনশীল মনোভাব গড়তে আমাদের মত সেকেলেদের সময় লাগবে বৈকি! এই দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ কায়েমের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নির্মল বাবুদের পদচারণার মধ্য দিয়েই শুরু হোকনা!"

এ ঘটনাগুলো কতটা সত্যি জানি না। জানার উপায়ও নেই। করে থাকলেও, সে মুহূর্তে তা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মূল বিষয় তা নয়। মূল বিষয় হলো বক্তব্য ও পরিবেশনা। ঢাকা জেলে যে সব রাজাকার ছিল তারা সবাই নির্মল রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। নির্মল রায়কে তারা দেখেছেন হিন্দু আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে আর কয়েদীরা মজলুম মুসলমান প্রজা। এই বাক্যটি উল্লেখ্য—"অতীতে নির্মল বাবুরা এইভাবেই মেরেছেন।" অর্থাৎ সাবধান, হিন্দুরা এ ধরনের কাজ করবেই। তারপরের বাক্য—"জাতীয়তাবাদের আগুনে জীবনের পবিত্র মূল্যবোধ, মানবীয় অনুভূতিগুলিকে জ্বালিয়ে ছাই করেছি।" অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ যত নষ্টের মূল। মানলাম। ১৯৭১ সালে কি রাজাকারদের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবোধ ছিল? যদি থেকে থাকে তবে তাদের কাণ্ডকারখানা কি পবিত্র মূল্যবোধ বা মানবীয় অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ১৯৭১ সালে যদি জাতীয়তাবোধ না থেকে থাকে তবে সা'দ আহমেদ পাকিস্তানী হানাদার ও রাজাকারদের কর্মকাণ্ড কী পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করবেন। কারাগারে প্রথম ফজরের নামাজ পড়ার সময় তার মুনাজাতের বর্ণনা আছে যার সঙ্গে আলবদর আমিনুলের মুনাজাতের আশ্চর্য মিল দেখতে পাবেন [আমিনুল ইসলাম আমি আলবদর বলছি বলে একটি বই লিখেছেন।]—"জুলুমের বন্যায় লক্ষ লক্ষ নারী শিশু অসহায় মানুষ ভেসে চলছে।" খোদার কাছেও মিথ্যা ফরিয়াদ করা যায় জানতাম না। একমাত্র আল-বদর রাজাকারদের পক্ষেই বোধ হয় তা সম্ভব। এখানেই শেষ নয়, তিনি আরো ঘোষণা করেছেন—"স্বাধীনতা পরবর্তী আমলের হাজারো অপরাধমূলক ঘটনায় কোন মুসলিম লীগ, জামায়াত, পিডিপির কর্মী বা সদস্য, রাজাকার, আলবদর, আল শামস এর বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ আনতে পারেনি।"

২৮

তৃতীয় অধ্যায়ে সা'দ আহমদ আওয়ামী লীগের অতীত রাজনীতি ও ভূমিকার ওপর একটি থিসিস পেশ করেছেন। এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য কী হবে তা প্রথম লাইনেই বিধৃত—"বিভিন্ন সভা বা কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব বা পলিসির মধ্যে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে যে কোন কৌশলকেই হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করাই তাদের লক্ষ্য ছিল।" এরপর তিনি

বর্ণনা করেছেন অন্যান্য দলও নেতৃত্ব ও 'চরিত্রবান' নেতার প্রভাবে কীভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর, হ্যা তারপরই বোঝা যায় সা'দ আহমদ কোন দলের কর্মী বা পক্ষপাতী এবং কেন তিনি রাজাকার হয়েছিলেন। তার থিসিসের শেষপর্বে দেখা যায়। ১৯৭০ সালে 'চরিত্রবান' নেতাদের আদর্শবাদী দল ছিল জামায়াত। এবং আওয়ামী লীগের পরই ছিল তার স্থান। তার ইঙ্গিতটি এমন যে, জামায়াত প্রথমই হতো কিন্তু আওয়ামী লীগের 'বর্বরোচিত' ব্যবহারের কারণে তা সম্ভব হয়নি। এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ছিল ন্যক্কার জনক।

সা'দ আহমদ বর্ণিত জামায়াতের উদ্ভব ও বিকাশের বর্ণনাটি এখানে উদ্ধৃত করলাম। জামায়াত কীভাবে নিজেদের মূল্যায়ণ করেছে এ ভাষ্য তা স্পষ্ট করবে—

"এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত অথচ অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং নির্বাচনী ফলাফলে দ্বিতীয়স্থান অধিকারী জামায়াতে ইসলামী প্রায় দুই যুগ উর্ধকালব্যাপী আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বয়সে প্রাচীন হলেও প্রভাব ও নির্বাচনী অভিজ্ঞতায় যে কোন আদর্শবাদী আন্দোলন সম্পর্কে এই অবস্থা স্বাভাবিক। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সার্বজনীন দাওয়াত। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ ছাড়া এই ব্যবস্থা প্রদত্ত নেয়ামত পূর্ণভাবে ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হচ্ছে আদর্শবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আদর্শবাদী আন্দোলনের জন্য আদর্শবাদী ও চরিত্রবান কর্মী ও নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে জামায়াতের সমর্থক সৃষ্টি, কর্মী সংগ্রহ ও ট্রেনিং দান, নেতৃত্বের গুণাবলি সৃষ্টি ইসলামী সমাজ গঠন সম্পর্কীয় জ্ঞান ও তথ্যের প্রচার ও প্রসার দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রচলিত অতীত ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বেসাদৃশ্য নিরূপণের জন্য গবেষণা, সেবা ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি ও এইরূপ আরও বহু বিষয় সম্পর্কে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত কাজগুলি প্রায় পাশাপাশি চলেছে এবং এইরূপ আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গতি ধীর অথচ বলিষ্ঠ হতে বাধ্য। এইরূপ প্রতিষ্ঠান আদর্শের আগুনে ঝলসানো কর্মী নিয়ে লোভ, মোহ জয় করে এগিয়ে চলে এবং কোন জালেমের বর্বর হস্তের আঘাতে সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়লেও এই পরিবেশে ধৈর্য্য না হারিয়ে হিম্মত ও হেকমতের সঙ্গে নতুন শক্তির সঞ্চার করে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো এগিয়ে চলে।

পঞ্চাশ দশকে জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক প্রচার কাজ এই দেশে শুরু হলেও বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। আদর্শবাদী আন্দোলন হিসাবে প্রতিটি জায়গায় এর লক্ষ্য থাকে প্রথমে কিছু জ্ঞানী, কর্মক্ষম, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সৎ চরিত্রের মানুষের সন্ধান করা এবং তাদেরকে একটি দলগত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে

ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক সম্প্রসারণ করা। এইরূপ চরিত্রের কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ গড়া সম্ভব হলেও ব্যাপক প্রচার ও সংগঠনের সম্প্রসারণের কাজ ১৯৫৮ সনের পর সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৬২ সনের পর জামায়াতের সাংগঠনিক কাজ পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জামায়াত আইয়ুব সরকারের রোষানলে পতিত হয়। ১৯৬৩ সন থেকে বিভিন্ন সরকারী হয়রানীমূলক হামলা শুরু হয় এবং ১৯৬৪ সনের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের উভয় অংশের জামায়াতের সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করে বহু নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। প্রায় গোটা বছরটাই নেতৃবৃন্দকে কারাগারে কাটাতে হয় এবং ১৯৬৪ সনের শেষের দিকে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সরকারি বিধনিষেধ বেআইনী সাব্যস্ত হওয়ায় জামায়াত শৃঙ্খলামুক্ত হয়ে পুনরায় কাজ শুরু করে। ১৯৬২ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সনের মার্চ পর্যন্ত জামায়াত এদেশে এককভাবে শুধুমাত্র নিজ প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্যে সাংগঠনিক কাজ করতে পারে নাই। কেননা তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য অন্যান্য গণতন্ত্রকামী দলগুলোর সঙ্গে মিলে সাধারণ দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছিলো। অতীতের শাসনতন্ত্র সংশোধনের আন্দোলন এন,ডি,এফ, মাদারে মিল্লাতের নির্বাচনী অভিযান, কপ— পি-ডি-এম, ডাক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই জামায়াতের ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। ১৯৬৯ সনের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশ্যে জনসভার উপর সরকরী বিধিনিষেধ ছিল। তবে কর্মী বৈঠক বা গৃহাভ্যন্তরে সম্মেলনের উপর কোন বিধিনিষেধ না থাকায় জামায়াত পুরাপুরি সময়টা সমর্থক সৃষ্টি, কর্মী সংগঠন এবং জামায়াতের পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। সুতরাং বলা চলতে পারে এই দেশে জনসাধারণের পর্যায়ে জামায়াতের ইতিহাসে ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন ও প্রচারের কাজ প্রথম শুরু হয় ১৯৭০ সনের জানুয়ারি থেকে। অতীতের শত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক অধ্যাপক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ইত্যাদির মধ্যে জামায়াত যুক্তি ও জ্ঞানের অস্ত্রের সাহায্যে অধিকতর উন্নত চরিত্রের যে দল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো ১৯৭০ সনের জানুয়ারি মাসে প্রত্যেকেরই সম্মিলিত ব্যাপক গণঅভিযান একদিকে যেমন সমর্থক ও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করল তেমনি ইসলাম বিরোধী মহল ও ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতালোভী মহলে বিস্ময় ঈর্ষা ও গোস্বার সৃষ্টি করল। ১৯৭০ সনের ১৮ই জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় আওয়ামী লীগের বর্বরোচিত হামলায় এই সত্যের বাস্ত বতা প্রমাণিত হলো। ট্রাকে ভর্তি করে আনা গুন্ডাবাহিনী, লোহার রড, ইটের টুকরার সদ্ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পল্টনের বিপুল জনসমাবেশ তছনছ করে, প্যান্ডেলে বার শত কর্মী যখম এবং ২ জনকে শহীদ করে আর পরের দিন নিজেদের প্রভাবান্বিত খবরের কাগজের মাধ্যমে মনমত গল্প ছাপিয়ে

আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। এরপর পরই কিছু দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীরা নারায়ণগঞ্জে ন্যাপের অফিস ঘর ভেঙ্গে ফেলে এবং ন্যাপ, পি.ডি.পি. মুসলিম লীগ জাতীয় লীগ ইত্যাদি প্রায় সব দলের জনসভায় মারপিট করে ইট ছুঁড়ে, মাইক কেড়ে নিয়ে বানচাল করতে শুরু করে। ১৮ই জানুয়ারি তারিখে আওয়ামী লীগের কর্মীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রশ্নে যারা সন্দেহ পোষণ করত, পরবর্তী ঘটনা সমূহের সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের মনে আর কোন সংশয় রইলো না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সরকারি ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। গভর্ণর থেকে আরম্ভ করে মহকুমা প্রশাসক পর্যন্ত কেউই আওয়ামী লীগের এই মারমুখো আচরণের প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ করলেন না।"

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা ছিল কেমন?

১. কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা।
২. সমস্ত আইন বিধি ভেঙ্গে নির্বাচনী প্রচারণা।
৩. "জামায়াতের উপরই আওয়ামী লীগের আক্রোশ সবচাইতে বেশি হলো এবং ক্ষমতা দখলের একমাত্র প্রতিবন্ধক মনে করে জামায়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে দিলো।"

ফলে, সবাই নিশ্চিত ছিল যে ফলাফল কি হবে।

"যে পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো তাতে ফলাফল একরূপ নিশ্চিত ছিল। বহু নির্বাচনী কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের এজেন্ট ও কর্মী ছাড়া অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্ট ও কর্মীরা উপস্থিত হতে পারেনি। দু'টি মাত্র পক্ষ জোর গলায় ঘোষণা করল নির্বাচন অত্যন্ত নিরপেক্ষ হয়েছে। এক পক্ষ হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও অপর পক্ষ হচ্ছে ইয়াহিয়া সরকার। আর এখন এই দুই পক্ষের মধ্যে রাজনীতির খেলা সীমিত হলো। নির্বাচনী ফলাফলে অন্যান্য দলের কোন গুরুত্ব ছিলনা। জামায়াতে ইসলামী যদিও ভোটারের সমর্থনের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিল, কিন্তু পার্থক্য ছিল অত্যন্ত বিরাট। অবশ্য সমস্ত মহলই স্বীকার করলেন যে অল্প সময়ের মধ্যে এই দেশের রাজনীতিতে জামায়াত প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং জামায়াতের ক্রমবর্ধনশীল শক্তি সম্পর্কে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিলনা। যাই হোক জনতার রাজনীতি থেকে দেশ এবার পার্লামেন্টের রাজনীতির মুখে এসে থমকে দাঁড়াল। নির্বাচনের ফলাফলে বিপুল ভোটাধিক্যের অধিকারী হয়ে নিজের মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে নিশ্চিত থেকে গণপরিষদের অধিবেশনের দিনটির জন্য ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা না করে ৬ দফার উপর আপোষ নেই এই মর্মে হুমকি ছাড়লেন শেখ সাহেব।"

দেশের এ পরিস্থিতিতে কি সামরিক বাহিনী চুপ থাকতে পারে। সা'দ আহমদের ভাষায় পারে না—"দুনিয়ার কোন দেশের সামরিক বাহিনী এরূপ অবস্থায় চুপ থাকতে পারে না। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে অরাজকতা গোটা

প্রদেশকেই ছেয়ে ফেলে।" ২৬ মার্চের পর পাক বাহিনীকে হটিয়ে দেয় মুক্তিপাগল মানুষরা। অবশ্য সা'দরা বিষয়টি দেখেছেন ভিন্নভাবে। তাদের ভাষায়—"গোটা জেলার সর্বত্র অব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের মধ্যে কোন্দল। ভারত ও কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে বর্ডারে কোন অস্তিত্ব রইলো না। সীমান্তবর্তী বাজারগুলোতে প্রত্যহ হাজার হাজার ভারতীয়দের ভীড়—চাউল, মাছ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি খরিদ করে নিয়ে যাচ্ছে আর বিনিময়ে দিচ্ছে ভারতীয় মুদ্রা। ভারতীয় বিড়ি ও পচা মালামাল এসে আমাদের বাজার বোঝাই হতে লাগল। ভারতীয় সংবাদপত্র পেল নতুন বাজার।"

অর্থাৎ আওয়ামী লীগ দেশটাকে ভারত করে ফেলল। ভারত হলেই 'পচা মালামাল' খেতে হবে, পরতে হবে। এ প্রপাগান্ডা লাইন নতুন নয়। পাক ও জামায়াতরা এই লাইন সবসময় অনুসরণ করেছে। এখনও করছে। এ সমস্ত দেখে সা'দ আহমদ গ্রামে পালালেন। আসলে পালিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের ভয়ে। এটি অবশ্য তিনি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু, আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি।

গ্রামে গিয়ে দেখেন সেখানেও পরিবেশ পর্যুদস্ত। আওয়ামী লীগ নেতারা নেই। সা'দ আহমদের বক্তব্য—"পাক আর্মী অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে অথচ নেতারা জনগণের বাঁচবার ও আত্মরক্ষার কি ব্যবস্থা করে গেল? যুদ্ধের জন্য চাঁদা তুলে যুদ্ধ না করেই যদি পালিয়ে যাবে তবে দেশের মানুষকে এ পথে লেলিয়ে দিলো কেন? কিন্তু পালিয়ে যাবার পূর্বে বিভৎস ও নারকীয় কাণ্ড আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঘটিয়ে গেল এবং দেশের যে সম্পদ লুট করে নিয়ে গেল তা চিন্তা করলে লজ্জায় ঘৃণায় মাথা হেট হয়ে আসে। জেলার সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে উর্দুভাষী পুরুষ, নারী, শিশুদের জড়ো করে হত্যা করা এবং সম্পদ লুট করার কাজগুলো তারা ১২ই এপ্রিল থেকে ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে করেছে। ট্রেজারী, ব্যাংক ইত্যাদি হতে কোটি কোটি টাকা, সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে কয়েক লক্ষ মণ খাদ্য, কয়েক শত সরকারি জীপ, ট্রাক, ওয়াগন ক্যারিয়ার, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও বগি ইত্যাদি লুট করে ভারতে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পালিয়ে যাওয়ার সময় ব্যক্তিগত সম্পদ যা রেখে গেলেন—নিয়ে গেলেন তার চাইতে হাজার হাজার গুণ বেশি। স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে এত বড় ব্যবসার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল এবং তাও জনগণের নামে নিজেদের স্বার্থে। কারও বাধা দেবার উপায় ছিল না। কেননা আওয়ামী লীগের বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ করে কিশোর পর্যন্ত সবার হাতেই অস্ত্র। ই.পি.আর পুলিশ ইত্যাদি সবাই আওয়ামী লীগের সাথে একাকার হয়ে গেছে প্রাণ নিয়ে পালানোর ব্যাপারে। সুতরাং পলায়নমুখী হিংস্র হায়েনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাধা দেবার মতো অবস্থা কারও ছিল না।"

অন্যদিকে, হানাদাররা কুষ্টিয়ায় ফেরার পথে বাধা পেল না বটে, "কিন্তু উর্দূভাষী পুরুষ, নারী ও শিশুদের উপর অমানুষিক পশুসুলভ আচরণ, বর্বর হত্যালীলা তাদের জিঘাংসাকে বাড়িয়ে তুলল। কাপুরুষরা মাছুম শিশু ও নারীদের হত্যা করে নিজেদের বীরত্ব দেখিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা পাক আর্মীর মনে অত্যাচারিত উর্দুভাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলল এবং প্রতিটি উর্দূভাষী কিশোর, যুবক ও প্রৌঢ়ের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিল। যাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই হাতিয়ার দেওয়া হলো তারাত সবাই ভারতে পালিয়ে গেছে। সুতরাং এ অস্ত্রে এখন কি প্রয়োজন? সরকার প্রায় ১৫ মাস ধরে আওয়ামী লীগের গুন্ডামীকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তাদের পশু শক্তিকে বৃদ্ধি করবার সমস্ত প্রকারের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, নিজেরা মরেছে, শান্তিপ্রিয় নাগরিককে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে এখন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়েছে। নিজেদের শক্তি যথেষ্ট নয় মনে করে জনসাধারণের একাংশের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু এমন লোকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো, যারা মা-বাপ, সন্তান হারিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রিয়জনের হারানোর ব্যথা মুছে না যেতেই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হল স্বাভাবিকভাবেই অশুভ। আওয়ামী লীগারদের অত্যাচারের তুলনায় এর পরিমাণ কম হলেও ভবিষ্যতের জন্য উর্দূভাষীদের এই দেশে তাদের জীবন ও মালামালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করল এবং উর্দূভাষীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টিতে সহায়তা করল।"

বিবরণ দু'টি একটানা পড়ে গেলে এ ধারণাই হবে যে আওয়ামী লীগ [এখানে বুঝতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক] সমর্থকরা সবাইকে বিপদে ঠেলে দিয়ে, হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে লুট করে দেশ ত্যাগ করল। সা'দ ও রাজাকাররা বারবার এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, বাঙালিরা উর্দূভাষীদের ওপর প্রচণ্ড জুলুম করেছে। একথা কখনও লেখেননি যে, বাঙালির ওপর জুলুম চালান ও সেনাবাহিনীর সমর্থক হওয়ায় প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে উর্দূভাষীদের ওপর হামলা হয়েছে। এবং উর্দূভাষীরা যে অত্যাচার করেছে তাদের মতে তা "আওয়ামী লীগারদের অত্যাচারের তুলনায় এর পরিমাণ কম।"

২৯

সা'দ আহমদ ফিরে এলেন কুষ্টিয়ায়। সব কিছু বিধ্বস্ত বিশৃঙ্খল। এরপর তিনি যে বর্ণনাটি দিয়েছেন তা কৌশলগতভাবে চমৎকার। চারদিকে বিশৃঙ্খল পরিবেশ আওয়ামী লীগ ও হানাদার বাহিনীর ভয়ে সবাই ভীত। কিন্তু, বেঁচে তো থাকতে হবে। এবং মানুষকে এই বাঁচার জন্য সাহায্য করছে কারা? রাজনৈতিক দলগুলি। সে দলগুলির নাম কী? যারা আওয়ামী ভাবাপন্ন নয়। তারাই দেশে এখন শান্তি

শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিল। এবং কীভাবে? কেন, শান্তিকমিটির মাধ্যমে। অর্থাৎ দেশে শান্তি আনা ছাড়া শান্তিকমিটির কোন কাজ ছিল না। উদ্ধৃতিটি লক্ষ করুন—

"বিবদমান পক্ষ ছিল দুটি—আওয়ামী লীগ ও সামরিক সরকার। উভয় পক্ষের ভুল-ত্রুটিতে যে বর্ণনাহীন সমসার উদ্ভব হলো, তার অন্তত মানবীয় দিকটার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অন্যান্য দলগুলির জন্য রাজনীতির উর্ধ্বে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে দেখা দিল। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত লাশগুলোর সৎকার করা, গৃহহীনদের মাথা গুজবার ঠাঁই করে দেওয়া, সর্বহারাদের এক মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করা, ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, মানুষের ঘরে ফিরে আসবার ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত জরুরী কাজ বলে মনে হলো। এইসব কাজের সঙ্গে মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত ছিল। তাই মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরে নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করাই ছিল একমাত্র পথ। এই বিশেষ প্রয়োজনেই গড়ে উঠল শান্তিকমিটি। অরাজনৈতিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। সামরিক সরকারের স্বার্থ নয় বরং জনসাধারণের স্বার্থেই দ্রুত স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। শান্তিকমিটির উপরোক্ত কাজগুলো একদিকে দুর্দশাগ্রস্থ জনসাধারণের কষ্টকে লাঘব করেছে, স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহায়তা করেছে—অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর রোষানলের তীব্রতাকে কমিয়ে দিয়েছে।"

এরপর রাজাকার বাহিনী সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি এক ফ্যান্টাস্টিক থিউরির জন্ম দিয়েছেন। হালে তৈরি জেনারেল মীর শওকতের মুক্তিযুদ্ধের 'ড্রামতত্ত্বে'র মতোই এই থিউরি। রাজাকারদের উদ্ভব নিয়ে রাজাকারের 'স্রষ্টা' জেনারেল নিয়াজি পর্যন্ত এ ধরনের থিউরি দিতে পারেনি। 'শান্তিকমিটি গড়ে উঠল গ্রামে গ্রামে'—এই শিরোনামের অধীনে লেখা দুটি অনুচ্ছেদই আমি উদ্ধৃত করছি কোন রকম মন্তব্য ছাড়া। পড়া মাত্রই সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না জামায়াত বা রাজাকাররা মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

"গ্রামে পালিয়ে থাকা মানুষ শহরে ফিরে এল। গ্রামের মানুষও দৈনন্দিন কাজে শহরের পথ ধরল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামেও শান্তিকমিটি গড়ে উঠল। যে সমস্ত ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। তারাও প্রাণের দায়ে পালিয়ে গেছে ভারতে। সুতরাং গ্রামে রেশন, রিলিফ, বিলিবন্টন ইত্যাদি কাজে যে শূন্যাবস্থা বিরাজ করছিল, তা সাময়িকভাবে ইউনিয়ন শান্তিকমিটির মাধ্যমে চালু হলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল জনসাধারণের জীবন ও মালামালের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। মার্চের আন্দোলনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে থানাসহ যে সমস্ত অস্ত্রাগার লুট হলো, তার একটি মোটা অংশ দেশের চোর ডাকাতদের হাতে পড়ে গেছে। জেল ভাঙ্গা কয়েদীরা এ সমস্ত অস্ত্র হস্তগত করবার সর্বপ্রকার সুযোগই গ্রহণ করেছে। চোর ডাকাতদের

অনেকেই ভারতে আশ্রয় নিয়ে বিপ্লবী সাজল, আর যারা এদেশে রয়ে গেল তারাও সুযোগ সুবিধামত পুরনো অভ্যাসটাকে কাজে লাগাতে শুরু করল। এদের মোকাবিলা করবার জন্য যথেষ্ট পুলিশ বা অন্য কোন বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী ছিল না। গ্রাম্য বাহিনী হিসাবে যে আনসার বাহিনী প্রায় দুই যুগ উর্ধকাল ধরে কাজ করে আসছিল তারাও ছিন্ন ভিন্ন। অনেকেই ভারতের বুকে আশ্রয় নিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। এই শূন্যতাকে পূরণ করবার জন্যই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আনসার বাহিনীর স্থলে রাজাকার বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, প্রাদেশিক সরকার। জেলার প্রতিটি জায়গায় সংক্ষিপ্ত ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠল এবং অতীতের আনসার এ্যাডজুট্যান্ট ও কর্মকর্তারাই রাজাকার এ্যাডজুট্যান্ট ও কর্মকর্তা হিসাবে গৃহীত হলো। শূন্যস্থানগুলো নতুন অফিসার দিয়ে পূরণ করা হলো। গ্রামে গ্রামে রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠল এবং পুলিশ বাহিনীর অনুপস্থিতিতে এরাই শান্তি শৃঙ্খলার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে নতুন সমস্যা দেখা দিল। কিছু সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের খবর আসতে আরম্ভ করল বিভিন্ন গ্রাম থেকে। কে বা কারা রেলওয়ে ব্রীজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তারা যেন গ্রামের পথে না যায়, এটাই ছিল আমাদের সবারই কাম্য। বেসামরিক শাসনযন্ত্রের সক্রীয়তার পেছনেও এই-ই ছিল উদ্দেশ্য। কেননা যে কোন গ্রামে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে বাধ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই সন্ত্রাসমূলক কাজগুলো সামরিক বাহিনীকে গ্রামের পথ দেখাল। সামরিক আইনানুযায়ী অকুস্থলের একশত গজ বা তদুর্ধ স্থানের জনসাধারণকে এই সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য দায়ী করা হলো এবং কিছু কিছু ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রদত্ত হলো। এতে আইন জারী করা হলো বটে, কিন্তু মানুষের মন জয় করা গেল না। কোন স্থানে রাতের অন্ধকারে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে আশেপাশের লোক দোষী নাও হতে পারে। এতে তাদের কোন জ্ঞান নাও থাকতে পারে। কিন্তু সামরিক ব্যক্তিদের হিসাব নিকাশ বেসামরিক ব্যক্তিদের মাপকাঠির বাইরে, তাই অনেকের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীকে এই কাজ থেকে বিরত রাখা গেল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই জানমালের নিরাপত্তার খাতিরে গ্রামবাসীরা রাত জেগে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো পাহারা দেবার ব্যবস্থা করল। এ সত্ত্বেও কোথাও কোন সন্ত্রাসমূলক ঘটনা পুনরায় ঘটলে আশেপাশের জনসাধারণ ভিটে ছাড়া হয়ে দূরের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের এই অবস্থার জন্য সন্ত্রাসবাদীরাই দায়ী, না সামরিক বাহিনী দায়ী, এ বিচার করবে কে? কোন প্রতিষ্ঠিত সরকার সন্ত্রাসবাদীদের এই কার্যকলাপে নিশ্চুপ থাকতে পারে কি?"

সা'দ আহমদ বেশ কল্পনাপ্রবণ জামায়াতী। তার মতে, শান্তিকমিটি যেভাবে কাজ করছিল তাতে দেশে শান্তি ফিরে আসত। কিন্তু শান্তি এল না ভারতীয় প্রপাগান্ডার কারণে। তারপরও মানুষ ফেরা শুরু করেছিল ইয়াহিয়ার আহ্বানে

কিন্তু ভারতীয় সরকার শরণার্থীদের ফেরায় বাধা দিচ্ছিল। শুধু তাই নয়, শান্তি কমিটি অনেক লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। একসময়ের শান্তিকমিটির নেতা সা'দ আহমদের মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ অনুচ্ছেদটি এখন উদ্ধৃত করছি—

"ইয়াহিয়া সরকারের এ সমস্ত সিদ্ধান্ত তার সামরিক উপদেষ্টাদের সাহায্যে গৃহীত হয়নি বরং এ দেশেরই মানুষ যারা সামরিক শাসনামলে সৃষ্ট বহুবিধ মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্য ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছিল তাদেরই প্রত্যক্ষ চাপ প্রয়োগের ফলে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো। তাছাড়া আরও একটি বিষয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। বিভিন্ন সময় সামরিক বাহিনীর হাতে যারা ধরা পড়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শান্তিকমিটির সদস্যরা তাদেরকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। বন্ধন আত্মীয়তার হলেও দলগত কারণ পেশ করা হয়েছে মুক্তির জন্য। বন্দীকে মুসলিম লীগ, জামায়াত ইত্যাদির সমর্থক বানিয়ে সামরিক বাহিনীর রোষানল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রেই শান্তিকমিটির সদস্যদের এ সমস্ত প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। কারাগারে আবদ্ধ সরকারি কর্মচারিদের স্বপক্ষে শান্তি কমিটি প্রশংসা পত্র দিয়েও তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছে। এরূপ বহু ঘটনার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত যা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দেরই উপকার যুগিয়েছে বেশি। দেশের সবাইকেই মুসলিম লীগ, জামায়াত, পি.পি.পি ইত্যাদি হিসাবে পরিচিত করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর অনেক অফিসার ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছেন, দেশবাসীর সবাই যখন মুসলিম লীগ, জামায়াত, পি.পি.পি তখন আপনারা ভোট পেলেন না কেন? উত্তর আমাদের জানা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রশ্নেই চেপে যেতে হয়েছে। যাই হোক এতদসত্ত্বেও ইয়াহিয়া সরকারের সিদ্ধান্ত আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ হলো না। ভারত থেকে শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার উপর কড়াকড়ি আরোপিত হলো ভারত সরকারের তরফ থেকে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চলাচলের উপরও সন্ধানী সৃষ্টি রইলো সদা জাগ্রত। আর সেই সঙ্গে ভারতের প্রচারাভিযান চলল আরও জোরে। ফিরে আসা শরণার্থীদের নানা মনগড়া হয়রানীমূলক কাহিনী প্রচার করে ভীতি ও আশংকার সৃষ্টি করল, ভারতে রয়ে যাওয়া শরণার্থীদের মনে। দেশের মানুষের দেশে ফিরে আসার পিছনে কোনই প্রতিবন্ধকতা ছিল না—ছিল শুধু মিথ্যা ও অপপ্রচার আর ছিল অমূলক ভয় ও আতঙ্ক—যারও উৎস ছিল মিথ্যা কাহিনী ও কল্পনা।"

রাজাকাররা উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছিল কেন? কারণ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। সা'দ আহমদের লেখার কোথাও এ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না যে, ১৯৭০ সালের অখণ্ড ম্যান্ডেট পাওয়ার পরও যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না তখন আবারও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় কীভাবে। আর সেই ম্যান্ডেট কার্যকর না করার জন্যইতো মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু প্রবাদইতো আছে 'চোর না শোনে

ধর্মের কাহিনী' উপনির্বাচনে রাজাকারদের অংশগ্রহণের ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়ায় তখন কাল্পনিক কাহিনী। যেমনটি সা'দ আহমদ লিখেছেন—

"দেশের সংহতি ও অখণ্ডতাকে বজায় রেখে এবং অচলাবস্থাকে দূর করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবার জন্য ইয়াহিয়ার এই সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে কোন উপায় ছিল না। অসহযোগিতার মাধ্যমে কোন মতেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত হতো না। আবার ভারতের সাহায্যে পাকিস্তান হতে এদেশকে বিছিন্ন করবার পক্ষপাতি আমরা ছিলাম না। কেননা ইতিহাসের শিক্ষানুযায়ী দেখা যায় এরূপ আন্দোলন আযাদীর পথে দেশবাসীকে এগিয়ে দেয় না বরং গোলামীর বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে মানুষের জন্য নিয়ে আসে অন্তহীন সমস্যা। সাড়ে ৪ কোটি পশ্চিম পাকিস্তানীর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 'পঞ্চান্ন কোটি' ভারতবাসীর খপ্পরে পড়ে আমরা তাদের জন্য শোষণের স্থান করে দিতে পারি, কিন্তু নিজেদের স্বাধীন বলে দাবী করতে পারি না। সাড়ে ৪ কোটি পশ্চিমার শোষণে সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা শক্তি দিয়েও বন্ধ করতে পারবে, কিন্তু ৫৫ কোটির শোষণ থেকে বাঁচবার কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হবে না। শুধু সংখ্যার প্রশ্নেই নয় ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়েও ভারতের প্রভাব থেকে কোন দিনই মুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশই যখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শোষণ ও বঞ্চনার অভিযোগে আন্দোলনের পথে এগুচ্ছে, তখন ভবিষ্যতে এদেশের মানুষও বিভিন্ন স্বার্থের প্রশ্নে ভারতের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব দেখাবে। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারতকে ডিঙ্গিয়ে অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কঠিন হবে। ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রশ্নগুলো বাদ দিয়েও শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও আমরা ভারতের অস্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হবার পক্ষপাতি ছিলাম না। কেননা এই 'দুর্দিনের দেনা' কোন দিনই পরিশোধ হবে না। অর্থের পূজারী ভারতীয় হিন্দু জাতি 'আসলের দায়ে' নয় শুধুমাত্র সুদের দায়েই আমাদের স্বাধীন সত্ত্বাকে বন্ধকী মাল হিসাবে নিলামে গ্রাস করে নেবে। তাই আমরা এদেশের স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে ছিলাম না, দাবী দাওয়া আদায়ের বিরোধী ছিলাম না, ভারতীয় অস্ত্র ও কূটনীতির সাহায্যে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হবার বিরোধী ছিলাম। ইয়াহিয়ার ঘোষণা মোতাবেক উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান করা, তখনকার পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম রাজনৈতিক পন্থা হিসাবে আমরা গ্রহণ করেছিলাম। আর এই নীতির উপর জনমত গড়ে তোলাও ছিল আমাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব। ইয়াহিয়া খান তাঁর ঘোষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সামরিক গভর্ণরের স্থলে রাজনীতিবিদ গভর্ণর নিযুক্ত কররেন এবং এর পর পরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'অস্থায়ী মন্ত্রীসভা' এই ঘোষণার আন্তরিকতা প্রমাণে সাহায্য করল।"

সা'দ আহমদের ভাষায় এরপর দেশে "সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেল", অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাক হানাদার ও রাজাকারদের কাছে মুক্তিবাহিনী ছিল "দুস্কৃতকারী" ও তাদের লড়াই ছিল 'সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ'। তারা ভারতের সাহায্যে দেশে প্রবেশ করতে শুরু করল। সা'দের ভাষায়—

"শান্তিকমিটির নেতৃবৃন্দ, পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী নেতৃস্থানীয় নাগরিক, গ্রাম্য রাজাকার ইত্যাদি মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হলো গ্রাম্য রাজাকাররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সাহসকিতা ও মনোবলের দিক দিয়ে রাজাকারদের চাইতে অনেক নিম্ন শ্রেণীর ছিল, কিন্তু হাতিয়ারের দিক দিয়ে ছিল সুসজ্জিত। আধুনিক ও হালকা আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রচুর গুলী ও রসদ নিয়ে মুক্তিবাহিনীরা ভারত থেকে অনুপ্রবেশ করে রাতের অন্ধকারে হামলা করত। আর রাজাকারদের ছিল সেকেলে রাইফেল ও পাঁচ থেকে দশ রাউন্ড গুলী। সামরিক বাহিনী রাজাকার বাহিনী গঠন করল ঠিকই, প্রয়োজনীয় ট্রেনিংও দিল, কিন্তু সময়োপযোগী হাতিয়ার ও প্রয়োজনীয় গুলী রসদ তাদের হাতে তুলে দিল না। মনে হয় বিশ্বাসের অভাব ছিল। এসত্ত্বেও অনেক আক্রমণে বা খণ্ডযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নিহত হয়েছে এবং অনেকে ভারতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। এই সমস্ত ফলাফলে অবশ্য রাজাকারদের উপর সামরিক বাহিনীর বিশ্বাস বেড়েছে এবং রাজাকারদের উন্নত ট্রেনিংদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কিন্তু ততদিনে পরিস্থিতি মোড় নিয়েছে অন্যদিকে। সন্ত্রাসমূলক কাজ চালিয়ে ও মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজাকার পাকিস্তানপন্থী মানুষ বা সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সংখ্যককে হত্যা করে এদেশকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। একথা ভারতীয়রা ভালো করেই উপলব্ধি করলো। একমাত্র পশু শক্তি পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে ধ্বংস করতে পারে এই বিশ্বাসের উপর ভারত মরণ কামড় দিবার জন্য সমরায়োজন শুরু করল।"

উপ-নির্বাচনে রাজাকাররাই দাঁড়িয়েছিল। যারা জিতেছিল তাদের ইসলামাবাদ নিয়ে যাওয়ার কথা হলো তাদের প্রভু ইয়াহিয়াকে কুর্নিশ করে আসার জন্য।

৩০

সা'দ আহমদের কাহিনীর একটি বড় অংশ জুড়ে আছে ১৯৭২-৭৩ এর ঘটনাবলি ও জেল জীবনের বিবরণ যার কোনটিই আমাদের রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। জেলে থাকতেই তার বিচার হয় এবং "দণ্ডবিধির ১২১ ধারায় আমার শাস্তি ছিল ২০ বছর, উপনির্বাচনের অভিযোগে ৫ বছর, জেলা কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার

অভিযোগে ৫ বছর এবং শেষোক্ত দুই ধারায় দশ-বিশ করে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের জেল। যদিও মোট ৩১ বছর তবে শাস্তিগুলো যুগপৎ চলবার হুকুম থাকায় শাস্তির মোট মেয়াদ ছিল ২১ বছর।" অবশ্য পৌনে সাত'শ দিন পরই তিনি ছাড়া পেয়ে যান।

জেলের যে বিবরণ দিয়েছেন সে বিবরণে অসাধারণত্ব কিছু নেই। জেলের বিবরণ যারা দিয়েছেন তাদের সবার বিবরণ প্রায় একই রকম। তবে, রাজাকাররা উল্লেখ করেন ১৯৭২-৭৩-এর সময়টায় জেলে, বিশেষ করে ঢাকা জেল ছিল বিদ্বান ও ইসলামী জলসায় পূর্ণ মানুষে ভর্তি। সা'দও সেই কথা লিখেছেন। জেল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সিতারায় সিতারায়। তার ভাষায়—

"পুরনো হাজতের হল ঘরটিতেই যে শুধু এই নীরব সংগঠন গড়ে উঠেছিল তা নয়, বরং গোটা জেলের বিভিন্ন খাতায়, বিভিন্ন দেওয়ালের মাঝে একই পরিবেশ গড়ে উঠছিল। সরকারের কল্যাণে কত জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষাবিদ, হাফেজ, কারী, মওলানা, মোহাদ্দেসীন, ইসলামী আন্দোলনকারী নেতা-কর্মী ও ছাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো গোটা জেলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। দিনের বেলায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ডুবে থাকে। ছিন্ন ময়লা বস্ত্রের আড়ালে, অযত্ন ও অবহেলার ছাপ সারা শরীরে, জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিম্ন পর্যায়ের কাজের পরিবেশে অনেককেই প্রথমে চেনা যায়নি। কিন্তু এসব নক্ষত্রের উজ্জ্বল আভায়, প্রতিভা দৃপ্ত চাউনী আর সারা মুখে নিষ্পাপ ও নির্দোষীতার পবিত্র ও নির্মল ছাপ থেকে তাদের চিনে নিতে দেরীও হয়নি। সময় সুযোগ মতো বুকে চেপে ধরেছি। আর উভয়ে উভয়কে ধৈর্য্যের সবক দিয়েছি। এরাই নিজ নিজ স্থানে হাজতীদের ভাঙ্গা মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ক্ষণেক বিপর্যয়ের মুখে উন্নত শির নিয়ে দাঁড়াতে বলেছে, আর সালাত ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবার শিক্ষা দিয়েছে। প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। নামাজীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েছে, আল্লাহর রহমতে নতুন দিনের সোনালী প্রভাত দেখব। এই আত্মপ্রত্যয় সবার মনে বলিষ্ঠভাবে রূপ নিয়েছে। রাত্রে এশার নামাজ বাদে যখন আমাদের ৩০/৩৫ জনের কণ্ঠে আল্লাহর ধ্বনি ওঠে তখন যেন শুনতে পাই সারা জেলে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার হাজতীর বলিষ্ঠ আওয়াজ, জেকের, দরুদ। আমাদের কম সংখ্যকের ক্ষীণ আওয়াজ ওদের বলিষ্ঠ আওয়াজের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়—মজলুমের ফরিয়াদ হয়ে আহকামুল হাকেমীনের দরবারের দিকে ছুটে চলে রকেটের চাইতেও তীব্র বেগে।"

অন্যান্য রাজাকারদের তুলনায় সা'দ আহমদের রচনা খানিকটা নমনীয় এবং বৈচিত্র্যহীন। এবং এর প্রথম ১০০ পাতাই আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় যেখানে বিধৃত হয়েছে রাজাকারি মন। সবশেষে তার একটি মুনাজাতের কথা উল্লেখ করব। এ ধরনের মুনাজাতের বয়ান আল-বদর আমিনুল বা আয়েনউদ্দিনের বইয়েও আছে।

"প্রভু হে—জালেমের কারাগারে বন্দী থেকেও এক মাস সিয়াম সাধনা করে তোমার হুকুম পালন করেছি, প্রভুহে মজলুমদের রোজাকে কবুল করে নিয়ে একে তোমার সাহায্য ও সন্তুষ্টি পাওয়ার ওছিলা বানিয়ে নাও। প্রভু হে—বিভিন্ন কারাগারের অন্তরালে আজ অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ গুমরিয়ে কাঁদছে, জালেমের গুলী ও লাঠি এখানেও বহু ভাইয়ের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। এখানে অবহেলায়, বিভিন্ন রোগ ব্যধিতে বহু ভাই প্রাণ দিয়েছে, অনেকেই ধুকছে আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। কারাগারের বাইরেও লক্ষাধিক মানুষের পিছনে হুলিয়া লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সবার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিবার পরিজন শুভাকাঙ্ক্ষীরা সীমাহীন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে আছে। সরকারের ভ্রুকুটি আর্থিক দুর্গতি ও হাজারো ব্যথা বেদনায় তারা মানবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রভু হে—তুমিই একমাত্র হেফাজতকারী, তুমি শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী, তোমার পরিকল্পনা দ্বারা জালেমের সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দাও। প্রভু হে—জালেম ও অত্যাচারীদেরকে নিজেদেরকে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যস্ত রেখে শান্তি ও ইজ্জতের সঙ্গে আমাদের মুক্তির পথকে ত্বরান্বিত করে দাও। প্রভু হে—পৌত্তলিকতার কালো ছায়া তাওহীদের মশালকে নিভিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসছে। আমরা অসহায়, বন্দী, লৌহ কপাটের অন্তরালে আবদ্ধ তাই তোমার রহমত ও সাহায্যের উপরই নির্ভর করছি। তুমি মানুষের অন্তর রাজ্যেরও বাদশাহ—যারা এদেশের দ্বীনি বুনিয়াদ নষ্ট করে পৌত্তলিকদের ছলনায় মোহগ্রস্ত হয়েছিল তাদের অন্তরকে তুমি পরিবর্তন করে দাও—ওদের মনে তোমার দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা পয়দা করে দাও। প্রভুহে—বাতিলের মধ্য থেকে ওমর, হামজা, খালেদ, মুছা, তারিক পয়দা করে দাও। বিভ্রান্ত জাতির মধ্য থেকে তোমার দ্বীনের নিশান বরদার পয়দা করে দাও, আর সামান্যতম একজন কর্মী হিসাবে ঐ নিশানের অধীনে কাজ করবার তৌফিক দাও। নির্যাতনমূলক ও মানবতা বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় তোমার নূরের মশাল জ্বালিয়ে মুক্তির পথকে আলোকিত করে কল্যাণ ও শান্তির পথে চলবার সুযোগ দাও। আর এ জাতির বিভ্রান্তির ঘোর যদি না কাটে তবে আমাদের ব্যথিত প্রাণের আওয়াজ তোমার বান্দা অনাগত কোন মুহাম্মদ বিন কাসিমের কানে পৌঁছে দাও। প্রভু হে—আমাদের দোয়া কবুল কর। প্রভু হে—আমাদের বর্তমান নির্যাতীত অবস্থা দোয়া কবুলের ওছিলা বানিয়ে নাও। আমীন।"

মুনাজাতের মূল বিষয় হলো—আমরা বিভ্রান্ত জাতি। জালেম ও অত্যাচারী। আমাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ত্বরান্বিত করে তাদের মুক্তির পথ সুগম হোক। নির্যাতন মূলক ও মানবতাবিরোধী সমাজ গড়েছি আমরা স্বাধীনতার পর। আর এর বিপরীতে হচ্ছে রাজাকাররা যারা বিভ্রান্ত নয়, জালেম বা অত্যাচারীতো নয়ই। তারা মানবতার পক্ষে ও পরোপকারী। জীবিত অবস্থায় স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরও রাজাকারের কাছ থেকে এ বাণী শুনতে হলো। জানি না খোদার ইনসাফ কাকে বলে?

৩১

মোঃ মিছির উল্লাহ পরিচিত কোনো নাম নয়। আখতারউদ্দিন বা আফসারউদ্দিনের মতো ঢাকা শহরে তিনি বসে রাজনীতি করেননি। পুরো পাকিস্তানও ঘুরে দেখেননি। প্রাক ১৯৪৭-এর অনেক যুবকের মতো পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন, পাকিস্তান লাভ করেছেন এবং নিজ অঞ্চলে থেকে কাজ করেছেন। স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। স্থানীয় এলিট হিসেবে নিজ এলাকায় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু, ১৯৭১ সাল এসেই সব গোলমাল করে দিলো। সে সময় যোগ দিয়েছিলেন শান্তিকমিটিতে। অর্থাৎ এক কথায় পরিণত হয়ে গেলেন রাজাকারে। তার রচনায় তার কর্মকাণ্ডের তেমন ফিরিস্তি নেই বটে কিন্তু পুরো বিবরণটি পড়লে বোঝা যায়, তাকে যদি এখনও বলা হয় ১৯৪৭ নাকি ১৯৭১ তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য, তা হলে তিনি ১৯৪৭-কেই বেছে নেবেন। অর্থাৎ রাজাকারি চিন্তা ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর এলোমেলো অস্বচ্ছ বিবরণ সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলে তা-ই প্রতিভাত হবে।

মোঃ মিছির উল্লাহর স্মৃতিকাহিনীর নাম *স্মৃতির প্রেক্ষাপটে*। মৌলভীবাজার থেকে তাঁর পুত্র লিয়াকত আলী ১০০ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশ করেছেন ১৯৮৭ সালে। দাম : পঁচিশ টাকা।

মিছির উল্লাহ ধারাবাহিকভাবে তাঁর জীবনস্মৃতি রচনা করেনি। যখন যা মনে এসেছে লিখেছেন। সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তান আন্দোলনে কীভাবে সহায়তা করেছেন তার বর্ণনা আছে। জীবনের এই পর্বটি ছিল তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৩ সালে মৌলভীবাজারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৪৬ সালে কলকাতা থেকে পাশ করেন মোক্তারি। পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে সে সময় কয়েকদিন জেল খাটেন। ১৯৪৭ থেকে মৌলভীবাজারে মোক্তারি শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে পাশ করেন অ্যাডভোকেটশিপ পরীক্ষা।

মৌলভীবাজারে তিনি নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আজীবন মুসলিম লীগের রাজনীতি করেছেন। ১৯৮৭ সালে যখন এই বই বের হয় তখন ছিলেন মৌলভীবাজার মুসলিম লীগের সভাপতি।

লেখক-পরিচিতিতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত 'রাজনৈতিক কারণে' জেলে ছিলেন। এই রাজনৈতিক কারণটি হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি হানাদার বাহিনী দ্বারা গঠিত শান্তিকমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং খুব সম্ভব খুব সক্রিয় ছিলেন। 'খুব সম্ভব' শব্দ দু'টি উল্লেখ করলাম এ কারণে যে এ বিষয়ে স্মৃতিকাহিনীতে তেমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে, সক্রিয় না থাকলে হয়ত তিনি গ্রেফতার হতেন না। বই লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "নিজের জাতি, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান অল্প এবং

অনেকের জ্ঞান সঠিক তথ্য নির্ভরশীল নহে।" তাছাড়া, "কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট কথাকে বড় করিয়া দেখিয়েছেন এবং বড় বড় ঘটনাকে একেবারে তলাইয়া দিয়াছেন।"

কাজটি অবশ্য তিনিই করেছেন। ঢাকা চিড়িয়াখানা দেখার অভিজ্ঞতা ও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার বিষয় একই রকম গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থাৎ দুটির জন্য যে পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন তার পরিমাণ প্রায় সমান।

৩২

পলাশীর যুদ্ধ দিয়ে মিছির উল্লাহর স্মৃতিকাহিনী শুরু। "একদিন স্বাধীন বাঙালি জাতির শত্রু স্বার্থলোলুপ একটি চক্র ক্ষমতার মোহে অর্ন্তদ্বর্ন্দ্বে লিপ্ত হইয়া বিদেশীদের সাথে হাত মিলাইয়া কাশিমবাজার কুঠীতে রচনা করিল স্বাধীনতার সমাধি।" এ তথ্য যে ভুল বলাই বাহুল্য। কারণ, সিরাজ বাঙালি ছিলেন না, বাঙালির সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগও ছিল না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই মন্তব্য করেছেন, "নবাবী আমলে এ দেশের মুসলমানদের শৌর্য্যবীর্য্য ছিল; ছিল ব্যবসা বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য, কিন্তু ইংরেজদের আনুকূল্যে একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানীরা মুসলমানদের হাত হইতে সর্বস্ব কাড়িয়া নিয়া তাহাদের করিল ভূমিহীন—সর্বহারা।" এ তথ্যও সঠিক নয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদেও বিধৃত হয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। "শত শত মুসলমান জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে আত্মবলিদান করিল।" এ তথ্যও ঠিক নয়।

তারপর এসেছে কংগ্রেস প্রসঙ্গ। কংগ্রেসে জিন্নাহ্ যখন বিকশিত হচ্ছেন তখন হিন্দুরা তাঁকে নির্জীব করে ফেলতে চাইলো। তাঁর ভাষায়, "কংগ্রেসের সুচতুর দূরদর্শী কর্মী ও নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ্র ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিছনে লেলাইয়া দিল মিস সরোজিনী নাইডুকে। নাইডু ছায়ার মতো ঘুরিতে লাগিলেন জিন্নাহ্র পিছু পিছু। যে কোন সভাতে জিন্নাহ যে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই মিস নাইডু ত্বরিৎ গতিতে সর্বাগ্রে উহার সমর্থন করিতেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল যেভাবে পরমাসুন্দরী অরুণাকে দিয়া ভারত বিখ্যাত মেধা সম্পন্ন আসফ আলীর রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করিয়াছিল সে ভাবেই মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকেও ধ্বংস করিবে কিন্তু বিধাতার কৃপায় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনন্য সাধারণ প্রতিভা এবং নির্ম্মল ও পবিত্র চরিত্রের বলে কুচক্রীরা তাঁহাকে বিপথগামী করিতে ব্যর্থ হইল।"

এই গূঢ় তথ্য প্রথম জানা গেলো মৌলভীবাজারের মিছির উল্লাহর কাছ থেকে।

তা যাহোক কংগ্রেস তো চক্রান্ত চালাচ্ছেই। অনেক মুসলমানও "শো বয়" হিসেবে কংগ্রেসের কাজ করেছে। তারপর এলো ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। দিবসটি ঘোষণা করলেন সোহরাওয়ার্দী আর "এই দিন কলিকাতায় হিন্দুদের প্ররোচনায় এক ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।" সোহরাওয়ার্দী সেই দাঙ্গা থামাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "কিন্তু কই? সে রক্তলোলুপ উগ্রবর্ণবাদী দল কিছুতেই মুসলমানের রক্তপাত বন্ধ করিল না। ক্রমেই এই দাঙ্গা নোয়াখালী, বিহার, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িল।"

তারপর উপমহাদেশ বিভক্ত হলো। এখানে এ সম্পর্কে সাড়ে চার লাইনের যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে হুবহু মিল আছে পূর্বোক্ত রাজাকারদের চিন্তাধারার। লিখেছেন তিনি "এদিকে চাণক্য পণ্ডিতের বংশধর উগ্রবর্ণবাদীরা কূটনৈতিক চালে জওহরলাল নেহরুর অন্তরঙ্গ বন্ধু তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ইংরেজের আনুকূল্য লাভের আশায় ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিল—আর কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ স্বয়ং পাকিস্তানের প্রথম বড়লাট হইলেন।" কিন্তু, এখানেই শেষ নয়। ঘুষের বিনিময়ে অনেক অঞ্চল "ভারতের সঙ্গে যুক্ত" করে দেয়া হলো। "চাণক্য পণ্ডিতের বংশধরেরা লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচের বিনিময়ে নিয়া গেল আমাদের হাইলাকান্দি, গোয়ালপাড়া, করিমগঞ্জের একাংশ, পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে পূর্ব পাঞ্জাব ও কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ।"

এই যুক্তি পাকি নীতিনির্ধারকদের মতো প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। তার বা তাদের মতে, ১৯৪৭ সালের পর ভারত কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি দখল করে নিলো "কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্র গোষ্ঠীর মিত্র প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ টু শব্দটি পর্যন্ত করিল না। চাহিয়া দেখুন গোয়া, দমন, দিউ, পন্ডিচেরী এবং বর্তমান কালের সিকিমের দিকে। কি অদ্ভুত চাণক্য নীতিতেই না তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করা হইল।"

এ ধরনের মন্তব্যের ভিত্তি যতোটা না যুক্তি তার চেয়ে বেশি পূর্বধারণা। এই ধরনের পূর্বধারণার বিপরীতে যুক্তি বা বাস্তবতার কোনো ভিত্তি নেই।

মিছির উল্লাহ এরপর বর্ণনা করেছেন ঢাকা চিড়িয়াখানা ও সংসদ ভ্রমণের কাহিনী। বর্ণনাটি সাধারণ কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু মন্তব্য প্রমাণ করে ১৯৭১-এ পরাজিত হলেও তারা সমর্থক '৭১-পরবর্তী সেসব রাজনীতিবিদের যারা রাজাকারি চিন্তা আবার প্রোথিত করতে চেয়েছেন বা চাচ্ছেন।

প্রথমে মিরপুর চিড়িয়াখানা যার অব্যবস্থা তাকে ব্যথিত করেছে। এর সঙ্গে তুলনা করেছেন লন্ডনের চিড়িয়াখানার। সেখানে হিংস্র জন্তুগুলিও কতো নমনীয়। "তাদের এহেন অবস্থা দৃষ্টে মনে হইল যেন ইংল্যান্ডেশ্বরীর মোহনীয় চেহারার আকর্ষণে তাদের হিংসানল প্রশমিত হইয়া গিয়াছে।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ঢাকায় সংসদ ভবন তাঁকে মুগ্ধ করেছে। প্রথমে তাঁর প্রবল বাসনা হলো মরহুম জিয়ার কবর জেয়ারত করার। "তাহার কবরের পূর্বপ্রান্তে অনেকের লিখা অনেকের কবিতার অংশ বিশেষ পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম যে জনগণের জন্য কিছু করিলে জনগণ তাহা ভুলে না, যথাযথ মর্যাদা দেয়।"

সংসদ ভবনের বৃত্তান্ত সম্পর্কে তিনি জানতে পারলেন, ভবনটি আয়ুব খান তৈরী করিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কোন নেতাই কিছু করেন নাই। "অবশেষে মরহুম জিয়াউর রহমান ভবনটি চালু করিবার নিমিত্ত ১২ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

আপাতদৃষ্টিতে সত্য বর্ণনা। ঠিকই তো আইয়ুব খান-এর সময় এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়, জিয়াউর রহমান এরপর এর কাজ শুরু করেন যার অর্থ দাঁড়ায়—এ দু'জনেরই সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত সত্যিকার সংসদীয় সরকার কয়দিনের ছিল আর সামরিক সরকার কয়দিনের ছিল? অখণ্ড পাকিস্তান আমলে এটার নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি বা সংসদের অধিবেশন এখানে হতোও না। স্বাধীনতার পর অবকাঠামো নির্মাণ কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর সংসদ ভবনের সংস্কার কতোটা প্রয়োজনীয় ছিল তা স্বাভাবিকভাবেই তিনি বুঝতে চাননি। কিন্তু ঐ দুটি বাক্যের মধ্যে বাকি সব ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গেছে।

এরপর তিনি সবুর খান ও তমিজউদ্দিন খানের রুহের মাগফেরাত কামনা করলেন। সবুর খানের "কবরটি বাঁশের বেড়ার আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। দুই পার্শ্বে দুইটা নামফলক আহ্বান করিতেছে জনসাধারণকে "আস, দেখ মুসলীম লীগের তথা নিপীড়িত নির্যাতিত বাংলার মুসলমানদের নির্ভীক সৈনিক বাঙালি জাতির এহেন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে কিভাবে চোখ বুঝিয়া মুখ বন্ধ করিয়া চিরশান্তিতে শুইয়া আছেন।"

অর্থাৎ ১৯৭১-পরবর্তী সময়টি দুর্যোগপূর্ণ যেহেতু পাকিস্তান নেই। এবং সবুর খান হতে পারতেন বাঙালির ত্রাণকর্তা।

৩৩

ঢাকা ভ্রমণের বর্ণনার পর আবার এসেছে আইয়ুব খানের প্রসঙ্গ। পাকিস্তানের শাসকদের মধ্যে আইয়ুব খান রাজাকারদের কাছে বিশেষ প্রিয়।

মিছির উল্লাহ্ও এর ব্যতিক্রম নন। আইয়ুব খান তাঁর প্রিয়। কারণ, "আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বদৌলতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা স্থাপিত হওয়ায় দেশের উন্নয়নমূলক কাজ সম্ভবপর হইয়াছিল। দেশের এহেন উন্নতিতে আমাদের অবন্ধুর দল হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়াই নির্লজ্জভাবে ১৯৬৫ সনে ৬ই সেপ্টেম্বরে অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করিল পাকিস্তান। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চাণক্য পণ্ডিতের বংশধরেরা কুটনৈতিক

কৌশল আঁটিতে লাগিল এবং পাকিস্তানকে খতম করার জন্য দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিল ।"

ইতিহাস রচনার সময় মনের মাধুরী মেশালে কী অবান্তর ঘটনার সৃষ্টি করা যায় তার নিদর্শন মিছির উল্লাহ্‌র পরবর্তী অনুচ্ছেদ ।

"৬ দফার দাবীতে দেশে আরম্ভ হইল ভীষণ আন্দোলন, ঐ আন্দোলনে ইসলামের পরিপন্থী দলগুলির সহিত যোগদান করিল জামায়াতে ইসলাম । এই সময় শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগারে । শেখ মুজিবুর রহমানকে কারামুক্ত করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে না দিলে জামায়াতে ইসলাম বৈঠকে যোগদান না করার গোঁ ধরিলে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আক্ষেপ করিয়া উক্তি করিলেন "কিসের জন্য এত সংগ্রাম, ইসলামের মুখপত্র জামায়াতে ইসলামী যখন সরাসরিভাবে ইসলামের দোষমনদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করিল যখন আমার গদিতে থাকা সমীচীন নহে ... ।"

মুসলিম লীগ (কনভেনশন) তখন ক্ষমতায় । সে কারণে, মুসলিম লীগ ছিল 'ইসলামের রক্ষক' । আবার ১৯৭১ সালে জামায়াত বাংলাদেশের বিরোধিতা করলে মুসলিম লীগের সঙ্গে তারাও হয়ে দাঁড়ায় 'ইসলামের রক্ষক' ।

নির্বাচনের বিষয়ে পাকি নীতিনির্ধারক, জেনারেল ও রাজাকারদের চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন । এক্ষেত্রে আবার বড় রাজাকার ও ছোট রাজাকারে কোনো পার্থক্য নেই । মিছিরউল্লাহ্‌ও তা মনে করেন—"সীমান্তের অপর পার হইতে অগণিত অবন্ধুর দল আসিয়া কর্মতৎপর হইল, অস্বাভাবিকভাবে দারুণ কারচুপির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান জয়লাভ করিলেন । সে সময় হইতে দেশের নির্বাচনে জন্ম নিল কারচুপি ।"

এর পরের বাক্যগুলিতে আবার উল্টোকথা বলছেন মিছির উল্লাহ । ভুট্টো ক্ষমতা ছাড়তে রাজি নয় । "কিন্তু তাহারা মেহেদী পাতার সবুজ রং দেখিয়া ভিতরের রক্তের আল্পনা বুঝিতে পারে নাই । ফলে তিরানব্বই হাজার অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত সেনাদল এই দুর্বল বাঙালি জাতির নিকট পরাজিত হইল । পাকিস্তানি সেন্যরা বন্দি হইল । বুঝিতে পারিল বাঙালি জাতির তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শৌর্য্য বীর্যের তেজ ।"

এই অনুচ্ছেদটি যদি পরের অনুচ্ছেদের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে বুঝতে পারবো কেন হঠাৎ এ কটি লাইনে বিবরণে চলে এলো । এর কারণ, এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য । সুতরাং, এক্ষেত্রে মনের মাধুরী মেশালে বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য হবে না । পরের অনুচ্ছেদে স্বাধীনতা লাভ, শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের কথা আছে । কিন্তু লক্ষণীয় শেখ মুজিবের কারণে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলো তার কোনো উল্লেখ নেই । তার নামের আগে কোনো বিশেষণ নেই । তবে, সপরিবারে তাকে হত্যার কথা আছে । কিন্তু জিয়াউর রহমানের নামের আগে বিশেষণ তো আছেই, তাঁর "অবদান"—এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে । এরই মধ্যে, ভারতই যে

এসবের জন্য দায়ী তা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি। এভাবেই আমরা লক্ষ করি কী সূক্ষ্মভাবে 'টেক্সট' বদলে যায় এবং নিজের চিন্তাধারা পরিস্ফুট হয়। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই অনুচ্ছেদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

"১৯৭১ ইংরেজির ১৩ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি নিরঙ্কুশভাবে জয়লাভ করিল। বাঙালি জাতি যখন পৃথিবীর বুকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে এমন সময় ১৯৭৫ ইংরেজির ১৫ই আগস্ট গভীর রাতে এদেশের কতিপয় সশস্ত্র লোক (সেনাবাহিনী নয়) শেখ মুজিবকে তাহার নিজ বাসভবনে সপরিবারে হত্যা করিল। তারপর আরম্ভ হইল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র [অর্থাৎ ভারতীয় ষড়যন্ত্র]। বিষধর সর্প পুনরায় [অর্থাৎ ভারত] ছোবল হানিল বাঙালি জাতির উপর তাহাদের দোসর খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে [তাঁকে সব সময় ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে জিয়াপন্থীরা]। কিন্তু জনসাধারণ এবং খাঁটি দেশ প্রেমিক সৈন্যের [সেনাবাহিনী সবসময় দেশপ্রেমিক। পাকিরা যেমন বলে, উপরে আল্লাহ, নিচে মিলিটারি] মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইল তাহাদের অভ্যুত্থান। এই সংকট মুহূর্তে ধীশক্তি সম্পন্ন পুরুষ জিয়াউর রহমান বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্তা হইয়া বাঙালি জাতিকে জাতিয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পদব্রজে ছুটাছুটি করিয়া জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিকেও" প্রাণ দিতে হলো।

বঙ্গবন্ধু "মহাপ্রাণ" ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুও "দুর্ভাগ্যজনক" ছিল না। শুধু তাই নয়, জিয়াউর রহমান তুলিত হলেন সিরাজউদদৌলার সঙ্গে। জিয়া "পদব্রজে ছুটাছুটি করিয়া জনগনের দুঃখ দুর্দশা" লাঘব করতেন। আর সিরাজও "বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য স্বাধীন নবাব আরাম আয়েশ ত্যাগ করিয়া জনগণের শান্তির জন্য বর্গীর পিছনে দৌড়ান।"

এ প্রসঙ্গে আবার দুই লাইনে রাজাকার সাঈদীর প্রশংসা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবারও ভারতকে দোষারোপ করে বলা হয়েছে—"বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি নিয়া বর্ণবাদী চাণক্য পণ্ডিতের বংশধর পুনরায় চক্রান্তে লিপ্ত। আজ আমাদের আঙ্গরপোতা, দহগ্রাম, তিনবিঘা, বেরুবাড়ীর অবস্থা কি? কেন আমাদের দ্বীপ তালপট্টির উপর হিন্দুস্থানী পতাকা পত্ পত্ করিতেছে? আজ ফারাক্কা বাঁধ আমাদের মরণফাঁদ।"

৩৪

পৃষ্ঠা ২৫ থেকে ৭১ পর্যন্ত সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। তাঁরা কীভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করলেন সে সম্পর্কেও কিছু তথ্য আছে। এ বিবরণ আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু,

লক্ষণীয় এর মধ্যেও সুযোগ পেলেই ভারতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হয়েছে যা তার আলোচনার জন্য ছিল অপ্রাসঙ্গিক। তবে, উদাহরণস্বরূপ দু'একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

১. "চাণৈক্য পণ্ডিতের বংশধর আমাদের ওসমানীকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আত্মসমর্পণের দলিল সৃষ্টির পিছনে ঘোর রহস্য বিজড়িত রহিয়াছে।"

২. "১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধে যে জাতি এক ঝাণ্ডার তলে সমবেত হইয়া ভারতকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিল, চাণৈক্য নীতিতে সে ভারত আমাদের জাতির ভবিষ্যত যুবক ও বুদ্ধিজীবীকে বিভ্রান্ত করিয়া ১৯৭১ সনে সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল, আমরা নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছি বটে তবে ভারতের করাল ছোবল ও আধিপত্যবাদের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া আমাদের ত্রাহিত্রাহি অবস্থা।"

অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা উচিত ভারতের প্রশংসাসূচক তিনটি বাক্য আছে পুরো বইটিতে।

"দেখুন আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের দিকে কতনা কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া তাহারা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত; বিলাসীতা কিংবা বিদেশী দ্রব্য তাহাদের জন্য হারাম।" কিন্তু পরমুহূর্তেই লিখেছেন "আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার নিমিত্ত বর্ণবাদীরা ভারত বিভাগের পর হইতে আদাজল খাইয়া আমাদের সাথে লাগিয়া আছে। কোন সরকারই সীমান্ত পাচার বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়াও কৃতকার্য্য হইতেছে না।"

সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ দেয়ার সময় হঠাৎ-হঠাৎ মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। আমি প্রথমে দু'টি উদ্ধৃতি দিচ্ছি যাতে বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

১. "সংগ্রামের সময় ভারতীয় দালাল কিছু সংখ্যক বিকৃত মস্তিষ্কধারী যুবক শহীদের জ্যেষ্ঠপুত্রসহ বেকসুর গুলি করিয়া হত্যা করে। ইহা হত্যা নয় সত্যিকারের শাহাদাৎ লাভ।"

২. "ভারত হইতে আগত আমাদের কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল যুবক ভারতের নীল নক্সানুযায়ী এদেশের মেধাবী বীর মুজাহিদদের ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিল।"

৭২ পৃষ্টায় এসে ১৯৭১ সালের মার্চের কথা। "১৯৭১ সনের সংগ্রামের ভয়াল অবস্থা এবং আমাদের মুসলীম লীগারদের ভাগ্যের বিড়ম্বনার কথা মানসপটে উদয় হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে।" সে সময় তিনি মৌলভীবাজার ছেড়ে চলে যান। "তৎপর পাকিস্তানি সৈন্য মৌলভীবাজার শহরের দিকে অভিযান চালাইলে মুক্তিরা

তাহাদের বিপদ ভাবিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। তাছাড়া প্রাণের ভয়ে পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় নিয়া সংগ্রাম চালাইতে থাকে।"

তখন তিনি মৌলভীবাজারে ফিরে আসেন এবং "ঢাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের উদ্দেশ্যে" তিনি মহকুমা শান্তি কমিটির কনভেনার বা আহ্বায়কের পদ গ্রহণ করেন। শান্তিকমিটির প্রত্যেকেই "দেশরক্ষা"র জন্য কমিটিতে যোগ দিয়েছিলা। মিছির উল্লাহ শান্তিকমিটি ও রাজাকারদের সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে যায় তার মন কোন দিকে। সেটি একেবারে খাঁটি রাজাকারের মন। তিনি লিখেছেন—

১. "পাকিস্তানি সৈন্য দেশের শাসনভার পুনরুদ্ধার ক্রমে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করার নিমিত্ত স্থানে স্থানে শান্তিকমিটি (Peace committee) গঠন করতঃ সংগ্রামী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে। সরকারি সম্পত্তি বিশেষ করিয়া পুলগুলি পাহারা দেওয়ার নিমিত্ত রাজাকার বাহিনী গঠন করে। তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া শান্তিকমিটির অধীনে বিভন্ন স্থানে মোতায়েন করা হয়। তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য কর্ম করিতে থাকে। দুস্কৃতিকারীদের আক্রমণে অনেকে আবার কর্তব্যরতাবস্থায় প্রাণ হারাইয়াছে। তাহাদের পরিবারের জন্য অনেক দুঃখ হয়। তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।"

১৯৭১ সালে পাকিদের প্রচারযন্ত্রে সবসময় "দুস্কৃতকারী" শব্দটির উল্লেখ থাকতো যার অর্থ মুক্তিযোদ্ধা। মিছির উল্লাহর দুঃখ হয় রাজাকারদের পরিবারের জন্য। তাদের আত্মার মাগফেরাত তিনি কামানা করেন। কিন্তু, পুরো বইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এরকম কোন দুঃখবোধ লক্ষ করা যায় না। আত্মার মাগফেরাত তো দূরের কথা।

২. "রাজাকার বাহিনীর পাশাপাশি জামাতে ইসলাম তাদের নিজস্ব লোক নিয়া আলবদর এবং আলসামছ বাহিনী গঠন করতঃ তাহাদের ইচ্ছানুসারে কাজ চালাইতে থাকে ফলে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে সীমা লজ্ঘণ করার ফলে রাজাকার বাহিনী দুর্ণামগ্রস্থ হইয়া যায় কিন্তু আসলে তাহারা দুর্ণামের কোন কাজ করে নাই এবং তারা কোন সুযোগও পায় নাই।"

মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

শান্তিকমিটির হয়ে তিনি কী করেছেন তারপর তার ফিরিস্তি দিয়েছেন। যেমন,

১. "আওয়ামী লীগ কর্মী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু লোককে ডান্ডি কার্ড অর্থাৎ আইডেন্টিটি কার্ড দিয়া নির্বিঘ্নে চলাফেরার সুযোগ দিয়াছি।"

২. "অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে গুলি হইতে বাঁচাইয়াছি।"
৩. "নিরাশ্রয় লোকদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি।" ইত্যাদি।

শান্তিকমিটি এতো ভালো ভালো কাজ করলে মানুষের আর রাজাকারদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকতো না।

৪ঠা ডিসেম্বর মিছিরউল্লাহ মৌলভীবাজার ত্যাগ করেন। তারপর জুন পর্যন্ত বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাসায় পালিয়ে থাকেন। কোথায় কোথায় পালিয়ে ছিলেন তার বিবরণ আছে। জুন মাসে যখন মামাশ্বশুরের বাসায় পালিয়ে আছেন তখন তার ভাবান্তর হয়। বাজারের মহাজনরা মামাশ্বশুরের বাসায় আলাপ আলোচনার জন্য আসতো। আর মিছিরউল্লাহ লুকিয়ে তাদের আলোচনা শুনতেন। "তাহারা বলিত জেলের মধ্যে হাজার হাজার কয়েদী তাহাদের জিকিরে আল্লার আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। আমি যতই তাহাদের কথা শুনিতে থাকি ততই আমার মন আকৃষ্ট হইতে থাকে। আমি ভাবিতে থাকি আমার সহকর্মীরা জেলের ভিতর আর আমি আত্মগোপন করিয়া আরাম আয়াসে দিন গুজরান করিতেছি। জেলত চিরস্থায়ী নহে। তাহারাও একদিন বাহির হইবে। আমার সহিত দেখা হইলে কিভাবে আমি তাহাদিগকে মুখ দেখাইব?"

সুতরাং, তার মনে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হলো। জুন, ১৯৭২ সালে তিনি ধরা দিলেন।

সেখানে তাঁর বন্ধু রাজাকারদের সঙ্গে দেখা হলো [মৌলভীবাজারের রাজাকারদের নামের তালিকা পাওয়া যাবে] "মৌলভীবাজার জেলে কয়েক মাস থাকার পর দালালী মোকদ্দমা হইলে জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া আরও কয়েক বৎসর কোর্টে দালালী মোকদ্দমা চালাইয়া বেকসুর খালাস পাই।"

বই শেষ করেছেন এ মন্তব্য করে "বর্তমানে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। আমাদের সম্মুখে কোন দর্শন নাই। একেক দল একেক দর্শন নিয়া মাঠে বিচরণ করিতেছে কিন্তু কোন দলই দেশকে সঠিক পথে চালাইবার সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোন দর্শন জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ফলে দেশে অশান্তি এবং নৈরাজ্য বিদ্যমান।"

৩৫

শান্তিকমিটি একজন নেতা গোলাম আযম সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না এর কারণ, গত দুই দশকে তার অপকীর্তি নিয়ে বেশ কিছু বই বেরিয়েছে। *দৈনিক সংগ্রামের* সংবাদ সংকলন হয়েছে কয়েকটি। এসব বই ও সংবাদপত্রের সংকলিত খবরে গোলাম আযম নয়টি মাস কী করেছেন তার প্রতিদিনের বিবরণ দেয়া আছে। এখানে উল্লেখ্য কয়েক খণ্ডে গোলাম আযম তার

আত্মজীবনী লিখেছেন [*জীবনে যা দেখলাম*]। সেখানে অনেক কিছুর খুঁটিনাটি বিবরণ আছে কিন্তু ১৯৭১ সালে তিনি কী করেছেন তার কোন উল্লেখ নেই।

গোলাম আযম সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামের প্রধান ছিলেন। শান্তিকমিটির নেতা ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনিই তখন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতায় অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস প্রায় প্রতিদিন তিনি মুক্তিযুদ্ধ, আওয়ামী লীগ, ভারত বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন। শান্তি কমিটি, রাজাকার আলবদর, আলশামস গঠনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন এবং গণহত্যায় তিনি প্রনোদনা যুগিয়েছেন। বস্তুত গণহত্যাকারীদের তালিকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনির পরই গোলাম আযমের নাম আসবে।

এখানে গণহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন তিনি কীভাবে শুধু তার কয়েকটি উদাহরণ দেব। সেই ৮ এপ্রিল এক যুক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন—"ভারত পুর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। ভারতীয় বা পাকিস্তান বিরোধী এজেন্ট বা অনুপ্রবেশকারীদের যেখানেই দেখা যাবে, সেখানেই পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিকরা তাদের নির্মূল করবে।"[৮৫]

১৮ জুন লাহোরে তিনি বলেন, "দুস্কৃতকারীরা এখনও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। ত্রাস সৃষ্টি এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি অব্যাহত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। দুস্কৃতকারীরা নকসালপন্থীও বামপন্থী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।" শুধু তাই নয় তিনি যোগ করেন, "জনগণ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা দানে ইচ্ছুক। কিন্তু জীবন নাশের জন্য দুস্কৃতকারীরা হুমকী দেওয়ায় তারা এ ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য দান করতে পারছে না। প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে পারলেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা সম্ভব হত।"[৮৬]

লাহোরে তিনি আরো কিছু বক্তব্য দেন যেসব বক্তব্যে গণহত্যায় প্ররোচনার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

১. "জনগণ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা দানে ইচ্ছুক। কিন্তু জীবন নাশের জন্য দুস্কৃতকারীরা হুমকী দেওয়ায় তারা এ ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য দান করতে পারছে না। প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে পারলেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা সম্ভব হত।"

২. "দুস্কৃতকারীরা এখনো পূর্ব পাকিস্তানে তৎপর রয়েছে এবং তাদের মোকাবিলা করার জন্য জনগণকে অস্ত্র দেওয়া উচিত।"

৩. "দেশকে খণ্ডবিখণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না" কারণ পূর্ব

---

৮৫. *একাত্তরের ঘাতক দালালরা* পৃ. ৫০।
৮৬. *ঐ*, পৃ. ৫১।

> পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগ ১৮৫৭ সালে বাংলায় বিদ্রোহী আন্দোলনের চেয়ে দশগুণ বেশি শক্তিশালী ছিল।"[৮৭]

১৪ আগস্ট রাখঢাক না রেখে তিনি ঘোষণা করেন—" সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে কিন্তু শহীদী মৃত্যু মুসলমানদের নিকট শ্রেষ্ঠ। তিনি পাকিস্তানের দুশমনদের মহল্লায় মহল্লায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান। অধ্যাপক গোলাম আযম আরো বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে আজ হোক কাল হোক বাঙালি মুসলমানরা তাদের অধিকার আদায় করতে পারবেই। কিন্তু আল্লাহ না করুন। যদি পাকিস্তান না থাকে তাহলে বাঙালি মুসলমানদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।' অধ্যাপক আযম বলেন, দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর। কিন্তু দেশের মানুষের মন জয় করার ক্ষমতা সেনাবাহিনীর নেই। শান্তিকমিটির দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে জনাব আযম বলেন যে, শান্তিকমিটি গঠন করে দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা এগিয়ে আসার ফলেই যে ভারত তথাকথিত বাংলাদেশ কায়েম করেছে সে ভারত এখনো তাকে স্বীকৃতি দিতে সাহস পায়নি। পরিশেষে জনাব আযম বলেন, শান্তিকমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারকে দেশের উন্নতি ও সংহতির খাতিরে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।"[৮৮]

তিনি আরো প্রশ্ন রেখেছিলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চের পর যে ব্যবস্থা নিয়েছে সেটি আগে নেয়নি কেনো। এখন অক্টোবরের শেষে বন্যার পানি চলে যাবার পর পরই গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে দুস্কৃতকারীদের দমন করার কাজ শুরু হবে। তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করার পরই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। দুস্কৃতকারী সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হলে নির্বাচন অনুষ্ঠান অসুবিধা বৈকি। কারণ, দুস্কৃতকারীদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না করা পর্যন্ত জনগণ নিরাপদ বোধ করবে না এবং প্রার্থীদেরও নিরাপত্তা সম্ভব নয়।"[৮৯]

তিনি তার কর্মি ও অনুসারীদের বারবার বুঝিয়েছেন দুস্কৃতকারী অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে সেনাবাহিনী তাদের সবসময় সমর্থন করবে। তিনি বলেন, "বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু বেশি ক্ষতিকর। আমাদের ঘরেই এখন অসংখ্য শত্রু তৈরি হয়েছে। এই শত্রু সৃষ্টির কারণ যাই হোক সে দিকে এখন নজর দেওয়ার সুযোগ নেই। এখন ঘরে আগুন লেগেছে, কাজেই আগুন নিভানোই তোমাদের প্রথম দায়িত্ব। এ ব্যাপারে সেনাবাহিনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং রাজাকাররাও তাদের পেছনে এগিয়ে এসেছে।"[৯০]

---

৮৭. *ঐ*।

৮৮. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৪.৮.১৯৭১।

৮৯. *একাত্তরের ঘাতক দালাল* পৃ. ৫৩।

৯০. *ঐ*, পৃ. ৫৩।

বিশেষ করে শান্তিকমিটির উল্লেখ করে তিনি বলেন, "সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানের পর থেকেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শান্তিকমিটিগুলো স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। শান্তিকমিটি এতদিন এ ব্যাপারে যা করতে পেরেছে। মন্ত্রীগণ তার চেয়েও অধিক কাজ করতে পারে বলে আমি আশা করি।"[৯১]

বাংলাদেশে গণহত্যার একজন নকশাকারি রাও ফরমান আলী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, তাজউদ্দিন ছিলেন হিন্দু পরিবারভুক্ত। এবং তাজউদ্দিন আদৌ মুসলমান কিনা এ বিষয়েও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। গোলাম আযম ঠিক তাই বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছিলেন, "বাংলাদেশ বাঙালিদের দ্বারা শাসিত হবে এই মতবাদ শেখ মুজিব বা শ্রী তাজুদ্দিনের। এ জন্যই তথাকথিত বাঙালি বীরেরা পশ্চিম বঙ্গে গিয়ে বাংলাদেশ কায়েম করেছে।"[৯২]

এখানে শান্তিকমিটির হয়ে গোলাম আযম প্রধানত কী বলেছেন তাই উদ্ধৃত করেছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আমিন বা টাবির গ্রন্থটি দেখলেই চলবে। গোলাম আযম, রাজনেতিক কর্তৃত্ব লাভের জন্য শান্তিকমিটি, আলবদর, রাজাকার প্রভৃতি ফ্রন্টে জামায়াত কর্মিদের বেশি যোগ দিতে বলেছেন। এ কারণে এই ফ্রন্টগুলি পরিচালিত হতো জামায়াতী স্ট্রাটেজি অনুসারে যে স্ট্রাটেজি প্রণয়ন করতেন জামায়াত নেতারা এবং যার প্রধান ছিলেন গোলাম আযম। এ কারণেই আমরা মনে করি, গণহত্যা, লুট, ধর্ষণ প্রভৃতিতে পাকিস্তানী বাহিনী ও তার জেনারেলরা যেমন দায়ী, গোলাম আযম ও জামায়াতী ইসলামীও তেমনভাবে দায়ী। মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ী হলে জেনারেলরা বাংলাদেশে তাদের সহযোগীদের ছেড়ে পালিয়েছিলেন। গোলাম আযমও তার সঙ্গী সাথীদের ফেলে পালিয়ে ছিলেন।

৩৬

সবশেষে আব্দুল আলীমের কথা উল্লেখ করতে চাই। বর্তমানে যুদ্ধাপরাধের যে বিচার চলছে তাতে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তিনিও অভিযুক্ত হয়েছেন। গণতদন্ত কমিশন প্রথম পর্যায়ে যে আটজন ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত চালায় তার মধ্যে আব্দুল আলীম ছিলেন একজন।

জয়পুরহাটের শান্তিকমিটির সভাপতি ছিলেন আব্দুল আলীম। ছিলেন স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা। তার অত্যাচারের কাহিনী সারা বাংলাদেশে সুবিদিত। শান্তি

---

৯১. *ঐ*, পৃ. ৫৬।
৯২. *ঐ*, পৃ. ৫২।

কমিটি কী করেছিল তার উদাহরণ মিলবে গণতদন্ত কমিশনের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে যা এখানে উদ্ধৃত করছি—

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'হানাদার বাহিনীর বর্বরতা মধ্যযুগীয় ঘাতকদেরও হার মানিয়েছে' শিরোনামযুক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'জয়পুরহাট ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মুসলিম লীগের আব্দুল আলীমকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর সংখ্যালঘুদের দেশে ফেরার নিশ্চয়ই আর কোন বাধা নেই। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, ওদের ক্ষমা নেই। ওরা দেশে ফিরলেই ওদের সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হবে। শুনে স্তম্ভিত হতে হয়েছে। একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি যদি এরকম ধারণা পোষণ করে তবে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত দালালদের কি রকম মনোভাব ছিল তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুত ইয়াহিয়া খানের লোক দেখানো ক্ষমা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব মুষ্ঠিমেয় সংখ্যালঘু ফিরে এসেছিল তাদের আর পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে হয়নি।' (*দৈনিক বাংলা*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২)।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আব্দুল আলীমের নারকীয় তৎপরতা সম্পর্কে প্রকাশিত অপর একটি তথ্য ' আব্দুল আলীম সেই সময় নিজের হাতে বাঙালিদের লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিলেন। এছাড়া বেয়নেট চার্জ করে বহু বাঙালিকে মারার অভিযোগও তার বিরুদ্ধে রয়েছে।' [তথ্যসূত্র : *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়*, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ৩৮-৩৯]।

উক্ত গ্রন্থে আব্দুল আলীমের একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে, যার নিচে লেখা ছিল, '৭১-এ পাকবাহিনী জয়পুরহাটে বেশকিছু সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাকে গ্রেফতার করে। চোখ বাঁধা অবস্থায় সারা শহর ঘোরানোর পর তাঁদের হত্যা করা হয়। ছবিতে এই অভিযানে নেতৃত্বদানকারী মেজর আফজালের পাশে তদানীন্তন জয়পুরহাট শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল আলীম (× চিহ্নিত) হাস্যোজ্জ্বল দাঁড়িয়ে। সামনে উপবিষ্ট পেছনে হাত বাঁধা হতভাগ্য মুক্তিযোদ্ধারা। জয়পুরহাট মুক্ত হবার পর এখানে আব্দুল আলীমকে খাঁচায় পুরে জনসাধারণের দেখার জন্য রেখে দেয়া হয়েছিল।'

জয়পুরহাটের শহীদ ডা. আবুল কাশেমের পুত্র ডা. কাজী নজরুল ইসলাম গণতদন্ত কমিশনকে জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই দিবাগত রাতে আব্দুল আলীমের নির্দেশে জয়পুরহাট শহরের নিজ বাসা থেকে তার পিতা ডা. আবুল কাশেমকে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকাররা বাড়ি ঘেরাও করে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। সে রাতে তারা জয়পুরহাট স্টেশনে আবুল কাশেমের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে ২৫ জুলাই সকাল ৮টায় তাঁকে শান্তিকমিটির অফিসে আব্দুল আলীমের কাছে নিয়ে যায়। স্থানীয় শওনলাল বাজনা'র গদিঘরটি আব্দুল আলীম

ও তার সহযোগীরা দখল করে শান্তিকমিটির অফিস বানিয়েছিল। আবুল কাশেমকে তারপর আব্দুল আলীমের নির্দেশে জয়পুরহাট থানা ও পরে খঞ্জনপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ক্যাম্পে একদিন একরাত আটক রাখার পর ১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই সন্ধ্যায় আব্দুল আলীমের নির্দেশে আবুল কাশেমকে হত্যা করা হয়। এক মাস পর আখ ক্ষেতে শহীদ ডা. আবুল কাশেমের অর্ধগলিত মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।

আব্দুল আলীম-এর নির্দেশে শহীদ ডা. আবুল কাশেমকে হত্যা করার ঘটনাটি সম্পর্কে বম্বু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোল্লা শামসুল আলম সহ আরো অনেকে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

আব্দুল আলীমের সংঘটিত নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী বম্বু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শামসুল আলম জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালে পাহাড়পুরে পাকিস্তানিদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা ফজলু আহত হয়েছিলেন। পরে তাকে সহ আরো দু'জনকে পাকিস্তানিরা আটক করে জয়পুরহাট শহরের নিয়ে সি, ও কলোনী হলরুম আদালতে আব্দুল আলীমের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। যে ট্রাকে করে ফজলু ও তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে গিয়েছিল আদালতে সে ট্রাকে দাঁড়িয়ে তখন আব্দুল আলীম উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'এই ফজলুর বাবা আমার একজন বন্ধু। আমি তার ছেলেকে এই পথ থেকে ফেরত আনার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ফজলুকে সে ফেরত আনেনি। আজকে তার শাস্তি তাকে গ্রহণ করতে হবে; তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এখনও যারা আপনাদের বাড়ির আশেপাশে জয় বাংলার কথা বলে, তাদেরকে 'লাঠিকোপা' করে মেরে ফেলেন।' ফজলু ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের পরে ট্রাকে করে আব্দুল আলীমের বাড়িতে নিয়ে তাদের উপর নির্মম নির্যাতন করা হয়েছিল। এরপর সকলকে খঞ্জনপুর বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।

ইউপি চেয়ারম্যান শামসুল আলম মুক্তিযুদ্ধের সময় আব্দুল আলীম কর্তৃক নিরীহ গাড়োয়াল সম্প্রদায়কে হত্যা করার ঘটনা তাঁর জবানবন্দীতে জানিয়েছেন। ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা সড়ক থেকে ২৬ জন নিরীহ গাড়োয়ালকে ধরে আব্দুল আলীমের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ির চাতালে ৩/৪ দিন আটকে রাখার পর আব্দুল আলীমের নির্দেশে গাড়োয়ালদের খঞ্জনপুর বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

তিনি আরো জানিয়েছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আব্দুল আলীমের বাড়িটি ছিল জয়পুরহাটের রাজাকার রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্প। আব্দুল আলীমের দায়িত্ব ছিল রাজাকার রিক্রুট করা।

মোল্লা শামসুল হক জানান, বর্তমান জামাত নেতা আব্বাস আলী খান ও আব্দুল আলীমের নির্দেশে ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা

কড়ইকাদিপুর গ্রামের হিন্দু এলাকা ঘেরাও করে ১৬৫ জন নিরীহ, নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে ও তাদের বাড়িঘর লুটপাট করে।

আব্দুল আলীমের বিরুদ্ধে হত্যা, নির্যাতনের সাথে সাথে ঘণধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান শামসুল হক জানান, স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়, পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকাররা নিরীহ মা-বোনদের উপর যে পাশবিক নির্যাতন করেছে সে সম্পর্কে আব্দুল আলীমের বক্তব্য ছিল—'যুদ্ধের সময় সেনা বাহিনী এমন ঘটনা ঘটায়ই। এটা কোন দোষের বিষয় নয়, দেশের স্বার্থে এটা মেনে নিতে হবে।'

জয়পুরহাট কলেজের সহযোগী অধ্যাপক শামসুল আলম জানিয়েছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আব্দুল আলীম ও তার সহযোগীরা জয়পুরহাটের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম থেকে ২৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে আটক করে ২টি ট্রাকে করে জয়পুরহাট শহর প্রদক্ষিণ করিয়েছিল এবং তাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল জয়পুরহাট কলেজ মাঠে। সেখানে আব্দুল আলীম উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'কলেজ ছাত্ররা, তোমরা বুঝতেই পারছো মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা। এরা কিছুক্ষণ পরেই মারা যাবে। তোমরা যদি এরকম মুক্তিযোদ্ধা হও তোমাদের পরিণতিও এমন হবে।' এরপর আব্দুল আলীমের নির্দেশে নির্দোষ মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছিল।

জয়পুরহাট নিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী জানিয়েছেন, ৫ ডিসেম্বর তিনি ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা জয়পুরহাটে ঢুকেছিলেন। সেদিনই শান্তিকমিটির কার্যালয় দখল করে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকা সহ অন্য যে সমস্ত কাগজপত্র পান; তার মধ্যে ১৯৭১ সালে ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী বর্তমানে জামাত নেতা আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই সভার কাগজপত্রে আব্দুল আলীমের স্বাক্ষর ছিল।

এছাড়াও জয়পুরহাটে আব্দুল আলীম কর্তৃক নিরীহ মানুষের উপর সংঘটিত নির্যাতন, অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের আরো বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া গেছে সাক্ষ্য প্রদানকারী স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে।

৩৭

রাজাকারের মন নিয়ে দু'খণ্ডে আমি একটি বই লিখেছি। রাজাকার বলতে সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের বুঝিয়েছি যার মধ্যে শান্তিকমিটির সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত। এখানে তার সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরব।

শান্তিকমিটির যে ক'জন আত্মজীবনী লিখেছেন এবং বিভিন্ন কমিটির যাদের নাম উল্লেখ করেছি তারা সবাই রাজাকার। তবে, এদের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য

আছে। শহরে যারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন তারা ছিলেন উচ্চবর্গের বা এলিট রাজাকার। বাকীরা নিম্নবর্গের। সে কারণে, আয়েনউদ্দিনের রচনার সঙ্গে পার্থক্য দেখা যায় মিছির উল্লাহ্‌র। আসলে, শহরে [বা বিভাগীয় শহরে] শিক্ষিত এলিট বা মফস্বলের কম শিক্ষিত এলিটদের মধ্যে চিন্তাভাবনা বা লেখার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু মূল বিষয় একটিই। তাহলো—ভারত পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করতে চাচ্ছে। এতে শুধু পাকিস্তানই নয়, ইসলামও বিপন্ন। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা 'জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য'।

মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে রাজাকারদের থাকার কথা ছিল না। ইরান বা অন্যান্য দেশে এ ধরনের বিপ্লবের পর বিরোধীদের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তা না নেয়া ছিল ১৯৭১ সালের পর প্রথম ভুল। সে ভুল পুঁজি করে লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক ফায়দা লুটলেন। তিনি সাজাপ্রাপ্ত রাজাকারদের মুক্তি দিলেন, নিষিদ্ধ জামায়াত, মুসলিম লীগকে মুক্ত করলেন এবং এদের সঙ্গে আঁতাত করলেন যার ফলে বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের পর রাজাকারবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯৭১ সালের মতো। একটি হিসাব নিলে দেখা যাবে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের সিংহ ভাগ হয় নিজ দল জামায়াতে ফিরে গেছে নয় বিএনপি, জাতীয় পার্টি যোগ দিয়েছে।

এ রচনায় শান্তিকমিটির যেসব চেয়ারম্যান বা সদস্যের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছি তারা কোন দল করেছিলেন তার একটা হিসাব নেয়া যেতে পারে।

'লালবান্দর' জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে নির্বাচন করে উপজেলা চেয়ারম্যান হন। ১৯৭২ সালে তার নামে ৩২টি মামলা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান সেগুলি প্রত্যাহার করেন। 'লালবান্দর' এখন জলমহালের ব্যবসা করেন। স্থানীয়ভাবে 'ওয়াটার লর্ড' হিসেবে পরিচিত। আকিমুদ্দিন বিশ্বাসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে মুক্তি পেয়ে বিএনপিতে যোগ দেন। আনসার আলী পালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের পর এলাকায় ফেরত আসেন। ১৯৭১ সালে জামায়াতের হয়ে নির্বাচন করে সংসদ সদস্য হন। অ্যাডভোকেট আবুল কাশেমও পালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের পর ফিরে এসে জামায়াতে যোগ দেন। আব্দুল মজিদ তালুকদারের বিরুদ্ধে ১৯৭২ সালেই মামলা হয়। ১৯৭৫ সালে তা প্রত্যাহারের পর যোগ দেন বিএনপিতে। ১৯৭৯, ১৯৮১ ও ১৯৯৬ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আব্দুল্লাহ হেল ওয়াছেক টাঙ্গাইলে মুসলিম লীগ করতে থাকেন এবং মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি হয়ে যান। অথচ এই ব্যক্তিটিকে দালাল আইনে গ্রেফতার করে জেল দেয়া হয়েছিল। ইসহাক আলী, জিয়ার সময় তবলীগের আমীর সেজে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হন। তালেবুর রহমান ও নঈম কাজী ছিলেন বিএনপির স্থানীয় নেতা। রুহুল কুদ্দুস এখন জামায়াত নেতা। আলাউদ্দিন শিকদার যোগ দেন বিএনপিতে। এম. রিয়াছত আলী ৪ দলীয় জোট থেকে নবম জাতীয় সংসদে নির্বাচন করেন। তমিজউদ্দিন ১৯৭৯ সালে জামায়াত থেকে নির্বাচন করেন।

একথায় বলা যেতে পারে মুক্তিযুদ্ধের পর রাজাকাররা পুনর্বাসিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের পর। এদের অনেকে তখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন। অনেকে আবার দল পুনর্গঠন করতে চেয়েছেন। কিন্তু, কোনো পক্ষই ১৯৭১ সালে নিজেদের ভূমিকার জন্য অনুতপ্ত হননি। আওয়ামী লীগের বিরোধী শক্তি বা যারা তাদের পুনর্বাসিত করেছেন তাদের আশ্রয়ে তারা থাকতে চেয়েছেন। যে কারণে, যারা জামায়াত করেননি তারা জিয়াউর রহমানের রাজনীতির সাথে নিজেদের আবিষ্কার করেছেন, একাত্মতা বোধ করেছেন। অর্থাৎ, তাদের আদর্শ যারা পুনর্বাসিত করবে তাদের সমর্থন যুগিয়েছেন। জিয়াউর রহমান এভাবেই তার আসন পাকাপোক্ত করতে চেয়েছেন। তার মধ্যেও রাজাকারির সুপ্ত বীজ প্রোথিত ছিল যা পরে উজ্জিবীত হয়ে ওঠে। এ ধারা এখনও অক্ষুণ্ন।

৩৮

রাজাকারদের কেউ শান্তিকমিটির সদস্য ছিলেন, কেউবা রাজাকার, আল-শামস বা আল-বদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাত্রার ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু সবাই একযোগে পাকি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। এবং প্রায় প্রত্যেকে পরোক্ষ রা প্রত্যক্ষভাবে হত্যা, লুঠ, ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজ চল্লিশ বছর পর হয়ত আমরা অনেকে ভুলে গেছি তারা কী করেছিলেন। কিন্তু, পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলে বোঝা যাবে ন'টি মাস কী অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে তারা সমগ্র বাংলাদেশে।

পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, ইউনিয়ন পর্যন্ত শান্তিকমিটি ও রাজাকার বাহিনী তৈরি করা হয়েছিলো। ফলে, ঢাকা শহর থেকে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত শান্তিকমিটি ও রাজাকার বাহিনী তৈরি করা হয়েছিলো। ঢাকা শহর থেকে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল। তাদের প্রধান কাজ ছিল, নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে মুক্তিপণ আদায়, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ধর্মান্তকরণ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি দখল। এক কথায় যাবতীয় ইসলাম বিরোধী কাজ। আমি সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১. হিন্দু নামাঙ্কিত রাস্তাঘাট বা প্রতিষ্ঠানের নাম বদল। খুলনা শান্তিকমিটির ৫৩ জন সদস্যের এক সভা ডাকা হয়েছিলো ১ আগস্ট। জামায়াতের এ.কে.এম. ইউসুফ ছিলেন সভার প্রধান ব্যক্তি। সভাটি ডাকা হয়েছিলো হিন্দু নাম বদলের জন্য—

   "An emergent meeting of the members of the central Peace Committee will be held on 1st August 71 at 4 p.m.

to disscuss about changing the nominclature of the records having Hindu names."

২. হিন্দুদের ঘরবাড়ি দখল। যদিও তারা ঘোষণা করেছিলো পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি কেউ দখল করবে না বরং রক্ষা করবে। সম্পত্তি দখলের জন্য তারা কিছু কৌশল গ্রহণ করেছিলো।

যশোর শান্তিকমিটির সভাপতি কমরউদ্দিন ২৮ জুন (১৯৭১) যশোরের ডিসির কাছে এক আবেদন করেন। আবেদনপত্রে তিনি জানান মিস্ত্রিখানা রোডে তার বাড়িটি ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তার কোন বাড়িঘর নেই সুতরাং তাঁকে একটি "হিন্দু বাড়ি" বরাদ্দ করা হোক।

যশোরের মুজিবুর রহমান মৃধা "আটাচাকি" স্থাপন করতে চান সেজন্য বাসা দরকার। সেজন্য তিনি আটার কল স্থাপনের অনুমতি ও বাসা চান। কারণ "I am a Muhajir hailing from India having no other source of income and this favour if shown will open to me an avenue for earning my livlihood." (২১.৭.৭১)

বলা বাহুল্য, তাদের কোনো আবেদন নাকচ করা হয়নি।

৩. ধর্মান্তকরণ। রাজাকাররা 'সওয়াব'-এর আশায় জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করেছে। স্বেচ্ছায় কেউ ধর্মান্তরিত হতে চায়নি। ধর্মান্তরিত না হলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে। স্বরোচিষ সরকার সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, বাগেরহাটের মাদুর পাল্টা ও সাহেবের মেঠ গ্রামে "প্রায় সাত-আটশো লোককে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান করা হয় এবং গরু জবাই করে মেজবানি বা প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করার জন্য নওমুসলিমদের বাধ্য করা হয়। শুধু প্রীতিভোজের মধ্যেই তাদের ফতোয়া সীমাবদ্ধ থাকে না। পিস কমিটির ইচ্ছানুযায়ী বিবাহযোগ্য নওমুসলিম কন্যাদের একটি অংশ পিস কমিটির নেতার অনুগত যুবকদের বাড়িতে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়।"

এ তো গোলো মাত্র দু'টি গ্রামের হিসাব। এরকম অজস্র ঘটনা তখন ঘটেছে।

৪. ধর্ষণ। প্রায় বলা হয় পাকি বা রাজাকাররা ধর্ষণ করেনি বা করলেও সামান্য। আমি মাত্র নোয়াখালি জেলার কিছু কাগজপত্র দেখেছি। সেখানে প্রতিটি ইউনিয়নে ধর্ষিতাদের নাম ও সংখ্যা দেয়া হয়েছে। সে বিবরণ দেখলে গা শিউরে উঠবে। একমাত্র কালিদহ ইউনিয়নে রাজাকার কমান্ডার নুর আলীর সহায়তায় ৪০ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। সোনাগাজি ইউনিয়নে ধর্ষিত হন ১৫০ জন। পুরো বাংলাদেশে তা

হলে হিসেব করে দেখুন কতো নারী ধর্ষিত হয়েছেন। তবে, মনে রাখা দরকার অনেক ধর্ষিতা নারীর হিসাব স্বাভাবিক কারণে পাওয়া যায়নি।

৫. অগ্নিসংযোগ। গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ ছিল নিত্তনৈমত্তিক ঘটনা। সারা বাংলাদেশে কী পরিমাণ ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিলো তার সামান্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

নোয়াখালির আমিরাবাদ ইউনিয়নে ১৫০৩টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৩৪৪টি পরিবার। সোনাগাজি ইউনিয়নের যেসব গ্রামের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছিল—তার বিবরণ—

১. সুজাপুর	৫০০
২. ছাদিকান্দি	৩০০
৩. চরগণেশ	২০০
৪. তুনাতুলি	৫০০
৫. চর খোয়াজ	২০০
৬. চর খোন্দকার	৫০০

৬. হত্যা ও দৈহিক নির্যাতন। রাজাকাররা প্রায় প্রতিটি গ্রামে কিছু-না-কিছু হত্যা করে। নির্যাতিতের সঠিক সংখ্যা জানা অবশ্য মুশকিল। তবুও তৃণমূল পর্যায়ে দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি এর মাত্রা বোঝাবার জন্য।

নোয়াখালির আমিরাবাদ ইউনিয়নে নির্যাতন চালানো হয় ২৯ জনের ওপর, হত্যা করা হয় ৩০ জনকে। সোনাগাজি ইউনিয়নে নির্যাতন চালানো হয় ১২৫০ জনের ওপর আর হত্যা করা হয় ২৪০ জনকে।

৭. শান্তিকমিটির মূল কাজ ছিল দেশ 'রক্ষা'। এ কারণে 'দুস্কৃতকারী' (অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ)-দের প্রতিরোধ করার জন্য পাকিবাহিনীকে সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। যশোর শান্তিকমিটির এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো—

"This meeting requested all the members of these committee to report for maintaining peace and order in their localities and to be at guard for the defence of the country from the miscreants and to help our armed forces at all times as and when required." (২৭.৮.৭১)

পাকিদের সাহায্য করতে যেয়ে যেসব লোক মারা গেছে বা মারা যাবে তাদের সাহায্যের জন্য গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন শান্তিকমিটি অর্থসাহায্যের বন্দোবস্ত করেছিলো। সামরিক কর্তৃপক্ষ এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৫.৯.৭১ তারিখে একটি নির্দেশ জারি করেছিল। সে আদেশের খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করছি—

"The Martial Law Authority has been pleased to award of Distress Grant to the families of several categories of individuals as well as to the deserving members of the public killed for their pro-Pakistani leanings."

এরপরও যখন জামায়াতের নেতৃবৃন্দ, বা রাজাকাররা বা বাংলাদেশের পাকিরা দাবি করে ১৯৭১ সালে তারা পাকিদের সহযোগী ছিল না বা ১৯৭১ সালে তেমন কিছু ঘটেনি তখন আপনি কী বলবেন?

৩৯

রাজাকারের মন কেমন বা কীভাবে সে চিন্তা বা কাজ করে তা পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়গুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। সে আলোচনার একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা যেতে পারে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছিলো পাকিস্তানের। বাঙালি মুসলমান তাতে পালন করেছিলো অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু পঞ্চাশের দশকেই আবার বাঙালি মুসলমানের প্রগতিবাদী অংশ এই তত্ত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

এর বিপরীতে ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সমর্থন করা দলগুলো। নতুন ভূখণ্ডে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তারা। হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পদ দখল করে বিত্তবানও হয়েছিল তারা।

ফলে নব্য এলিটদের মধ্যে তাদের একটা ভিত্তি তৈরি হয়। ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকার জন্য একটি 'আদর্শ'-এর প্রয়োজন হয়। কারণ, সাধারণ মানুষকে তো বলা যায় না যে, আমি লুট করার জন্য ক্ষমতায় যেতে চাই। মুসলিম লীগ ও সমমনাদের সেই আদর্শ ছিল। সেটি হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং ক্ষমতা যতই পাকাপোক্ত হতে লাগলো ততই এর সঙ্গে যুক্ত হতে লাগলো নানাবিধ উপাদান।

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত গণতন্ত্রের একটা ভাব ছিল। আমলা শাসন তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ফলে শাসকদের তত্ত্ব জোর করে চাপানো সম্ভব হয়নি। মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাও ততটা জোরদার হয়নি।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পরে পটভূমিকা সম্পূর্ণ বদলে গেল। দ্বিজাতিতত্ত্ব রইলো, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হলো প্রবল ভারতবিরোধী প্রচারণা। এটিও সেই তত্ত্বেরই অন্য রূপ। এর অর্থ পাকিস্তান = মুসলমান, হিন্দু = ভারত। যদিও পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র হলো নেপাল। অন্যদিকে সামরিক শাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একাংশের লোভ—সবকিছু মিলে আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ করে দিলো। সেই কারণেই আমলাতন্ত্র ও ডানপন্থী দলগুলোর মধ্যে কমবেশি আঁতাত থাকে। এদের মাধ্যমেই আদর্শের মডেল

ছড়িয়ে দেয়া হতে লাগলো প্রচারমাধ্যম, পাঠ্যবই এবং সংস্কৃতিতে। সামরিক বাহিনীর আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাকুল কালচারের বিষয়টিও যুক্ত হতে লাগল তত্ত্বে। কাকুলের সামরিক অ্যাকাডেমিতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এদের শিক্ষার মূল নির্যাস ছিল—সামরিক বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। ইসলামী পাকিস্তানের শত্রু ভারত। সামরিক বাহিনী সৎ, রাজনীতিবিদরা অসৎ ইত্যাদি। আসল বিষয় হলো কর্তৃত্ব। 'আদর্শ' এভাবে হয়ে ওঠে ক্ষমতা রক্ষার ঢাল।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের ওপর শাসকদের তত্ত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। কারণ, সেখানে সমাজে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব ছিল বেশি। রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত কর্তৃত্ব করায়ত্ত ছিল সামন্তপ্রভুদের হাতে। হয়ত, অশিক্ষিত সমাজে ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য এ ধরনের কর্তৃত্বপরায়ণ আদর্শের দরকার ছিল, গণতান্ত্রিক আদর্শের নয়।

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে এই আদর্শ শাসকবর্গ বারবার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, পূর্ববঙ্গের সমাজ সামন্তসমাজ নয়। উঠতি মধ্যবিত্ত ছিল গণতন্ত্রমনা। ফলে ঐ আদর্শ বারবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছিলো। ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, মনি সিংহ এবং সবশেষে শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময় এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। এ চ্যালেঞ্জের বিপরীতে শাসকদল ও তাদের সহযোগীদের সামনে দু'টি পথ ছিল। এক. চ্যালেঞ্জ মেনে নেয়া, দুই. চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা। শাসকরা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিলো এবং তাদের সহযোগীরাও তাদের সমর্থন যুগিয়েছিলো। সমর্থন যোগানোর কারণ, তা হলে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে ক্ষমতার প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা এবং সেখানে থাকতে হলেও মতাদর্শগত একটি ঢাল থাকতে হবে মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য। সুতরাং এখানে পাকিস্তানের সেই আদর্শটির রক্ষক হয়ে উঠল তারা। এটির একটি উদাহরণ পাঠ্যপুস্তক।

মার্কিন গবেষক ইয়েভেত রোজার এর ওপর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পাকিস্তান যে আদর্শ (অতীতে ও বর্তমানে) প্রচার করতে চায় সেখানে ঐতিহাসিক সত্য দরকার নেই। আগে ইতিহাসের পাঠ্যবইতে উপমহাদেশে প্রাচীন ইতিহাস, বিশ শতকের ইতিহাসের কিছুটা থাকতো। সামরিক শাসনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেসব বিষয় উধাও হয়ে যেতে লাগলো। পাকিস্তানের ইতিহাসের শুরুই হয় মুহম্মদ বিন কাসেমের সময় থেকে। আমাদের এখানেও পাঠ্যবই সেভাবে বদলে যেতে লাগলো। এ প্রসঙ্গে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের *পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টির* কথা মনে পড়ছে। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকার বইটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিএনআর (ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন) গঠিত হয়। কিন্তু এ অঞ্চলে সচেতন মানুষের কারণে এ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।

এই দ্বন্দ্ব বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এক সময় আওয়ামী লীগই শাসকদের বিরুদ্ধে প্রধান দল হয়ে ওঠে। ছয় দফা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান আদর্শের বিপরীতে বাংলাদেশ আদর্শের রূপটা স্পষ্ট হতে থাকে। এর প্রবক্তা হয়ে ওঠেন মুজিব। তাঁর দলও আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে এ অঞ্চলে। শেখ মুজিব পরিণত হন বঙ্গবন্ধুতে। বাংলাদেশের স্বপ্নটা তখনই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

৪০

১৯৫২ সালের পর পাকিস্তান আদর্শ বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় ১৯৭১-এ। পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা তাদের দেয়া সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন, বাঙালির গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ তাদের পছন্দ হয়নি এবং তারা জানতেন একসময় পাকিস্তান থেকে বিযুক্ত হয়ে যাওয়ার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে উঠবে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকেই মানসিকভাবে তারা এজন্য প্রস্তুত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেলার জন্য ১৯৭১ সাল ছিল একটি অজুহাত। কিন্তু সেটি যে অজুহাত, এটি স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানি শাসকরা বুঝতে দিতে চায়নি। কারণ তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানও কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যেতে পারে।

১৯৭১ সালে, বাংলাদেশবিরোধীদের সামনে দু'টি পথ ছিল। বাংলাদেশ সমর্থন অথবা পাকিস্তান সমর্থন। বাংলাদেশ সমর্থন করলে রাজনৈতিকভাবে তাদের অস্তিত্ব থাকে না। আদর্শগত অবস্থানও নস্যাৎ হয়ে যায়। পাকিস্তান সমর্থনই ছিল স্বার্থগত দিক থেকে কাম্য। এছাড়া, তাদের পক্ষে একথা গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করার ব্যাপার ছিল যে, তাদের আদর্শের ধারাবাহিকতা আছে। তারা সৎ, অন্যরা নয়। এ কথাটিই কিন্তু সাজ্জাদ হোসায়েন তাঁর আত্মজীবনীতে বারবার বলতে চেয়েছেন। বাংলাদেশবিরোধী আদর্শ ফলে ১৯৭১ সালে পরিণত হয় রাজাকারী আদর্শে। এ আদর্শ নিয়ে লড়াই করার আরেকটা বড় কারণ ছিল এই যে, তাদের অটুট বিশ্বাস ছিল পাকিস্তান বাহিনী অজেয়।

পাকিস্তান আদর্শ কীভাবে চুঁইয়ে পড়েছিলো নিচে তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা পাকিস্তান ভাঙার জন্য যেসব কারণ উল্লেখ করেন, সেগুলো হলো—

১. হিন্দু শিক্ষকরা বাঙালিদের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। ফলে হিন্দুত্বের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি।
২. ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে প্ররোচিত করেছে বিদ্রোহে এবং লড়াইটি ছিল ভারত ও পাকিস্তানের।

৩. ১৯৭১-এর যুদ্ধটা ছিল গৃহযুদ্ধ। আওয়ামী লীগ হলো ভারতের অনুগত একটি দল। আওয়ামী লীগার ও সমর্থকরা সে কারণে ভারতের এজেন্ট।
৪. সেনাবাহিনী সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তারাই পাকিস্তান রক্ষা করবে।
৫. মুক্তিযোদ্ধারা দুস্কৃতকারী।
৬. পাকিস্তান ভাঙার জন্য ইয়াহিয়া ভুট্টো মুজিব দায়ী।

রাজাকারদের ভাষ্যগুলো পড়লে দেখা যাবে উপর্যুক্ত কথাগুলোই তারা বলছে এবং এখনও তাদের ও তাদের সমর্থকদের বক্তৃতা-বিবৃতির ধাঁচ সেই একই রকম। তারাও বলছে, হিন্দু ভারত পাকিস্তান ভেঙেছে। এটি ছিল বাংলাদেশের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ (অন্তিম লড়াই)। ১৯৭১ সালে যা ঘটেছিলো তা হলো গৃহযুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা দুস্কৃতকারী (সাজ্জাদ হোসায়েনের ভাষায় 'গ্যাংস্টার')। মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থকরা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ধামাধরা, ভারতের দালাল এবং পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং ভারতই হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র শত্রু।

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যেসব রাজাকার আত্মজীবনী লিখেছেন, তাদের প্রায় সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। শুধু তাই নয়, রাজাকারি আদর্শের প্রতি যেসব শিক্ষিত অনুগত তাদের প্রায় সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। এ কারণে, রাজাকাররা মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা আগে যা ছিল এখনও তা-ই আছে। এবং তা আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু সবসময় একে সমর্থন করা হয় এবং এ সমীকরণটি তুলে ধরা হয় ইসলাম = মাদ্রাসা। যে কারণে, এখনও মাদ্রাসার সমর্থনে অনেক রাজনৈতিক দল সোচ্চার, যদিও তাদের কারও সন্তান মাদ্রাসার ছাত্র নয়। তাদের ধারণা, গ্রামের অশিক্ষিত মানুষকে এভাবে উত্তেজিত রেখে দলে টানা যাবে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সহজ হয়ে যায়। অথচ, এ সমীকরণটি সম্পূর্ণ ভুল।

মাদ্রাসা সনাতনী ধারণার প্রতীক। এই ভুল ধারণার ফলে সমাজের একটি অংশে বিশেষ করে গ্রামীণসমাজে সনাতনী ধারণা চক্রবৃদ্ধি হারে আধিপত্য বিস্তার করছে। আবুল মোমেন মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন—"মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলানারা অধিকাংশ সামাজিকভাবে এমন এক রক্ষণশীলতার পক্ষাবলম্বন করে থাকে যা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও নানারূপ কূপমণ্ডুকতাকে প্রশ্রয় দেয়।" যে কারণে, আমরা দেখি, প্রাক্‌চল্লিশের মাদ্রাসার ছাত্র ও বর্তমান কোন মাদ্রাসার ছাত্রের চিন্তার মধ্যে মৌলিক কোনো তফাত নেই। থাকে না।

১৯৪১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটির সদস্য মৌলভী মোজাম্মেল হক লিখেছিলেন, "সংস্কারের চেষ্টা চালিয়েও গত এক শ' বছরেও কোন ফল পাওয়া

যায়নি। মাদ্রাসায় সবচেয়ে বড় সঙ্কট এই খানেই যে, শিক্ষাঙ্গন হওয়া সত্ত্বেও এখানে তত্ত্ব ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ, পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পরিবেশ অনুপস্থিত। নানা সংস্কার ও পরিমার্জন ও উন্নয়ন সত্ত্বেও সম্ভবত একারণেই মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজ ও জাতীয় জীবনে কোন বড় অবদান রাখতে পারছে না।" [আবুল মোমেনের পুস্তিকায় উদ্ধৃত]

এ মন্তব্যের আরো ৫০ বছর পর একথা বলতে হয় যে, এখনও সংস্কারের চেষ্টা দূরে থাকুক বরং মাদ্রাসা শিক্ষা পরিপুষ্টির একটা প্রচেষ্টা সবসময় নেয়া হয়। কারণ, একে ঘিরে রয়েছে অবৈধ অর্থ রোজগার, ধর্ম ব্যবহার করে প্রতিপত্তি অর্জন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভ ইত্যাদি। এসব কিছু আরো বেশি অর্থলাভের উপায় করে দেয়। ফলে, জাতীয় জীবনে সঙ্কট আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাবে। কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষা কোন দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে না।

মাদ্রাসা শিক্ষিতরাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বিরোধিতা করেছে, করছে এবং করবে। পাকিস্তান আদর্শের প্রতি তারা যতটা আত্মিক টান অনুভব করে, বাংলাদেশ আদর্শের প্রতি ততটা নয়। 'মাদ্রাসা ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ে একটি সমীক্ষায় লিখেছেন আবুল মোমেন, "জাতীয় চেতনাবিহীন এই শিক্ষা আরও ভয়াবহ বিকৃতির প্রকাশ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়। কি ওহাবী কি সুন্নী বাংলাদেশের প্রায় সকল মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র ছিল স্বাধীনতার বিপক্ষে। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম একেবারে হাতে গোনা দু'চারটি। অধিকাংশ মাদ্রাসা পাকিস্তান রক্ষার দুর্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাকে জিহাদ হিসেবে ধরা হয়েছিল। ... এখনও মাদ্রাসার প্রবীণ শিক্ষকদের মধ্যে অনেককে পাওয়া যাবে যারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র নিয়েছিল। পরবর্তীকালে এর বিরোধী যে রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছে ছাত্র-শিক্ষকরা ব্যাপকভাবে তাতে শরিক হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের ধারায় নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন যুগিয়েছে। তাই দেখা যায়, মাদ্রাসার বিকাশ ও বিস্তারের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ও আদর্শের বিরোধী চেতনার যেন শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে।"

মাদ্রাসার নামে টাকা আদায়, বিদেশি অনুদান গ্রহণ, পীর সংস্কৃতির বিকাশ—এ সমস্ত করে একধরনের শোষণ বজায় রেখেছিলো এ চক্র। বাংলাদেশ হওয়ার পরও সে প্রক্রিয়া থামেনি। বরং আরো প্রশ্রয় পেয়েছে। কারণ সেই একই—ধর্মের জুজু। আবুল মোমেনের ঐ রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে, "অধিকাংশ মাদ্রাসা দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় ভরা। এই মাদ্রাসাসমূহ সরকারি অনুদান ছাড়াও প্রতিবছর বার্ষিক সভা, কোরবানীর চামড়া ইত্যাদি থেকে ভালো অংকের চাঁদা পেয়ে থাকে। তা ছাড়া অনেক মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহের কাজে লাগায়।"

এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখি, ১৯৭১ সালে অধিকাংশ মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা

বিপাকে পড়ে। কারণ, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া তারা পরিবর্ধিত হতে পারে না। ১৯৭৫ সালের পর তারা অবলম্বন পেয়ে যায়। এর উদাহরণ, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সালের ভেতর মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভূত বিস্তার। এবং এ কারণেই, মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বাংলাদেশে আদর্শের বিরোধীদের একটি শক্তিশালী কনসটিটিউন্সি তৈরি হয়েছে যা বাংলাদেশের আধুনিকায়নে একটি প্রতিবন্ধক।

৪১

রাজাকারদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, তারা কৌশলী। অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা করতে সে পিছপা হয় না। ১৯৭১ সালের ঘটনার মধ্যে তারা অমানবিকতা খুঁজে পায় না। পাকিস্তানিরা বলে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা হয়নি। রাজাকাররাও তা-ই বলে। কিন্তু আজ প্রায় ৪০ বছর পর বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যে-সববধ্যভূমি পাওয়া গেছে তা কোন সত্য তুলে ধরে?

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৭১ সালে গোলাম আযমের ভূমিকা কী ছিল তা বাঙালি মাত্রেরই জানা। এমনকি কেউ যদি প্রমাণের কথা বলেন তা হলে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার খবরই বড় প্রমাণ। হানাদার বাহিনীর তিনি শুধু অন্যতম সহযোগীই ছিলেন না, হত্যা, খুন, ধর্ষণের জন্য প্ররোচিতও করেছিলেন। কিন্তু রাজাকাররা একথা কখনোই স্বীকার করবে না। শেখ আখতার হোসেন *জননেতা গোলাম আযম* গ্রন্থে লিখছেন—"পাকিস্তানের সামরিক সরকার যখন দেশ ও জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে হত্যা, জুলুম ইত্যাদি শুরু করলো তখন গোলাম আযম চুপ করে থাকেননি। মানুষ মরবে আর তিনি দেখবেন সে রাজনীতি তিনি করেন না। তাঁর জন্মভূমি পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাযত করার ক্ষেত্রে সে দেশের নাগরিক হয়ে যতটুকু দায়িত্ব ছিল সে দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তাই বলে দেশের মানুষকে হত্যা করতে হবে, এমন চিন্তার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। এ সত্য কথা বিরোধীদের জানা থাকলেও তারা এখন তা স্বীকার করবে না। ১৯৭১ সালকে তারা গোলাম আযমের ঘাড়ে চাপাতে চায়। তারা এমনভাবে কথা বলে যেন গোলাম আযম তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই এদেশের নিরীহ নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এসব কথা যুগ কাল ধরে বলেও দেশের মানুষকে বোকা বানানো যায়নি। এবং যে ভারত ১৯৭১ সালে দেশের বন্ধু হিসাবে পরিচিত ছিল ভারতের বন্ধুরাই পরে জনপ্রিয়তা হারালো। গোলাম আযম যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বরং আরও বলা যায় তিনি এখন দেশের ইসলামী জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা।

১৯৭১ সালের ঘটনায় গোলাম আযমকে যে দৃষ্টিতেই দেখা হোক এটা সত্য যে তিনি গণহত্যার সাথে কোন দিক দিয়েই জড়িত ছিলেন না। কোন সরকারই তার প্রমাণ দিতে পারেনি। শুধু রাজনৈতিক ও আদর্শিক কারণেই তাঁকে স্বাধীনতা-বিরোধী বলা হয়।"

দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দিলাম এ কারণে যে, রাজাকারদের সম্পর্কে আগে যে মন্তব্য করেছি তা প্রমাণের জন্য। এখানে প্রচার করা হচ্ছে, গোলাম আযম কোনোকিছুর সঙ্গেই জড়িত ছিলেন না। তার একটি আদর্শ আছে যা অনেকের পছন্দ নয় তাই তাকে স্বাধীনতাবিরোধী বলা হয়। অর্থাৎ তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটের সঙ্গে জড়িত নয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পার্থক্য আদর্শিক। তেমনি, জামায়াতের সঙ্গে অন্যান্য দলের পার্থক্য আদর্শিক। ১৯৭১ একটি অজুহাত মাত্র।

এ কারণেই, ১৯৭১-এ যে তারা ভুল করেনি তা সগর্বে সভাসমিতিতে ঘোষণা করে সেই আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা প্রমাণের জন্য। আর ১৯৭১ সালে কি বাংলাদেশে কোনো হিংস্র বা অমানবিক ঘটনা ঘটেছিলো? এ প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চুপ থাকে বা এড়িয়ে যায়।

মার্কিন গবেষক ইয়েভেৎ রোজার এ বিষয়ে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—"Denial and erasure are the primary tools of historiography as it is officially practiced in Pakistan." পাকিস্তান সরকার ও তার সহযোগীরা তাদের প্রচারমাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে এ কাজটি করে থাকে। তিনি জানিয়েছেন, সেখানে শিক্ষকরা ১৯৭১ সালের "আসল" ঘটনা বলে না চাকরি হারাবার ভয়ে। আমার অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম। পাকিস্তানি জেনারেল, সচিব, বুদ্ধিজীবী অনেককেই ১৯৭১ সালের গণহত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। তাঁরা বলেছেন, তাঁরা কিছু জানেন না। (দু'একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়)। ১৯৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তাঁরা একই কথা বলছেন, রাজাকারদের ভাষ্যও সেই একই রকম।

পাকিস্তানের জনগণ বিশ্বাস করতো পাকি সেনাবাহিনী অজেয়। ১৯৭১ সালেও তারা জয়ী হয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যখন প্রায় এক লক্ষ 'অজেয়' সৈন্য আত্মসমর্পণ করল তখন তাদের মনোজগতে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। যে কারণে, ইমেজ তৈরির জন্য তাদের আফগানিস্তানে যেতে হয়েছিলো। মুক্তিবাহিনীর বিজয়ও সেই একইভাবে এখানকার রাজাকারদের মনোজগত চূর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছিলো। তাদের আত্মজীবনীগুলো তাই তুলে ধরে।

সেই অবস্থা থেকে রাজাকাররা আবার নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। পুরনো ত্রুটি শুধরে আবার নতুন করে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করছে। রাজাকারবাদের উপাদান হিসেবে আবার ভারত-বিরোধিতা, ইসলামী উম্মার নামে পাকিস্তানি ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমুহের পশ্চাৎপদ চিন্তাধারা ও

ইসলামের নামে উন্মাদনা সৃষ্টি—এ সবকিছুই যুক্ত করেছে। তাদের সহযোগী হিসেবে আছে কয়েকটি বড় দল। এবং লক্ষণীয় যে, বৈদেশিক ক্ষেত্রে তারা সেসব দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্ব গড়তে চায় যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিরোধী ছিল।

৪২

স্বাধীন বাংলাদেশে আবার রাজাকারবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে ১৯৭১ সালে তা কেউ ভাবেনি। এমনকি ১৬ ডিসেম্বরের পরও রাজাকারদের তা মনে হয়নি। কিন্তু তা হয়েছে, এবং এর জন্য আমরা সবাই কমবেশি দায়ী। যুদ্ধাপরাধীদের আমরা বিচার করিনি বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের সহযোগী করে তুলেছেন। সহযোগী না হলে এখনও কেন অনেক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজাকারদের বক্তব্যের এতো মিল থাকে?

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশে দু'ধরনের যুদ্ধাপরাধী ছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকার। এ বিষয়ে জে. এন. দীক্ষিতের গ্রন্থ *লিবারেশন অ্যান্ড বিয়োন্ড ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস*-এ নতুন অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দীক্ষিত জানিয়েছেন, পাকিস্তানি বাহিনীর ৪০০ জনকে যুদ্ধাপরাধের জন্য শনাক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু এপ্রিল ১৯৭২-এর মধ্যে শেখ মুজিব এ সংখ্যা হ্রাস করে প্রথমে ১৯৫ এবং তারপর ১১৮তে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই ১১৮ জনের বিচারের জন্যও বাংলাদেশ সরকার মামলা তৈরি করতে পারেনি। তাঁর মতে, "One wonders whether this was deliberate on the basis of some understanding through back channels between Bangladesh and Pakistan at that time or whether it was a zenuine failure of not being able to gather credible evidence for an international court to try these war crimes. There was no doubt among Bangladeshi public that war crimes had heen committed."

এই যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ ছিল। ভারতও তাই চাইছিলো। দীক্ষিতের বই পড়ে তা-ই মনে হয়, যদিও কোথাও তিনি স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেননি। শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে প্রত্যর্পণে সম্মতি দিয়েছিলেন। এবং দীক্ষিত মনে করেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। মুজিব হাকসারকে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা মুশকিল এবং তিনি এ কারণে সময় ও এনার্জি নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিতের মতে, "The substantative motivation for Mujib's decision might have been his long-term strategy of not doing anything which would

prevent recognition of Bangladesh by Pakistan and other Islami countries; ... In the larger interest of peace and normalcy in the sub-continent Mujibur Rahaman's approach was valid." কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে কি প্রার্থিত "stability" এসেছে? না উপমহাদেশে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে?

আবু সাইয়িদ তাঁর *সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম* গ্রন্থে লিখেছেন, দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তৎকালীন "সরকারের উদ্যোগের অভাব ছিল না"। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখিয়েছেন, রাজাকারদের বিচার শুরু হয়েছিলো এবং দালাল আইন জারির পর "১৯৭৩ সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে ৩৭,৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এতসব আইনগত বিধান, ছাড় ও ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ২,৮৪৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। তার মধ্যে মাত্র ৭৫২ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়। বাকি অবশিষ্ট ২০৯৬ ব্যক্তি খালাশ পান। যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন, তবুও ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন হলে মাসে ১৩০টির এবং দিনে ৩/৪টির বেশি বিচার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।"

এরপর তিনি অনেক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যার ফলে রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সামাজিক চাপ, একই পরিবারে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার—দুই-ই ছিল। এবং রক্ত-সম্পর্কের কারণে অনেকে রাজাকারদের বাঁচাতে চেয়েছিলো। রাজাকাররাও তাদের আত্মজীবনীতে এ ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন।

আজ ৪০ বছর পর প্রশ্ন জাগছে, ঐসব যুক্তি সত্ত্বেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় কি সমাজে, রাজনীতিতে শান্তি এসেছে? আসেনি। কারণ, রাজাকারদের চরিত্রবিচার সে সময় করা সম্ভব হয়নি। এ প্রশ্ন সোচ্চারিত হয়ে ওঠেনি যে, যে অনুকম্পা রাজাকারদের প্রতি দেখানো হয়েছে সে অনুকম্পা কি রাজাকাররা প্রদর্শন করেছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি? বা কখনও কি তারা স্বীকার করেছে তারা ভুল করেছিলো? এসব প্রশ্নের উত্তর—না। হত্যার বিচার না হলে সভ্যতার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। তা হলে যত চাপই থাকুক রাজাকারদের বিচার করাই উচিত ছিল। সবচেয়ে বড় কথা রাজাকারদের প্রতি আমরা অনুকম্পা প্রদর্শন করেছি। তাদের পুনর্বাসিত করেছি এবং আজ আবার রাজাকারদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু যে ত্রিশ লাখ শহীদ হলেন তাঁদের প্রতি কি এ পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায্য বিচার করা হয়েছে? তাঁদের প্রতি কি যথাযথ মর্যাদা দেখানো হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তরও হচ্ছে—না। এ প্রসঙ্গে দীক্ষিত-উল্লিখিত

একটি ঘটনার কথা বলা যায়। যুদ্ধাপরাধীরাও ফরমান আলিকে যখন কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে, তখন তিনি বলেছিলেন, ভারতীয়রা ভাবছে বাঙালিদের সাহায্য করেছে দেখে বাঙালিরা তাদের পক্ষে থাকবে? থাকবে না। কারণ, "They had no capacity for gratitude." হয়ত, এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। কিন্তু ১৯৭১-পরবর্তী ঘটনাবলি কি এ মন্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করে না?

আজ ৪০ বছর পর আমরা দেখছি, ঘটনাবলি যেন একটি বৃত্ত পূর্ণ করার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। রাজাকারদের বিচারের দাবি উঠছে এবং তা করছেন প্রধানত তাঁরাই যাঁরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। বরং রাজনৈতিক দলের একটা বড় অংশের বক্তৃতা-বিবৃতিতে রাজাকারবাদের বিভিন্ন উপাদান ফিরে আসছে। শেখ হাসিনার কারণে অবশেষে মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে এবং চিহ্নিত কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে শান্তিকমিটির আবদুল আলীস ও গোলাম আযম আছেন। বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিচার প্রক্রিয়ায় সমন্বয়হীনতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে জামায়াত ও বিএনপি যৌথভাবে এই বিচারের বিরোধিতা করছে। রাজাকাররা আগে তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি বা আত্মজীবনীতে যেসব কারণের কথা উল্লেখ করেছিল বিএনপি-জামায়াত নেতৃবৃন্দ সেইসব কারণগুলিই তুলে ধরছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির একটি সংখ্যা এখন রাজাকারবাদে বিশ্বাসী। এসব দেখে বাঙালি জাতিকে অভিশপ্ত জাতি বলেই মনে হয়। বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশে এমনটি ঘটেনি। আর কোনো দেশে এমনটি ঘটেনি যে, দুর্নীতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে নিজেকে এ কলুষ থেকে মুক্ত রাখার একটি উপায়ই আছে, স্বাধীনতা মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যে চেতনার উন্মেষ হয়েছিলো তা রক্ষা একটি উপায়ই আছে এবং তা হলো প্রতিনিয়ত বলে যাওয়া—যে একবার রাজাকার সে সবসময় রাজাকার।



চতুর্থ পর্ব

শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

আঃ আউয়াল তোতা

আঃ আউয়াল তোতা মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার দেলভোগ গ্রামের অধিবাসী। মুন্সীগঞ্জ জেলার শান্তিকমিটির সহযোগী হিসেবে তিনি ছিলেন পাক বাহিনীর পথ প্রদর্শক ও সহায়তাকারীদের অন্যতম।

[২৫]

আঃ আউয়াল তোতা

আঃ আউয়াল তোতা মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার দেলভোগ গ্রামের অধিবাসী। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার শান্তিকমিটির সহযোগী হিসেবে তিনি ছিলেন পাক বাহিনীর পথ প্রদর্শক ও সহায়তাকারীদের অন্যতম।

[২৫]

আঃ ওহাব এ্যাডভোকেট

খুলনার দিঘলিয়া থানার, মোল্লাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা মৃত মোজাম শেখের পুত্র। ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

আঃ করিম

খুলনা জেলার তালা (সাতক্ষীরা) থানার চরগ্রামের বাসিন্দা মনিরউদ্দিনের পুত্র। ছিলেন ইউনিয়ন শান্তিকমিটির সেক্রেটারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আঃ করিম বিশ্বাস

খুলনার দিঘলিয়া থানার, বারাকপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

আঃ করিম বিশ্বাস

খুলনার দিঘলিয়া থানার, বারাকপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

আঃ খালেক গাজী
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
আঃ খালেক চৌধুরী
খুলনার দৌলতপুর থানার, মহেশ্বরপাশা গ্রামের বাসিন্দা মৃত নবীবক্স চৌধুরীর পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
আঃ গফুর মেম্বর
খুলনার দৌলতপুর থানার, পাবলা গ্রামের বাসিন্দা মৃক নেছার শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
আঃ জব্বার শেখ
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
আঃ মনির সরদার
খুলনার খালিশপুর থানার, মুজগুন্নী গ্রামের বাসিন্দা মৃত ইব্রাহীশ সরদারের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
আঃ মান্নান
খুলনার দৌলতপুর থানার, মধ্যডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
আঃ মান্নান শেখ
খুলনার খালিশপুর থানার, মুজগুন্নী গ্রামের বাসিন্দা মৃত আঃ হামিদ শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
আঃ মান্নান সরদার, 'মৌলভি'
খুলনার দিঘলিয়া থানার, সেনহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তি কমিটির সদস্য।
[২৪]
আঃ মালেক মুন্সী
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

আঃ রব

খুলনার দিঘলিয়া থানার, দেয়ড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত ছায়েশ উদ্দীনের পুত্র (মৃত)। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

আঃ লতিফ

আঃ লতিফ ছিলেন তৎকালীন বরিশাল জেলার ভোলা থানার হাজি মুন্সী আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আঃ সাত্তার

বহরদিয়া গ্রামের দলিল উদ্দিনের পুত্র। তার গ্রামের বাড়ী বোয়ালমারী থানায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭২ সালে তার বিরুদ্ধে বোয়ালমারী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

আঃ সামাদ

বোয়ালমারী থানার সালনা গ্রামের মৃত আঃ কাদেরের পুত্র। তার বিরুদ্ধে বোয়ালমারী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

আঃ হানিফ মোল্লা

বোয়ালমারী থানার ভুরালদিয়া গ্রামের ইসরাত হোসেনের পুত্র । যুদ্ধ পরবর্তীকালে তার বিরুদ্ধ বোয়ালমারী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

আঃ হামিদ গাজী

খুলনার দিঘলিয়া থানার, বারাকপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত আফতাব গাজীর পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

আঃ হালিম

ভাংগা থানার পথরাইল গ্রামের নওয়াব আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের পরে ভাংগা থানায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

আকবার আলী বিশ্বাস

খুলনার দৌলতপুর থানার, মহেশ্বরপাশা গ্রামের বাসিন্দা মৃত জুমারত আলী বিশ্বাসের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।

[২৪]

আকমান মিয়া
খুলনার খালিশপুর থানার, নয়াবাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত এলেম শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

আকরামউদ্দীন ভুঁইয়া
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার পূর্ব আতাদি গ্রামের (ইউনিয়ন উচিতপুরা) বাসিন্দা। তিনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান।

আকাম শেখ
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

আকামুদ্দিন বিশ্বাস
তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানার কমলাপুর গ্রামের বাসিন্দা ইসরাত আলীর পুত্র। তিনি ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জানিপুর ও স্থানীয় শান্তিকমিটির সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

আকামুদ্দিন বিশ্বাস
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৫]

আকিজ মোড়ল
খুলনার খালিশপুর থানার, মুজগুন্নী গ্রামের বাসিন্দা মৃত আদম মোড়লের পুত্র (মৃত)। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।
[২৪]

আজিজ সর্দার
নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার লক্ষণখোলা গ্রামের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

আজিমুদ্দিন চেয়ারম্যান
আজিমুদ্দিন ছিলেন ফরিদপুর জেলার, মধুখালী থানার গাজনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও তৎকালীন বালিয়াকান্দি থানার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন অপকর্মের জন্য আজিমুদ্দিনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে এবং তা কার্যকর করেন।
[২]

আতর আলী মণ্ডল

আতর আলী মণ্ডল ছিলেন তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার জগশর গ্রামের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।

[৬]

আতাউর রহমান

শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান আতাউর রহমান ছিলেন তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার গাংনী থানার সাহেবনগর গ্রামের বাসিন্দামোঃ মেহেরুউল্লাহর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।

[৬]

আতাউল হক

আতাউল হক ছিলেন মহম্মদনগরের শান্তিকমিটির সেক্রেটারি। তিনি তৎকালীন খুলনা জেলার কোতোয়ালী থানার শিববাড়ী গ্রামের বাসিন্দা ওয়াশেক আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালিল অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালে ২৬ ডিসেম্বর গ্রেফতার হন।

[৬]

আতিয়ার রহমান

আতিয়ার রহমান ছিলেন তৎকালীন যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার রামনগর গ্রামের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আত্মরুদ্দি মেম্বার

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার (ইউনিয়ন মুড়াপাড়া) বাসিন্দা।

আদম শফিউল্লাহ্ ওরফে মুহাম্মদ জাকারিয়া

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

[৩৭]

আনসার আলী

আনসার আলী ছিলেন তৎকালীন যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার বাজিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আনসার, অ্যাডভোকেট

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

[৪২]

আনসার উদ্দিন মোল্লা
আনসার উদ্দিন মোল্লা ছিলেন কোতোয়ালী থানার গোয়ালচামট গ্রামের বাসিন্দা। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের তার বিরুদ্ধে বোয়ালমারী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।
[৩]

আনাউল কাইয়ুম
আনাউল কাইয়ুম মুন্সীগঞ্জ জেলার টংঙ্গীবাড়ী থানার বেতকা গ্রামের অধিবাসী। তিনি একাত্তরে যুদ্ধ বিরোধী নানা কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিলেন।
[৫৬]

আনিসুজ্জামান খান
আনিসুজ্জামান খান ছিলেন তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার আলমডাঙ্গা থানার হারদী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন হারদী ইউ. সি এবং লোকাল শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

আফতাব মাতব্বার
তৎকালীন খুলনার খালিশপুর থানার খালিশপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

আফসার উদ্দিন খান
মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার হোসেনদি গ্রামের শান্তিকমিটির একজন সদস্য।
[৫৬]

আবদুর রশিদ
তৎকালীন যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার আর এন রোড এলাকার বাসিন্দা আবদুর রহিমের পুত্র। তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ গ্রেফতার হন।
[৬]

আবদুর রহমান
মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার আটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
[৫৬]

আবদুল আজিজ মাস্টার
রিকাবীবাজার, মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য ছিলেন।
[৫৬]

আবদুল আজিজ মিয়া
মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর থানার পঞ্চসার এলাকার শান্তিকমিটির একজন সদস্য ছিলেন।
[৫৬]

আবদুল ওয়াজেদ মোল্লা
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৪৮]

আবদুল গফুর চৌধুরী
মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার শান্তিকমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।
[৫৬]

আবদুল গফুর সর্দার
আবদুল গফুর সর্দার ছিলেন ফরিদপুর জেলার, নগরকান্দা থানার তালমা বাজারে শান্তিকমিটি অফিসের সদস্য। তার বয়স ছিল । তার পিতা-রাসেদ সর্দার, শাকদালদিয়ার বাসিন্দা। ২৪ জুন সন্ধ্যায় শান্তিকমিটির সদস্য ও দালাররা গোপনে পরামর্শের জন্য গুদাম ঘরে একত্রিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা গুদাম ঘর ঘিরে ফেলে এবং ব্রাশফায়ারে মৃত্যু হয়।
[২]

আবদুল জলিল খান
মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য ।
[৫৬]

আবদুল জলিল
যশোর জেলার বাঘারপাড়া থানার দৌলতপুর, নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা নাসিম বিশ্বসের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

আবদুল নইম
মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান থানার শান্তিকমিটির আহ্বায়ক।
[৫৬]

আবদুল বারেক
মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর থানার নিকটবর্তী গ্রাম চর কেওয়ার বাসিন্দা।
[৫৬]

আবদুল মজিদ
মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান থানার রাজানগরের বাসিন্দা।
[৫৬]

আবদুল মতিন
মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর থানার থানা শান্তিকমিটির একজন সদস্য। জেলার মোল্লাকান্দির অধিবাসী।
[৫৬]

আবদুল মান্নান মোল্লা
মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার শান্তিকমিটির সদস্য।
[৫৬]

আবদুল মান্নান
যশোর জেলার কালিগঞ্জ থানার শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দা লিয়াকত হোসেনের পুত্র। তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

আবদুল মালেক
বরিশাল জেলার ভোলা থানার বাপতা গ্রামের বাসিন্দা মৃত আব্দুল লতিফ মিয়ার পুত্র। তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

আবদুল হক
মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য। জেলার সিরাজাবাদ গ্রামের বাসিন্দা।
[৫৬]

আবদুস সাত্তার, ডা.
মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য। জেলার বালুয়াকান্দির গ্রামের বাসিন্দা।
[৫৬]

আবদুস সাত্তার ভূঞা
মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান থানার শান্তিকমিটির সদস্য। জইনসার গ্রামের অধিবাসী।
[৫৬]

আবদুস সামাদ বেপারী
মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য। আবদুল্লাহপুর এলাকার বাসিন্দা।
[৫৬]

আবদুস সামাদ লস্কর
মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য। কুকুটিয়া গ্রামের অধিবাসী।
[৫৬]

আবদুস সোবহান
মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য। জেলার বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের বাসিন্দা।
[৫৬]

আবর আলী হানাদার

মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার শান্তিকমিটির সদস্য। জেলার দিঘীরপাড় গ্রামের বাসিন্দা। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি মারা যান।

[৫৬]

আবু খন্দকার

ভাংগা থানার পাথরাইল গ্রামের কমর আলী খন্দকারের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের পরে ভাংগা থানায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

আবু বকর

খুলনার দিঘলিয়া থানার, ব্রহ্মগাতি গ্রামের বাসিন্দা তার পিতার নাম জানা যায়নি। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

আবুল কাশেম, অ্যাডভোকেট

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

[৪১]

আবুল কাশেম গাজী, ডা.

মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য ছিলেন। জেলার জসইলদিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

[৫৬]

আবুল সরদার

যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার রামনগর গ্রামের বাসিন্দা আফতাবউদ্দিনের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী ও শান্তিকমিটির সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আবুল হেসেন ডা.

যশোর জেলার নড়াইল থানার আলাদাতপুর গ্রামের বাসিন্দা এ হাকিম মোল্লার পুত্র। তিনি ছিলেন হোমিও প্যাথি ডাক্তার। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।

[৬]

আবুল হোসেন

খুলনার দৌলতপুর থানার, মহেশ্বরপাশা গ্রামের বাসিন্দা মৃত আহমদ হোসেনের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

আবুল হোসেন
মুন্সীগঞ্জ জেলার মুন্সীগঞ্জ সদর থানার নয়াগাও-এর আবুল হোসেন শান্তিকমিটির একজন সদস্য।
[৫৬]

আব্দুর রব
আব্দুর রব ছিলেন নোয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

আব্দুর রব, এডভোকেট
আব্দুর রব সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের (১৯-০৬-১৯৭৩) একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করা হল—"পাক আমলে তথাকথিত জেলা শান্তিকমিটির সভাপতি আইয়ুব সরকারের অধীনে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এডভোকেট আবদুর রবকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইয়াছে। অনাদায়ে আরো ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ১৯৭১ সালে তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে পাক হানাদার বাহিনীর দালালী করার দায়ে তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়।"
[৫]

আব্দুর রশীদ
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার গোদনাইল গ্রামের বাসিন্দা তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ।

আব্দুর রহমান ভুইয়া
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার লক্ষীবরদি গ্রামের (ইউনিয়ন সদাসদি) বাসিন্দা। তার বাবার নাম আকবর ভুইয়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

আব্দুর রহিম, ড.
ডা. আব্দুর রহিমের বাবার নাম এতিম প্রধান। তিনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার গন্ধবপুর গ্রামের (ইউনিয়ন তারাব) একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও মুসলিম লীগের কর্মী।

আব্দুর রহিম, ড.
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার গন্ধবপুর গ্রামের (ইউনিয়ন তারাব) বাসিন্দা। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের কর্মী । তার বাবার নাম এতিম প্রধান। ডা. আব্দুর রহিম ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

আব্দুর রাজ্জাক
কোতোয়ালী থানার কমলাপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রউফ পুত্র। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।
[৩]

আব্দুর রাজ্জাক

যশোর জেলার মাগুরা থানার হাজরাপুর গ্রামে বাসিন্দা মৃত আব্দুল লতিফের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দলালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বরে গ্রেফকার হন।

[৬]

আব্দুল আজিজ হাওলাদার

পটুয়াখালী জেলার বেতাগী থানার কাওনিয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল গফফার হাওলাদারের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। তিনি ছিলেন ইউনিয়ন শান্তিকমিটির সেক্রেটারি । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আব্দুল আলী, মওলানা

আব্দুল আলী মওলানার পিতার নাম আব্দুল হাকিম। গ্রামের বাড়ী কোতোয়ালী থানার খাবাশপুর গ্রামে। তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা করা হয়।

[৩]

আব্দুল আলীম

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

আব্দুল কাদের মোক্তার

তৎকালীন ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালী থানার ঝিলতুলি গ্রামের মৃত এস এম ওফাজ উদ্দিনের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে কোতোয়ালী থানায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

আব্দুল কাশেম

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার গোয়ালদি গ্রামের (ইউনিয়ন আমিনপুর) বাসিন্দা আবুল কাশেম। মুক্তিযুদ্ধের সময় শন্তি কমিটির চেয়ারম্যান।

আব্দুল খালেক মুকতার

পটুয়াখালী জেলার বাখরগঞ্জ থানার জালীশাহ্ গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ আমজাদ আলীর পুত্র। তিনি ছিলেন পটুয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির সদস্য ও জেলা মুসলীম লীগের সেক্রেটারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আব্দুল গাফফার চৌধুরী

তৎকালীন ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালী থানার আলীপুর গ্রামের আব্দুল চৌধুরীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে কোতোয়ালী থানায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

আব্দুল জব্বার

যশোর জেলার মাগুরা থানার বগী নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা আয়েনুল্লা শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালেল ১৮ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতর হন।

[৬]

আব্দুল জলিল

নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ার আব্দুল জলিল ছিলেন একজন চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তিকমিটির সদস্য ।

আব্দুল জলিল

যশোর জেলার মণিরামপুর থানার সুবলকাটী গ্রামের বাসিন্দা মৃত ইসেম গাজীর পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১ মার্চ গ্রেফতার হন।

[৬]

আব্দুল বারী চৌধুরী

খুলনার দৌলতপুর থানার, মহেশ্বরপাশা গ্রামের বাসিন্দা মৃত আহছানউল্লাহ চৌধুরীর পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

আব্দুল মজিদ

আব্দুল মজিদ ছিলেন তৎকালীন বরিশাল জেলার ভাণ্ডারিয়া থানার ভাণ্ডারিয়া গ্রামের বাসিন্দা রাজা আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আব্দুল মজিদ তালুকদার

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

[৩৫]

আব্দুল মন্নাফ ভুইয়া

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার (জামপুর ইউনিয়ন) বাসিন্দা আব্দুল মন্নাফ ভুইয়া। তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

আব্দুল মান্নান ডা.

বরিশাল জেলার ভোলা থানার কাঠালী গ্রামের বাসিন্দা মোঃ ইসমাইল হাওলাদারের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আব্দুল মান্নান বেপারী

পৈতৃক নিবাস রাজৈর থানার দমেরচর গ্রামে। পিতার নাম আঃ হামিদ বেপারী। যুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭২ সালে তার বিরুদ্ধে রাজৈর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি এন্ট্রি করা হয়।

[৩]

আব্দুল মালেক

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার খাসেরকান্দি গ্রামের (ইউনিয়ন মামুদপুর) বাসিন্দা।

আব্দুল রব মিলকী

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার (ইউনিয়ন বারদী) বাসিন্দা। বাবার নাম আব্দুর রহিম বখশ মিলকী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

আব্দুল হাকিম আজাদী

খুলনার খালিশপুর থানার, মুজগুন্নী গ্রামের বাসিন্দা বাসিন্দা মৃত মোহায়মেন মোল্লার পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

আব্দুল হামিদ

আব্দুল হামিদ ছিলেন কোতোয়ালী থানার কমলাপুর গ্রামের মৃত ইছমাইল মিয়ায় ছেলে। তার বিরুদ্ধে ১৯৭২ সালে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

আব্দুল হালিম

যশোর জেলার মাগুরা থানার মাগুরা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল হামিদের পুত্র। তিনি কৃষিজিবী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।

[৬]

আব্দুল্লাহ-হেল-ওয়াছেক

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

[৩৮]

আব্দুস ছোবহান মোল্লা

আব্দুস ছোবহান মোল্লার পিতার নাম তাকি মোল্লা। গ্রামের বাড়ী কোতোয়ালী থানার গুহালক্ষ্মীপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন ইউনিয়ন শান্তিকমিটির সদস্য। তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা করা হয়।

[৩]

আমজাদ আলী মাতবর
আড়িয়াল বালিগাঁও এলাকার অধিবাসী। তিনি ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী, থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য।
[৫৬]

আমজাদ আলী সরকার
মুন্সীগঞ্জ জেলার বালুয়াকান্দি গ্রামের বাসিনবদা। তিনি মুন্সীগঞ্জ গজারিয়া থানা শান্তিকমিটির একজন তালিকাভুক্ত সদস্য।
[৫৬]

আমজাদ মোল্লা
আমজাদ মোল্লা যশোর জেলার বাঘাপাড়া থানার বাসিন্দা। তিনি ছিলেন যশোর জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

আমজাদ হোসেন
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার এন এস টাউন এলাকার বাসিন্দা। তিনি ছিলেন জেলা শান্তিকমিটির সেক্রেটারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ গ্রেফতার হন।
[৬]

আমিনুল হক
বোয়ালমারী থানার শ্রীনগর গ্রামের মোঃ তেজারত মোল্লার পুত্র। আমিনুল হক শান্তিকমিটির একজন সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বিরুদ্ধে বোয়ালমারী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।
[৩]

আমিনুল হক
মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার শান্তিকমিটির সদস্য। কুকুটিয়া গ্রামের অধিবাসী।
[৫৬]

আমির হোসেন
আবদুল জলিল ছিলেন তৎকালীন যশোর জেলার বাঘারপাড়া থানার নারিকেলবাড়িয়ার দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা নাসিম বিশ্বাসের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[১]

আমির হোসেন
যশোর জেলার বাঘারপাড়া থানার নারিকেলবাড়িয়ার দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা নাসিম বিশ্বাসের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[১]

আমীর আলী
নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আমীর আলী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শান্তিকমিটির সেক্রেটারি ছিলেন।
আমীর হোসেন ভুঁইয়া নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার বাসিন্দা।
আমু আমু ছিলেন পাবনা জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
সূত্র : [১৩] সম্পাদিত যুদ্ধাপরাধীর শাস্তি চাই
আয়নুল হক
খুলনার দিঘলিয়া থানার, সেনহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তি কমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।
[২৪]
আয়েন উদ্দিন
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৩৬]
আর রহমান
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া গ্রামের (ইউনিয়ন মুড়াপাড়া) বাসিন্দা।
আরশাদ আলী মিয়া
গ্রামের বাড়ি পালং থানার রুদ্রাকন। পিতার নাম মৃত ইয়াদ আলী মি.া।
[৩]
আরশাদ উল্লাহ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার রামগড় থানার চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা মৃত মহাব্বত আলীর পুত্র। তিনি ছিলেন ওই অঞ্চলের শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকারির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর গ্রেফতার হন।
[৬]
আরিফ, হাজী
হাজী আরিফ ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]
আলতাফ উদ্দিন আহমদ
বরিশাল জেলার ভোলা থানার মিয়ার চর গ্রামের বাসিন্দা রজ্জব আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]
আলতাফ হোসেন
যশোর জেলার মোহাম্মপুর থানার নরেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল মালেক মোল্লার পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২৩ জানয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

আলমাস আলী
নারায়ণগঞ্জের দেওভোগের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন শান্তি কমিটিরর চেয়ারম্যান ।
আলাউদ্দিন
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার (বৈদ্যের বাজার ইউনিয়ন) বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান।
আলাউদ্দিন সিকদার
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৪৩]
আলাউদ্দীন সিকদার
আলাউদ্দীন সিকদার ছিলেন পটুয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]
আলিমুল্লাহ
মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার বাসিন্দা।
[৫৬]
আলী আব্বাস মেম্বার
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার হরিহরপাড়া গ্রামের (ইউনিয়ন এনায়েতনগর) বাসিন্দা।
আলী আহমদ ঢালী
ভেদরগঞ্জ থানার মহিষকান্দি গ্রামের ইয়াকুব আলী ঢালীর পুত্র। তিনি ছিলেন ইউনিয়ন পিস কমিটির সদস্য। তার বিরুদ্ধে ভেদরগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি এন্ট্রি করা হয়।
[৩]
আলী আহমদ মোক্তার
মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার শান্তিকমিটির সদস্য।
[৫৬]
আলী কদর খান
খুলনার দিঘলিয়া থানার, সেনহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তি কমিটির সদস্য।
[২৪]
আলী বক্‌স বিশ্বাস
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার রামগর গ্রামের বাসিন্দা মৃত সেফাত উল্লাহ বিশ্বাসের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

আলী মোল্লা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার নাগরাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের একজন সদস্য। তার বাবার নাম বশিরউদ্দীন মুন্সী।

আলী মোল্লা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার চৈত্রকান্দা গ্রামের (ইউনিয়ন বিশ্বনন্দী) বাসিন্দা। বাবার নাম মোসলেউদ্দীন কারী।

আশরাফ উদ্দিন

রংপুর জেলার কিশোরগঞ্জ থানার পশ্চিম দিলমারা গ্রামের বাসিন্দা মৃত সেরাজ উদ্দিনের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

আশরাফ (রিফিউজি)

খুলনার খালিশপুর থানার, খালিশপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

আসলাম

আসলাম ছিলেন পাবনা জেলা শান্তিকমিটির নেতা।

[১৩]

আসাদ গাজী, চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান আসাদ গাজী ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা শান্তিকমিটির নেতা।

[১৩]

আসাদ

আসাদ ছিলেন পাবনা জেলা শান্তিকমিটির নেতা।

[১৩]

আহমদ সগীর মওলানা

চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার বাসিন্দা। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময বাঁশখালী থানা শান্তিকমিটির সদস্য ছিলেন।

[১৬]

আহম্মদ উল্লাহ

আহম্মদ উল্লাহ ছিলেন নওগাঁ জেলা শান্তিকমিটির নেতা।

[১৩]

আহাদ উল্লাহ

আহাদ উল্লাহ ছিলেন নওগাঁ জেলা শান্তিকমিটির নেতা।

[১৩]

ইউনুস উদ্দীন আহমেদ

খুলনার দৌলতপুর থানার, মহেশ্বরপাশা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

ইউনুস মৃধা

ফরিদপুর জেলার, নগরকান্দা থানার তালমা বাজারে শান্তিকমিটি অফিসের সদস্য। পিতা- হামিদ মৃধা, তালমার বাসিন্দা। ২৪ জুন সন্ধ্যায় শান্তিকমিটির সদস্য ও দালাররা গোপনে পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা গুদাম ঘর ঘিরে ফেলে এবং ব্রাশফায়ারে মৃত্যু হয়।

[২]

ইউসুফ আলী খান ও আমির গাজী

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

[৪০]

ইউসুফ আলী

বরিশাল জেলার ভোলা থানার আলগী গ্রামের বাসিন্দা আসমত আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

ইছহাক বেহারী

ইছহাক বেহারী ফরিদপুর শহরের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শান্তিকমিটির সদস্য থাকার জন্য কোতোয়ালী থানায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

ইছুব শেখ

খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

ইদ্রিস তালুকদার

মুন্সীগঞ্জ জেলা সিরাজদি খান থানার কুসুমপুর গ্রামের বাসিন্দা।

[৫৬]

ইদ্রিস হালদার

মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার আউয়াল বালিগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন টঙ্গীবাড়ী থানার শান্তিকমিটির একজন সদস্য।

[৫৬]

ইব্রাহিম বিশ্বাস
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

ইব্রাহীম বিশ্বাস
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত মল্লিক বিশ্বাসের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

ইয়াকুব আলী
কুষ্টিয়া জেলার গাংনী থানার মালসাদহ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন থানা শান্তি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ গ্রেফতার হন।
[৬]

ইয়াকুব আলী খান
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলের শ্রমিক। তার বাবার নাম সবদার খান।

ইয়াকুব আলী বেপারী
মাদারীপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার গাজীপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত সায়েম আলীর ছেলে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভেদরগঞ্জ শান্তিকমিটির সদস্য ছিলেন।
[৩]

ইয়াকুব আলী ভূইয়া, অধ্যাঃ
খুলনার দৌলতপুর থানার, পাবলা গ্রামের বাসিন্দা তার পিতার নাম জানা যায়নি। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

ইয়াছিন মিয়া
দিখলী গ্রামের অধিবাসী। তিনি ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানা শান্তি কমিটির একজন সদস্য।
[৫৬]

ইলাহাদ আলী মোল্লা
যশোর জেলার অভয়নগর থানার বনগাঁ'র বাসিন্দা মৃত নাজিম উদ্দিনের পুত্র। তিনি ছিলেন স্থানীয় শান্তিকমিটির সেক্রেটারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

ইসমাইল হোসেন

মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান থানার শান্তিকমিটির সদস্য। তার নিজ গ্রাম তাজপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে স্বাধীনতা বিরোধী নানা কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন।

[৫৬]

ইসাহক আলী খাঁ

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

[৩৯]

এ. আহাদ খান

এ. আহাদ খান (বার-এট-ল) ছিলেন তৎকালীন খুলনা শহরের সাউথ সেন্ট্রাল রোড এলাকার বাসিন্দা মৃত মুন্সী মহাজান আলী খানের পুত্র। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর গ্রেফতার হন।

[৬]

এ এম রিয়াছাত আলী

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

[৫২]

এ. কে. এম. ফজলুর রহমান

বোয়ালমারী থানার গোসবাইলপুর গ্রামের মোঃ আঃ মজিদ মোলার পুত্র। যুদ্ধপরবর্তী সময় ১৯৭২ সালে তার বিরুদ্ধে বোয়ালমারী তানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

এএস পুরু

এএস পুরু ছিলেন তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বান্দরবান থানার বাসিন্দা। তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন।

[৬]

এনায়েত হোসেন চৌধুরী

কোতোয়ালী থানার কমলাপুর গ্রামের মৃত মাইজুদ্দিনের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

এবাদ শেখ

খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

এম. এ. ওয়াহেদ

বোয়ালমারী থানার সাইদপুর গ্রামের আঃ বারীর পুত্র। ১৯৭২ সালে তার বিরুদ্ধে বোয়ালমারী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

এম. এ. ছামাদ

ফরিদপুর শহরের কালিবাড়ী রোড এলাকার নেহাজ উদ্দিনের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

এম. এ জাহের

নারায়ণগঞ্জের বিবি রোডের এম. এ জাহের ছিলেন এম. এন. এ ও চিফ হুইপ।

এম. এ জাহের

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার (ইউনিয়ন শম্ভুপুরা) শম্ভুপুরা গ্রামের এম এ জাহের ছিলেন থানার একজন সাধারণ সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

এম. এ. রাজ্জাক

যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার রামগর গ্রামের বাসিন্দা হাজি বদর উদ্দিনের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

এম. এন. জামান

এম. এন জামানের বাবার নাম মৃত মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি ফরিদপুর শহরের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

এম. জাহান খান

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার ইলমদী গ্রামের (ইউনিয়ন হাইজাদী) বাসিন্দা। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের একজন সদস্য।

এস. এম. ফজলুল হক

তৎকালীন ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালী থানার টেপাখোলা গ্রামের সৈয়দ আফছার উদ্দিন আহমেদের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে কোতোয়ালী থানায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

[৩]

ওবায়দুর রহমান মোল্যা

খুলনার দিঘলিয়া থানার, মোল্লাডাঙ্গা গ্রামের ছুরোত মোল্যার পুত্র ওবায়দুর রহমান মোল্যা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

ওবায়দুল হক
বরিশাল জেলার ভাণ্ডারিয়া থানার ভাণ্ডারিয়া গ্রামের বাসিন্দা আফেল উদ্দিনের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

ওমর আলী, ডা.
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার হরিহরপাড়া গ্রামের (ইউনিয়ন এনায়েতনগর) ওমর আলী ছিলেন একজন চিকিৎসক। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির সদস্য।

ওমর আলী, ডা.
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার হরিহরপাড়া গ্রামের (ইউনিয়ন এনায়েতনগর) বাসিন্দা। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক।

ওয়ালী মুহাম্মদ
জেলার কোতোয়ালী থানার এন এস টাউন এলাকার বাসিন্দা কলিমুদ্দিনের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ গ্রেফতার হন।
[৬]

করিম মিয়া
খুলনা জেলার তালা থানার মুরাসুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা কালা চাঁদ শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন জামাতে ইসলামীর সদস্য এবং রাজাকার বাহিনীর প্লাটুন কমান্ডার ও শান্তিকমিটির সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকারির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

কাজী শামসুদ্দীন
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার বগাদিয়া গ্রামের (ইউনিয়ন তেপুর) বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির সেক্রেটারি ।

কাজী সিদ্দীক হোসেন
খুলনার খালিশপুর থানার, মুজগুন্নী গ্রামের কাজী আঃ বারীর পুত্র কাজী সিদ্দীক হোসেন (মৃত)। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তির কমিটির সদস্য।
[২৪]

কাবুল খান (বিহারী)
খুলনার খালিশপুর থানার, খালিশপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

কায়েম আলী

যশোর জেলার বাঘাপাড়া থানার বাসিন্দা। তিনি ছিলেন যশোর জেলা শান্তি কমিটির নেতা।

[১৩]

কাসেদ আলম

যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত আজির উদ্দিন বিশ্বাসের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

কিসমত আলী শেখ

খুলনার দৌলতপুর থানার, মধ্যডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা শাহামতউল্লাহ শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

খন্দকার কেরামত

যশোর জেলার ঝিনাইদহ থানার খোলা গ্রামের বাসিন্দা কাজি আহমদ আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

খন্দকার কোরবান আলী খান

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার পোড়াদহ গ্রামের বাসিন্দা মৃত হাফিজুদ্দিনের পুত্র। তিনি ছিলেন পোড়াদহ ইউনিয়ন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও জামাতে ইসলামীর কর্মী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

খবির উদ্দিন বিশ্বাস

খবির উদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন তৎকালীন যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার রামনগর গ্রামের বাসিন্দা মৃত আকবর আলী বিশ্বাসের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।

[৬]

খবির কাজী

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার (মুড়াপাড়া ইউনিয়ন) বাসিন্দা ।

খলিলুর রহমান (খলিল)

খুলনার খালিশপুর থানার, নয়াবাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত শেখ রহম উল্লাহ'র পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

খান বাহাদুর সাইয়িদ মোহাম্মদ আফজাল

বরিশাল জেলার পিরোজপুর থানার বাসিন্দা। তিনি ছিলেন পিরোজপুর শান্তি কমিটির সেক্রেটারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন।

[৬]

খোদা বখস ভুঁইয়া

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া গ্রামের (ইউনিয়ন মুড়াপাড়া) বাসিন্দা। তার বাবার নাম এলাহী বখস ভুঁইয়া।

খোয়াজ বেপারী

শিবচর থানার চরজানাজাত গ্রামের সাদুল্লা বেপারীর ছেলে। তার বিরুদ্ধে শিবচর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি এন্ট্রি করা হয়।

[৩]

খোরশেদ শেখ

খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত রহমান উল্যা শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

খোশদেল শেখ

খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

গফুর মোল্যা

খুলনার দিঘলিয়া থানার, গোয়ালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

গফুর শেখ

খুলনার দিঘলিয়া থানার, ব্রহ্মগাতি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তি কমিটির সদস্য।

[২৪]

গফুর সরদার

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার (ইউনিয়ন সমান্দী) গ্রামের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

গাফ্‌ফর, ডা.

ডা. গাফ্‌ফর যশোর জেলার উপশহর এলাকার বাসিন্দা। তিনি ছিলেন যশোর জেলা শান্তিকমিটির নেতা।

[১৩]

গুল বখস ভুঁইয়া
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া গ্রামের (ইউনিয়ন মুড়াপাড়া) বাসিন্দা। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের একজন সদস্য এবং মিলের মালিক। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শান্তিকমিটির সভাপতি ছিলেন।

গুলাম দরবেশ
যশোর জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিণাকুণ্ডু গ্রামের বাসিন্দা মুঃ আলী শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। তিনি ছিলেন থানা শান্তিকমিটির সেক্রেটারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

গোলাম কাদের গাজী
খুলনার দিঘলিয়া থানার, বারাকপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত আফতাব গাজীর পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

গোলাম মোস্তফা
যশোর জেলার শৈলকুপা থানার ঝাউদিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত আসির উদ্দিন শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

গোলাম রসুল
যশোর জেলার মাগুরা থানার আলোকদিয়া গ্রামের বাসিন্দা মুন্সীর গোলাম নবীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

গোলাম রহমান ফকির
বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার রায়নগর গ্রামের বাসিন্দা মৃত কিনুব আলী ফকিরের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকারির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

গোলাম হোসেন ফকির
খুলনার দিঘলিয়া থানার, বামনডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা আঃ সবুর ফকিরের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

চং চু আং
পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সিডিএন থানার লেবুচারা গ্রামের বাসিন্দা আং কেয়া কারাবারী'র পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১৯ ডিসেম্বর গ্রেফতার হন।
[৬]

চং চো অং

চং চো অং ছিলেন তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সিডিএন থানার লেবুছড়া গ্রামের বাসিন্দা অংশ কেয়া কারবারীর পুত্র। যুদ্ধপরবর্তীতে যৌথবাহিনী কর্তৃক তিনি ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর গ্রেফতার হন।

[৬]

চান মোল্লা

কালকিনি থানার গঙ্গকুল গ্রামের বাসিন্দা। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন ইউনিয়ন পিস কমিটির সদস্য । ১৯৭২ সালের ২৪ শে জুলাই তার বিরুদ্ধে কালকিনি খানায় একটি সাধারণ ডায়েরি এন্ট্রি করা হয়।

[৩]

চানমিয়া সর্দার

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বাসিন্দা।

চুন্নু মিয়া

চুন্নু মিয়া মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানার কেসুনসার এলাকার অধিবাসী। তিনি সর্বক্ষণ সেনা সদস্যদের সাথে ঘুরে বেড়াতেন বলে জানা যায়। তিনি একসময় মালাখানগরের ইউনিয়ন পরিসদের চেয়ারম্যান ছিলেন। [৫৬]

চুন্নু মিয়া

মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান থানার কেসুনসার এলাকার অধিবাসী।

[৫৬]

চৌধুরী মোহসেন আলী মোক্তার

মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর থানার অধিবাসী।

[৫৬]

ছাত্তার কাজী

খুলনার খালিশপুর থানার, খালিশপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত কাজী মোজাহার হোসেনের পুত্র ছাত্তার কাজী (মৃত)। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

ছাত্তার কাজী

খুলনার খালিশপুর থানার, খালিশপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত কাজী মোজাহার হোসেনের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।

[২৪]

জব্বার মল্লিক

খুলনার খালিশপুর থানার, মুজগুন্নী গ্রামের বাসিন্দা মৃত সুজয় মল্লিকের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।

[২৪]

জয়নাল ফকির
পিতার নাম আমির ফকির এবং গ্রামের বাড়ি কেবালনগর। তার বিরুদ্ধে পালং থানায় একটি জিডি রেকর্ড করা হয়।
[৩]
জয়নাল ভূঁইয়া
জয়নাল ভূঁইয়া শরীয়তপুর জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]
জয়লান আবেদীন
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার সিরাজ সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত গোপাল গাজীর পুত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]
জহির উদ্দিন
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার বাজিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

জাবুল হক
বরিশাল জেলার ভোলা থানার ভোলা শহরের বাসিন্দা আরব আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]
জামাল উদ্দিন শিকদার
ফরিদপুর জেলার, নগরকান্দা থানার তালমা বাজারে শান্তিকমিটি অফিসের সদস্য। তার পিতা-কোহেল উদ্দিন শিকদার। ২৪ জুন সন্ধ্যায় শান্তিকমিটির সদস্য ও দালালরা গোপন পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা অফিস ঘিরে ফেলে এবং ব্রাশফায়ারে তাদের মৃত্যু হয়।
[২]
জামাল
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার ইলমদী গ্রামের (ইউনিয়ন হাইজাদী) বাসিন্দা। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের একজন সদস্য।
জালালউদ্দীন আহাম্মদ
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার কাশীপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।
জাহিদুল ইসলাম
যশোর জেলার নড়াইল থানার নড়াইল শহরের বাসিন্দা হারুনর রশীদের পুত্র। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

জিন্নাত আলী মাতবর
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার আদমজি নগরের বাসিন্দা
জিয়াল ইসলাম
বরিশাল জেলার ভোলা থানার চর হুমায়ন গ্রামের বাসিন্দা হাজি আরব আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]
তমিজউদ্দিন, 'মওলানা'
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড ।
[৪৯]
তালেবুর রহমান
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৬১]
তোফাজ শেখ
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
তোয়াজাত সরদার
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার রাম নগর গ্রামের বাসিন্দা মৃত তমিজ সরদারের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]
দলিল উদ্দিন আহমেদ
ফরিদপুর জেলার, নগরকান্দা থানার তালমা বাজারে শান্তিকমিটির অফিসের সদস্য। তার বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। তার পিতা নাজিম উদ্দিন আহমেদ। ২৪ জুন সন্ধ্যায় শান্তিকমিটির সদস্য ও দালালরা গোপনে পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা গুদাম ঘর ঘিরে ফেলে এবং ব্রাশফায়ারে মৃত্যু হয়।
[২]
দীন মহাম্মদ, 'মাওলানা'
যশোর জেলার মণিরামপুর থানার হারাগাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত মোঃ ফয়েজের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২ মার্চ গ্রেফতার হন।
[৬]
দুরবেশ
দুরবেশ ছিলেন নোয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

দৌলত খান
দিঘলী গ্রামের অধিবাসী। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানা শান্তিকমিটির একজন সদস্য ছিলেন।
[৫৬]
নঈম কাজী
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৪৭]
নওয়াজেশ আহমদ, এডভোকেট
কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা থানার বাসিন্দা মৃত মনির উদ্দিনের পুত্র। তিনি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান এবং মন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তান সরকার (২৫ মার্চের পর)। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ঢাকায় গ্রেফতার হন।
[৬]
নওশের আলী
নওশের আলী ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]
নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার
নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]
নজরুল ইসলাম
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার (খাগকান্দা ইউনিয়ন)বাসিন্দা। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক।
নয়ন মিয়া
মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় স্বাধীনতার পর তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের (২৭-০৫-১৯৭৩) একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত হল—"গত শুক্রবার ঢাকায় ৬ নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জজ জনাব মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী মানিকগঞ্জ শান্তিকমিটির সদস্য নয়ন মিয়াকে পাকবাহিনীর সঙ্গে দালালীর জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন।"
[৫]
নাজির শেখ
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত জব্বার শেখের পুত্র নাজির শেখ। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
নাজিরউদ্দীন আহমেদ
পেইন্টিং প্রেসের একজন মালিক ছিলেন।

নাবিজুদ্দিন বিশ্বাস
কুষ্টিয়া জেলার গাংনী থানার বেড় এলাঙ্গী গ্রামের বাসিন্দা মৃত জেহেরের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

নাসির মোড়ল
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা জাহিদ আলী সারেং-এর পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

নাসিরউদ্দিন
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার (ইউনিয়ন নোয়াগাঁ) বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

নিতাই মন্ডল
ফরিদপুর জেলার, নগরকান্দা থানার তালমা বাজারে শান্তিকমিটি অফিসের সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন মানিকদীর বাসিন্দা। ২৪ জুন সন্ধ্যায় শান্তিকমিটির সদস্য ও দালালরা গোপনে পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা অফিস ঘিরে ফেলে এবং ব্রাশফায়ারে তাদের মৃত্যু হয়।
[২]

নিলু কারিকর
বরিশালের আগৈলঝড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন বরিশাল জেলা শান্তি কমিটির নেতা।
[১৩]

নীমোর আলী
খুলনার খালিশপুর থানার, কাশিপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

নুরুদ্দীন মিয়া
নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়া একজন ব্যবসায়ী।

নুরুল ইসলাম
নিবাসী মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার সিংপাড়া গ্রামের অধিবাসী। একাত্তরের তিনি শ্রীনগর থানার শান্তিকমিটির সদস্য ছিলেন।
[৫৬]

নুরুল হক বেপারী
মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর থানার রিকাবীবাজারের শান্তিকমিটির একজন সদস্য ছিলেন।
[৫৬]

নুরুল হুদা

মুন্সীগঞ্জ জেলার দিঘীরপাড় গ্রামের অধিবাসী । তিনি টঙ্গীবাড়ী থানার শান্তি কমিটির একজন সদস্য ছিলেন ।

[৫৬]

নুরোল হক, 'মওলানা'

খুলনার খালিশপুর থানার নয়াবাটি গ্রামের বাসিন্দা । তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তি কমিটির সদস্য । তিনি এখন মৃত ।

[২৪]

নুরোল হক, 'মওলানা'

খুলনার খালিশপুর থানার নয়াবাটি গ্রামের বাসিন্দা । তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তি কমিটির সদস্য । তিনি এখন মৃত ।

[২৪]

নূরুন্নবী সামদানী

যশোর জেলার ঝিনাইদহ থানার পাবাহাটী গ্রামের বাসিন্দা মৃত ইজ্জত উল্লাহ'র পুত্র । তিনি ছিলেন মহকুমা শান্তিকমিটির সেক্রেটারি, মুজাহিদ ক্যাপ্টেন এবং উপনির্বাচনে এমপিএ । মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন ।

[৬]

নূরুল ইসলাম

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার বাহালবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা হাতেম আলী খানের পুত্র । তিনি ছিলেন পোড়াদহ ইউনিয়ন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান । মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন ।

[৬]

নূরুল ইসলাম

মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার আড়িয়ল এলাকার শান্তিকমিটির সদস্য ।

[৫৬]

পিয়ারা মিয়া

দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

[৪৫]

ফকরুদ্দিন আহমেদ

পটুয়াখালী জেলার বেতাগী থানার আয়লা চাঁদখালি গ্রামের বাসিন্দা মৃত পাষান আলী চৌকিদারের পুত্র । তিনি ছিলেন বেতাগী থানা শান্তিকমিটির সদস্য । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন ।

[৬]

ফজর আলী
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার পাহাড় সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত মনি উল্লাহ'র পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

ফজলুল করিম ভূঞা
মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার শান্তিকমিটির আহবায়ক। তিনি ছিলেন বাহেরকর এলাকার অধিবাসী।
[৫৬]

ফজলে আজিম
ফজলে আজিম ছিলেন নোয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

ফতে আলী খান
খুলনার দিঘলিয়া থানার, বারাকপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

ফতে আলী
খুলনার দৌলতপুর থানার, পাবলা গ্রামের বাসিন্দা মৃত গয়েজ আলী মৃধার পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

ফরিদ আহমদ
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড

ফরিদুল্লাহ ঠাকুর
ফরিদুল্লাহ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

ফুল চান মেম্বার
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার ধর্মগঞ্জ গ্রামের (ইউনিয়ন এনায়েতনগর) বাসিন্দা।

বদর উদ্দীন বিশ্বাস
খুলনার দিঘলিয়া থানার, সেনহাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত ছলেমান বিশ্বাসের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।
[২৪]

বসিরুদ্দিন মজুমদার
যশোর জেলার ঝিনাইদহ থানার ঝিনাইদহ সদরের বাসিন্দা মৃত নাজিরুদ্দিন মজুমদারের পুত্র। তিনি ছিলেন ঝিনাইদহ মহকুমা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

বসিরুদ্দিন মজুমদার
যশোর জেলার ঝিনাইদহ থানার ঝিনাইদহ সদরের বাসিন্দা মৃত নাজিরুদ্দিন মজুমদারের পুত্র। তিনি ছিলেন ঝিনাইদহ মহকুমা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

বাখর আলী
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানার (ইউনিয়ন সাথীপুর) বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধেল সময় তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ।

বাদশা খন্দকার
ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার তালমা বাজারে শান্তিকমিটির অফিসের সদস্য। তার বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। তার পিতা-আফসার উদ্দিন খন্দকার, ফুলসূতী গ্রামের বাসিন্দা। ২৪ জুন সন্ধ্যায় শান্তিকমিটির সদস্য ও দালালরা গোপনে পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা অফিস ঘিরে ফেলে এবং তাদের আক্রমণে বাদশার মৃত্যু হয়।
[২]

বাদশা মিয়া
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার আইলপাড়া গ্রামের (ইউনিয়ন শিমুলপাড়া বিহারি কলোনি, আদমজী জুট মিল) বাসিন্দা। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের একজন সদস্য।

বারিক মোড়ল
খুলনার দিঘলিয়া থানার, দিঘলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত ফয়েজ মোড়লের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

বারিক শেখ
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত সোবহান শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

বেলায়েত হোসেন
বরিশাল জেলার ভোলা থানার মিয়ার চর গ্রামের বাসিন্দা নেসার আহমদের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

মজিদ বিহারি
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড।
[৫০]

মজিবর রহমান
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড ।
[৫১]
মতিন উকিল
মতিন উকিল ছিলেন মেহেরপুর জেলা শান্তিকমিটির নেতা ।
[১৩]
মমিন খান
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড ।
[২৫]
মর্তুজা ইসলাম
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার বাসিন্দা ।
মণ্ড মিয়া
মণ্ড মিয়া ছিলেন পটুয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির নেতা ।
[১৩]
মহিউদ্দিন
মহিউদ্দিন ছিলেন পটুয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির নেতা ।
[১৩]
মালেক উদ্দিন
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার ফাজিলরুর গ্রামের (ইউনিয়ন এনায়েতনগর) বাসিন্দা। বাবার নাম আইয়ুব খান ।
মালেক চৌধুরী
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার গোলাকান্দাইল গ্রামের (ইউনিয়ন গোলাকান্দাইল) বাসিন্দা। তিনি ছিলেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ।
মাহারান আলী খান
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার বাহির মল্লিকপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত মানিক খানের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন ।
[৬]
মীর সোহরাব আলী
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৫৯]
মুজিবর রহমান
যশোর জেলার ঝিনাইদহ থানার বুড়িডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা মৃত মোঃ মানিক শেখের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন ।
[৬]

মুহাম্মদ আলী হোসেন
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার শাখারিঘাটা গ্রামের বাসিন্দা মৃত গোলাম রসুলের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী ও শান্তিকমিটির সেক্রেটারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

মেহের উকিল
মেহের উকিল ছিলেন মেহেরপুর জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

মোঃ আবতাব উদ্দিন
দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানার গোলাহার গ্রামের বাসিন্দা আসগর আলীর পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ ইদ্রিস ছিলেন
মোঃ ইদ্রিস ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

মোঃ ইয়াকুব আলী
কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া থানার আমলাপাড়ার বাসিন্দা মৃত বিখু বিশ্বাসের পুত্র। তিনি ছিলেন কুষ্টিয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ ইয়াকুব বক্স
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার নোয়াপাড়া রোড এলাকার বাসিন্দা মৃত রহিম বক্সের পুত্র। তিনি ছিলেন জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারি ও মাগুরা মহকুমা শান্তি কমিটির সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ ইয়াসিন আলী
কুষ্টিয়া জেলার গাংনী থানার মালসাদহ গ্রামের বাসিন্দা সবদেল মণ্ডলের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির সেক্রেটারি। যুদ্ধপরবর্তীতে দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ ইসহাক
পটুয়াখালী জেলার কোতয়ালী থানার পুরানবাজারের বাসিন্দা আফিল উদ্দিনের পুত্র। পেশায় তিনি স্কুল শিক্ষক এবং পটুয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ কাবিল মিঞা
বরিশাল জেলার ভোলা শহরের সদর রোড এলাকার বাসিন্দা আব্দুল হকের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ গোলাম মোস্তফা
যশোর জেলার ঝিনাইদহ থানার বাসিন্দা মৃত আসিরউদ্দিন শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির সেক্রেটারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ জাকির হোসেন
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার বেজপাড়ার বাসিন্দা নাসের শাহের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ তাজুল ইসলাম
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার নরেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত কালু মোড়লের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ শামসুদ্দিন
চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার বাসিন্দা। ১৯৭১ সালের ২২ মে বাঁশখালী থানা শান্তিকমিটি গঠিত হয়। তিনি ছিলেন ১ নং ইউনিয়নের শান্তিকমিটির আহবায়ক।
[১]

মোঃ শামসুর হক
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার গাবিলা গ্রামের বাসিন্দা মুন্সী মাজাহারুল হকের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

মোঃ সোলেমান গাজী
যশোর জেলার মণিরামপুর থানার সুবলকাটী গ্রামের বাসিন্দা মৃত ইসাম গাজীর পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২ মার্চ গ্রেফতার হন।
[৬]

মোকাদ্দাস হোসেন
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার দইতোলা গ্রামের বাসিন্দা মোসলেম বিশ্বাসের পুত্র। তিনি ছিলেন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর গ্রেফতার হন।
[৬]

মোজাহার বিশ্বাস
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
মোল্যা আজিজুর রহমান
খুলনার দিঘলিয়া থানার, দিঘলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তি কমিটির সদস্য।
[২৪]
মোল্যা মতিয়ার রহমান (মন্টু)
খুলনার দৌলতপুর থানার, দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
মোল্যা মুজিবর রহমান
খুলনার দিঘলিয়া থানার, সেনহাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত নাছিম উদ্দীন মোল্যার পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]
মোসলেম বাওয়ালী
খুলনার দিঘলিয়া থানার, দিঘলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত তোফাজ বাওয়ালীর পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।
[২৪]
মোহ মৃধা
ফরিদপুর জেলার, নগরকান্দা থানার তালমা বাজারে শান্তিকমিটি অফিসের সদস্য। তার বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। তার পিতা কোরবান মৃধা। সন্ধ্যায় মুক্তিযোদ্ধারা গুদাম ঘর ঘিরে ফেরে এবং ব্রাশফায়ারে মৃত্যু হয়।
[২]
মোহাম্মদ আয়েন উদ-দীন
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[১১]
মোহাম্মদ ইউনুস
বরিশাল জেলার ভোলা থানার বাপতা গ্রামের বাসিন্দা ইবরাহীম হাওলাদারের পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]
রজব আলী মিয়া
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার আগরাইল গ্রামের বাসিন্দা মৃত আজিবর বিশ্বাসের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী ও শান্তিকমিটির সেক্রেটারি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

রফিউদ্দীন মোল্যা
খুলনার খালিশপুর থানার, মুজগুন্নী গ্রামের বাসিন্দা তোফাজ উদ্দীন মোল্যার পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

রমজান গাজী
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার কামালপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত বাদল গাজীর পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী । মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

রহমত উল্লাহ্ শেখ
খুলনার দিঘলিয়া থানার, দিঘলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তি কমিটির সদস্য।
[২৪]

রহুল আমিন আ্রুন
ভেদরগঞ্জ থানার বাহারচর গ্রামে বাসিন্দা বাহার উল্লাহর পুত্র ।
[৩]

রাঙা মিয়া
খুলনার দিঘলিয়া থানার, গোয়ালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত আব্বাস উদ্দীন মিয়ার পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

রাজাকার শাহাবুদ্দিন
কুড়িগ্রাম জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

রাহেন শেখ
খুলনার দিঘলিয়া থানার, সাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

লাল মিয়া
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৬০]

লাহা প্রামাণিক
লাহা প্রামাণিক ছিলেন নওগাঁ জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

লুৎফর রহমান
লুৎফর রহমান সম্পর্কে দৈনিক সংবাদের (১২-১২-১৯৭২) একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করা হলো—"মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার জন্য সম্প্রতি পটুয়াখালীর বিশেষ আদালত জৈনক লুৎফর রহমান নামক এক

ব্যক্তিকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। খবরে প্রকাশ উক্ত আসামী শান্তিকমিটির সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। খবরে আরো প্রকাশ উক্ত লুৎফর রহমান যুদ্ধ চলাকালিন পাকবাহিনীর সহায়তায় হত্যা লুঠ ও অগ্নি সংযোগ করেছিল।"
[৫]

শরীফ রফিক উদ্দিন

শরীফ রফিক উদ্দিন সম্পর্কে দৈনিক বাংলার বাণীর (০৬-০৪-১৯৭৩) একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত হল—"ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার সাবেক শান্তিকমিটির সেক্রেটারী শরীফ রফিক উদ্দিন আহম্মদ এবং সদস্য আব্দুর রাজ্জাক ব্যাপারী ও আব্দুল মান্নান ওরফে কুটির বিরুদ্ধে ভাঙ্গা থানার মালতাহ ইউনিয়নের প্রক্ষণকান্দ্রী নিবাসী আব্দুল হফফার মতব্বর ভাঙ্গা থানায় এক দালালী মামলা দায়ের করে। ফরিদপুর জেলার জজের আদালতে উক্ত বিচার হয়। মামলার বিচারে শরীফ রফিক উদ্দিন আহমেদের তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা টাকা অনাদায়ে আরো ১ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। বাকী দুই ব্যক্তি আব্দুর রাজ্জাক ব্যাপার ও আব্দুল মান্নান কুটির বিরুদ্ধে সঠিক প্রমাণের অভাবে আদালত তাদের খালাস দেন।"
[৫]

শেখ গোলাম সরোয়ার (সাহেব আলী)

খুলনার দৌলতপুর থানার, দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা শেখ আব্দুল্লাহর পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

শেখ তবিবর রহমান

খুলনার দিঘলিয়া থানার, সেনহাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত শেখ গোলাম রছুলের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

শেখ নেছার উদ্দীন (চেয়ারমান)

খুলনার দৌলতপুর থানার, দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা শেখ সাহমতউল্লাহর পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

শেখ মাওলা

রংপুর জেলার সৈয়দপুর থানার গোলাহাট গ্রামের বাসিন্দা মদিনার পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

শেখ মাহাবুবুর রহমান (মন্টু)

খুলনার খালিশপুর থানার, মুজগুন্নী গ্রামের বাসিন্দা মৃত আঃ রহমান শেখের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।
[২৪]

শেখ রহমত উল্লাহ
খুলনার দিঘলিয়া থানার, গোয়ালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত কালা মিয়ার পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।
[২৪]

শেখ রুস্তম আলী
খুলনার দিঘলিয়া থানার, চন্দনী মহল গ্রামের বাসিন্দা মৃত আকাম উদ্দীনের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

শেখ সোহরাব হোসেন
খুলনার দৌলতপুর থানার, দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা শেখ আব্দুল্লাহর পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।
[২৪]

শৈলেন চৌধুরী
পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সিডিএন থানার রাইদ খালী গ্রামের বাসিন্দা মোং ফু চৌধুরীর পুত্র। তিনি মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসাবে পরিচয় দানকারী। যুদ্ধপরবর্তীতে যৌথবাহিনীর কর্তৃক তিনি ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর গ্রেফতার হন।
[৬]

সদাগর ইজারাদার
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া গ্রামের (ইউনিয়ন মুড়াপাড়া) বাসিন্দা।

সফিউর রহমান
যশোর মণিরামপুর থানার মণিরামপুরের বাসিন্দা আবদুল জব্বারের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালেল ২২ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

সলেমান, 'মাওলানা'
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৬২]

সলেমান সরদার, ডাক্তার
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৬৩]

সাইদ আহমেদ, ড.
বরিশাল জেলার দৌলতখাঁন থানার খুরকী গ্রামের বাসিন্দা ড. মোজাফফর আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

সাদ আহমেদ
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৫]

সাধনা দত্ত
১৯৭১ সালে সাধনা দত্ত ছিলেন ভোলা গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ভোলায় মহকুমা শান্তিকমিটি গঠিত হলে সাধনা, কমিটির সভাপতি ইলিয়াস মাস্টারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। পাক-বাহিনীর সঙ্গেও ঘোরাফেরা করতেন সাধনা। তার প্রধান কাজ ছিল পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য হিন্দু পরিবারের মেয়েদের তাদের হাতে তুলে দেওয়া। ভোলা কলেজের ছাত্রী কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক মেজরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর সাধনাকে জেলে পাঠানো হয়। তারপর আর তার খোঁজ পাওয়া যায় নি।
[৯]

সাফদার মাস্টার
সাফদার মাস্টার ছিলেন মেহেরপুর জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

সামছুর রহমান চৌধুরী
খুলনার দিঘলিয়া থানার, লাখোহাটি গ্রামের বাসিন্দা নিরা চৌধুরীর পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

সামসুদ্দিন গাজী
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার সিরাজ সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত সাবেদ আলী গাজীর পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

সামসুদ্দিন মণ্ডল
যশোর জেলার ঝিনাইদহ থানার পাবাহাটী গ্রামের বাসিন্দা মৃত আলী মণ্ডলের পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। তিনি ছিলেন জামাতে ইসলামীর সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

সায়েম মোল্লা
সায়েম মোল্লা ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা শান্তিকমিটির নেতা।
[১৩]

সালাম গাজী
যশোর জেলার কোতোয়ালী থানার সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত ওবেদ আলী গাজীর পুত্র। তিনি ছিলেন কৃষিজীবী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
[৬]

সৈয়দ আলী আহম্মদ
খুলনার দিঘলিয়া থানার, সেনহাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত সৈয়দ ইয়াকুব আলীর পুত্র সৈয়দ আলী আহম্মদ। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য। তিনি এখন মৃত।
[২৪]

সোনা মিয়া
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার মোহনপুর গ্রামের (ইউনিয়ন খাগকান্দা) বাসিন্দা।

সোহরাব হোসেন মোল্যা
খুলনার দিঘলিয়া থানার, মোল্লাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা মৃত আনছার উদ্দীন মোল্যার পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

হান্নান, মওলানা, প্রিন্সিপাল
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৪৪]

হাবিব, ডা.
নারায়ণগঞ্জের দেওভোগের একজন চিকিৎসক।

হাবিবুর রহমান
খুলনার দিঘলিয়া থানার, দেয়ড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত শেখ নছের উদ্দীনের পুত্র। ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

হাবিবুর রহমান
খুলনার দিঘলিয়া থানার, দেয়ড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত শেখ নছের উদ্দীনের পুত্র। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]

হাবিবুর রহামান
যশোর জেলার মাগুরা থানার পবনান্দুয়ালী গ্রামের বাসিন্দা ইশারত আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালির অভিযোগে তিনি ১৯৭১ সালেল ১৮ ডিসেম্বরে গ্রেফতার হন।
[৬]

হামিদুল হক চৌধুরী
দ্র. শান্তিকমিটির কর্মকাণ্ড
[৯]

হেমায়েত উদ্দীন, হাজী, ডা.
খুলনার খালিশপুর থানার, কাশিপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন দৌলতপুর শান্তিকমিটির সদস্য।
[২৪]



পঞ্চম পর্ব

শান্তিকমিটির তালিকা

১. আটপাড়া থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা

১. মাহবুবুর রহমান অন্তর : আহবায়ক
২. মওলানা মঞ্জুরুল হক, বুগাপাড়া, থানা : আটপাড়া
৩. মৃত আব্দুল হাকিম তালুকদার
৪. মৌলা মিয়া, ঘাগরা, থানা : আটপাড়া
৫. নান্নু মিয়া, গোয়াতলা, থানা : আটপাড়া
৬. নাজমুল শেখ, ইকর আটিয়া, থানা : আটপাড়া
৭. ওবায়েদুল হক তাহের বুগাপাড়া, থানা : আটপাড়া
৮. হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া, সুনুই, থানা : আটপাড়া ।

সূত্র : [১৩]

২. আশাশুনি থানা শান্তিকমিটি, সাতক্ষীরা

[৫২]

৩. আদমদিঘি শান্তিকমিটি, দুপচাচিয়া, বগুড়া

১. আব্দুল মজিদ তালুকদার সভাপতি

[৩৫]

৪. আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. আঃ ছামাদ আহবায়ক

৫. আড়াইহাজার থানা শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. বেনজির আহমদ, কবি আহবায়ক

৬. ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, ঢাকা শহর

১. মোবারক হোসেন আহবায়ক

৭. ঈশ্বরদী থানা শান্তিকমিটি

১. খোদা বকস্ চেয়ারম্যান
২. নাসির উদ্দিন, মওলানা সদস্য
৩. ইসমাইল, মওলানা সদস্য

[৪]

৮. উপশহর পিস কমিটি, সদর, যশোর

১.	ওয়ালী আহমেদ	কনভেনর
২.	নাসির আহমেদ	সদস্য
৩.	নিসার আহমেদ	সদস্য
৪.	জালাল উদ্দিন আকবর	সদস্য
৫.	ফিরোজ সিদ্দিকী	সদস্য
৬.	নজর হুসাইন	সদস্য
৭.	সুলতান আহমেদ	সদস্য
৮.	শামীম উদ্দিন	সদস্য
৯.	নিজামুল হক	সদস্য
১০.	ওমর খান	সদস্য
১১.	আমিনুল	সদস্য
১২.	হাসান ইমাম	সদস্য
১৩.	ইউনুস মল্লীক	সদস্য
১৪.	আমিনুল্লাহ	সদস্য
১৫.	আমজাদ হুসাইন	সদস্য

**** দ্রষ্টব্য** (ক) সাংবাদিক রুকুনউদ্দোলাহ লিখিত 'মুক্তিযুদ্ধে যশোর' বইতে "এন এস টাউন পিস কমিটি"র একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেখানে ২নং নামের শেষে ব্রাকেটে ১ এবং ৩নং-এ 'নিসার আহমেদ' এর স্থলে 'নাসির আহমেদ(২)' এবং ৫নং-এ 'ফিরোজ সিদ্দিকী'র স্থলে 'ফিরোজ সিদ্দিক' ও ১১ নং-এ 'আমিনুল' এর স্থলে 'আমিনুল এহসান' রয়েছে। (খ) ১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট যশোর জেলা শহর পিস কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ কমরুদ্দীন এ কমিটি অনুমোদন করেন।

[১২]

৯. উলিপুর থানা শান্তিকমিটি

তৎকালীন রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার একটি থানা ছিল উলিপুর। উলিপুর থানা শান্তিকমিটির সদস্যরা ছিলো-

১.	গোলাম মহাবুব	উলিপুর
২.	শরিয়ত উল্লাহ সরকার	ধরণীবাড়ি
৩.	হায়বর আলী	দূর্গাপুর
৪.	আমজাদ হোসেন, মওলানা	গুণাইগাছ
৫.	শাহবুদ্দিন সরকার	উলিপুর
৬.	আব্বাস আলী আহমদ, ডা.	উলিপুর
৭.	নবাব আলী,	উলিপুর
৮.	আবুল বাশার,	উলিপুর

৯.	আবেদ আলী, ড্রাইভার	উলিপুর
১০.	আব্দুল হাকিম,	উলিপুর
১১.	আব্দুল খালেক,	উলিপুর
১২.	কাজী মজিবর রহমান,	নেরখাই
১৩.	আকবর আলী, মওলানা	হাতিয়া
১৪.	গোলাম মোস্তফা	উলিপুর
১৫.	আবু নাজির, মওলানা ও পীর	সাহদরগাহ
১৬.	আবদুল্লাহ মুন্সি	গুণাইগাছ

[২৩]

১০. উল্লাপাড়া থানা শান্তিকমিটি

১. আহমদ হোসাইন (জামাত) আহবায়ক

২. হাবিবুর রহমান খান (কনভেনশন) : সাধারণ সম্পাদক।

১১. কয়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার কয়া ইউনিয়র শান্তিকমিটি-

১.	রমজান আলী, গট্টিয়া	সদস্য
২.	মোস্তফা, খলিসাদহ	সদস্য
৩.	কেরামত	সদস্য
৪.	গঙ্গা, গট্টিয়া	সদস্য
৫.	তব	সদস্য
৬.	মদ্দার	সদস্য
৭.	সরবোন	সদস্য
৮.	হাসেম আলী, কয়া	সদস্য
৯.	সাহাবুদ্দিন গাইন	সদস্য
১০.	উকিল প্রামাণিক, বানিয়াপাড়া	সদস্য

[১৮]

১২. কলমাকান্দা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা

১. মোফাজ্জল হোসেন খান, ছত্রংপুর, থানা : কলমাকান্দা;

২. সুরুজ মিয়া. বড়কাটন, থানা : কলমাকান্দা;

৩. শামছুল হুদা পাঠান, রংছাতি, থানা : কলমাকান্দা;

৪. শামছুল হুদা, রহিমপুর, থানা : কলমাকান্দা, শীর্ষ স্থানীয় দালাল;

৫. আব্দুল আলী, বিমারা, থানা : কলমাকান্দা;

৬. মৃত আব্দুল খালেখ, চৈতা, থানা : কলমাকান্দা;

৭. আব্দুল জলিল, চিকারপুড়ি, থানা : কলমাকান্দা;

৮. মৃত আব্দুল আলী, বিশারা, থানা : কলমাকান্দা।

[১৩]

১৩. কমলগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, সিলেট

১. মুন্সী মোহাম্মদ আরিফ আহবায়ক

১৪. কুলাউরা থা শান্তিকমিটি, সিলেট

১. বদরুদ্দিন আহমদ আহবায়ক

২. বাতির মিয়া সম্পাদক

১৫. কামারখান ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. রুস্তম আলী হালদার আহবায়ক

১৬. কুমিল্লা সদর থানা শান্তিকমিটি

১. মোঃ আনোয়ার হোসেন আহ্বায়ক

১৭. কুকুটিয়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. আব্দুল করী আহবায়ক

১৮. কোতোয়ালী থানা শান্তিকমিটি, কুমিল্লা

১. আবুল বাশার আহ্বায়ক

১৯. কোলাপাড়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. আমিনুল হক মৃধা আহ্বায়ক

২০. কামারখন্দ থানা শান্তিকমিটি

১. তাজুমুল হোসাইন খান (কনভেনশন) : আহবায়ক

২১. কুমিল্লা জেলা শান্তিকমিটি

১. আজিজুর রহমান, প্রাক্তন এম. এন. এ সভাপতি

২২. কালীগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি

সামছুর রহমান সাধারণ সম্পাদক

[৫]

২৩. কাশিয়ানী থানা শান্তিকমিটি

১. সলেমান সরদার, ডা. সভাপতি

[২৯]

২৪. কিশোরগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি

১. আব্দুল মোনায়েম খান, গ্রাম হুমাইপুর, থানা বাজিতপুর, জেলা কিশোরগঞ্জ

২. মওলানা আতাহার আলী, সাং ঘোগাদিয়া, জেলা : সিলেট

৩. মওলানা আতাউর রহমান খান, পিতা মওলানা আহম্মদ আলী খান, কিশোরগঞ্জ সদর, বর্তমানে বিএনপির সাথে জড়িত

৪. মুসা, বাজিতপুর, প্রফেসর মাহতাবউদ্দিন (গুরুদয়াল কলেজ) যশোদল, কিশোরগঞ্জ সদর

৫. আবুল হাশিম, পিতা মফিজ হাজী, গ্রাম চিকনীরচর, কিশোরগঞ্জ সদর মৃত দুলাল, গ্রাম করিয়াই, কিশোরগঞ্জ সদর

৬. শামসুদ্দিন, পিতা মৃত মধুর বাপ, গ্রাম : বাশহাটি, কিশোরগঞ্জ সদর
৭. জালাল, পিতা মৃত আঃ সোবহান, গ্রাম : নদা, কিশোরগঞ্জ সদর
৮. আঃ হোসেন, গ্রাম নদা, কিশোরগঞ্জ; মফিজ উদ্দিন, গ্রাম শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ সদর
৯. মৃত আঃ মান্নান, পিতা : হাজী মাহমুদ নবী, কালিকাবাড়ি, থানা : কিশোরগঞ্জ সদর
১০. মাওলানা আব্দুল হামিদ (সাবেক মাদ্রাসা সুপার) গ্রাম নোয়াহাট, থানা কিশোরগঞ্জ সদর
১১. মাওলনাা আব্দুল খালেক, গ্রাম : কাজীরগাঁও, কিশোরগঞ্জ সদর
১২. মাওলানা মোনতাজ উদ্দিন, গ্রাম : কাজীরগাঁও, কিশোরগঞ্জ সদর
১৩. মওলানা ইউসুফ আলী, গ্রাম : চৌদ্দশত, কিশোরগঞ্জ সদর
১৪. মাওলানা ইয়াহিয়া, গ্রাম : টুটিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ সদর
১৫. মৃত মওলানা সিরাজউদ্দিন, গ্রাম : চৌদ্দশত, কিশোরগঞ্জ সদর
১৬. গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম : কলাপাড়া, কিশোরগঞ্জ সদর
১৭. রুসতুম আলী, পিতা : মেদর, গ্রাম : ঘাটক, কিশোরগঞ্জ সদর
১৮. মওলানা আব্দুল মান্নান, গ্রাম : ঘোন্দর, করিমগঞ্জ
১৯. আরকান, গ্রাম : শোলকিয়া, কিশোরগঞ্জ সদর
২০. লোকমান মৌলভী, সাবেক চেয়ারম্যান, গুনধর ইউনিয়ন, বর্তমানে খরমপট্টি, কিশোরগঞ্জ
২১. মুগল মিয়া, গ্রাম : মহিন্দর, কিশোরগঞ্জ সদর
২২. মৃত আক্কাছ আলী, গ্রাম : মহিন্দর, কিশোরগঞ্জ সদর
২৩. কাছু, গ্রাম : মহিন্দ, কিশোরগঞ্জ সদর
২৪. মৃত আঃ মালেক, পিতা আসক আলী, গ্রাম : কলাপাড়া, কিশোরগঞ্জ সদর
২৫. জুড়ো মিয়া, গ্রাম, কাসুরারচর, কিশোরগঞ্জ সদর
২৬. নূরুল ইসলাম, গ্রাম : মহিন্দর, কিশোরগঞ্জ সদর
২৭. মৃত আঃ জব্বার মেম্বার, গ্রাম : মেলাবাজার, কিশোরগঞ্জ সদর
২৮. আঃ রহমান, পিতা মৃত আমীর হোসেন, গ্রাম বিরধামপাড়া, কিশোরগঞ্জ সদর
২৯. ইমান হোসেন, গ্রাম : মধুনগর, কিশোরগঞ্জ সদর
৩০. ওমর আলী
৩১. ওমেদ আলী

[১৩]

২৫. কিশোরগঞ্জ সদর শান্তিকমিটি

১.	মুসলিম উদ্দিন	চেয়ারম্যান
২.	আতাহার আলী	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	বাদশা মিয়া	ভাইস চেয়ারম্যান

৪.	রুস্তম আলী	ভাইস চেয়ারম্যান
৫.	আব্দুল আউয়াল	সেক্রেটারি
৬.	এমদাদুল হক মতি মিয়া	সদস্য
৭.	নুরুল ইসলাম তারা মিয়া	সদস্য
৮.	জয়নাল আবেদিন	সদস্য
৯.	মফিজউদ্দিন	সদস্য
১০.	সৈয়দ রফিকুল্লা	সদস্য
১১.	ধলু মিয়া	সদস্য
১২.	আনোয়ার	সদস্য
১৩.	সিরাজুল ইসলাম	সদস্য
১৪.	বাবুর বাপ	সদস্য
১৫.	সাইদুর রহমান, এ্যাডভোকেট	সদস্য
১৬.	শাহ সামশুল হুদা	সদস্য
১৭.	ওয়ালিউল্লাহ খান	সদস্য
১৮.	এ. কে. শরফুদ্দিন, ডা	সদস্য
১৯.	ওসমান গনি	সদস্য
২০.	টুকু চেয়ারম্যান	সদস্য
২১.	কাজী মফিজুল হক	সদস্য
২২.	ওরফে মানিক কাজী	সদস্য
২৩.	আতাউর রহমান খান	সদস্য
২৪.	আবুল আলী মেনু মিয়া	সদস্য
২৫.	নুরুজ্জামান, এ্যাডভোকেট	সদস্য

[২৭]

২৬. কীর্তিপাশা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, বরিশাল

১. আজহার মিয়া — সভাপতি

[৫৫]

২৭. কুড়িগ্রাম ইউনিয়ন শান্তিকমিটি

১. শামসুল হক খন্দকার — আহ্বায়ক

[৭]

২৮. কুড়িগ্রাম জেলা শান্তিকমিটি

১. শাহাবুদ্দিন

[১৩]

২৯. কুড়িগ্রাম মহকুমা শান্তিকমিটি

১৯৭১ সালের ২৪ মে কুড়িগ্রাম মহকুমা শান্তিকমিটি গঠিত হয়।

১. পনির উদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন এমএনএ, আলহাজ — সভাপতি

২. মো. আবদুন নাসির, মৌলানা — সহসভাপতি

৩.	ওয়ালিপুরের পীর	সহসভাপতি
৪.	কাউসার উদ্দিন মিয়া	সহসভাপতি
৫.	এমএ সাঈদ আলী	সহসভাপতি
৬.	সাইফুর রহমান, আলহাজ, মৌ, বিএ, নাগেশ্বরী	সহসভাপতি
৭.	আফসার উদ্দিন মিয়া, সিটিসি, কুড়িগ্রাম	সহসভাপতি
৮.	আবুল বাশার মিয়া, ওয়ালিপুর	সহসভাপতি
৯.	সামশুল হক, চিলমারি	সহসভাপতি
১০.	কে এম সামশুল হক	সম্পাদক
১১.	বেলায়েত হোসেন, মৌলানা	সহকারী
১২.	কাজি মোশারফ হোসেন	সহকারী
১৩.	আবদুল কুদ্দুস	সহকারী
১৪.	সামিউল্লা	ক্যাশিয়ার

[৫৩]

৩০. কুড়িগ্রাম শহর শান্তিকমিটি

১.	আফসার উদ্দিন আহমেদ	সভাপতি
২.	এ হামিদ আলী	সদস্য
৩.	কফিল উদ্দিন আহমদ	সদস্য
৪.	আমিন উদ্দিন আহমেদ	সদস্য
৫.	এ সামাদ সরকার	সদস্য
৬.	আজির উদ্দিন মুনশী	সদস্য

[৫৩]

৩১. কুমারখালী থানা শান্তিকমিটি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানা শান্তিকমিটি বা শহর শান্তিকমিটির যাদের নাম পাওয়া গেছে—

১.	গোলাম মহম্মদ	চেয়ারম্যান
২.	কমলা কাজী	সেক্রেটারি
৩.	আজিজল হক বিশ্বাস	সদস্য
৪.	ফকরুদ্দিন	সদস্য
৫.	ফজলার রহমান	সদস্য
৬.	জামালুদ্দিন	সদস্য
৭.	সাদেক	সদস্য
৮.	মুনসের ডাক্তার	সদস্য
৯.	নজরুল মাস্টার	সদস্য
১০.	ফিরোজ	সদস্য
১১.	খুরশীদ	সদস্য

[১৮]

৩২. কেন্দুয়া থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল

১. আঞ্জু, থানা : কেন্দুয়া
২. চমক আলী, হারুলিয়া, থানা : কেন্দুয়া
৩. মতিউর রহমান, মাসকা, থানা : কেন্দুয়া
৪. সাদেক মিয়া, হেড মাস্টার থানা : কেন্দুয়া
৫. কালা মিয়া, মৃত চেয়ারম্যান, পিজাহাতী, ইউনিয়ন : মসকা, থানা : কেন্দুয়া
৬. নুরু মাস্টার, মৃত কাওরাড, থানা : কেন্দুয়া
৭. বাদল মিয়া, মৃত কান্দিউড়া, থানা : কেন্দুয়া
৮. মোঃ জয়নাল মিয়া, পিতা : চিনিরবাপ, কান্দিউড়া, থানা : কেন্দুয়া
৯. আব্দুল ওয়াদুদ খান, কলমআটি, থানা : কেন্দুয়া
১০. জং বাহাদুর দফাদার, মৃত নল্লা, থানা : কেন্দুয়া

[১৩]

৩৩. খুলনা সদর থানা শান্তিকমিটি

১. আইয়ুব হোসাইন — সাধারণ সম্পাদক

[২৮]

৩৪. খুলনা জেলা শান্তিকমিটি

১. এ. কে. এম. ইউসুফ, মাওলানা, সাবেক মন্ত্রী (জামাত) — আহবায়ক
২. আবুল হোসাইন সাবেক মন্ত্রী (কনভেনশন) — অন্যতম সদস্য

৩৫. খোকসা থানা শান্তিকমিটি, কুষ্টিয়া

১. আলিমুদ্দিন বিশ্বাস — সভাপতি

[৫]

৩৬. গফরগাঁও থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

১. মোঃ নূরুল হক খান, গ্রাম পাতলাশী, থানা গফরগাঁও, জেলা ময়মনসিংহ
২. মৃত বাকু মেম্বার, পিতা ছমির উদ্দিন, গ্রাম পাতলাশী, থানা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ
৩. আব্দুল মজিদ, পিতা মৃত আমীর উদ্দিন, গ্রাম নিগুয়ারী, থানা গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ
৪. মৃত আব্দুল হেলিম মণ্ডল, গ্রাম অললী, থানা গফরগাঁও, জেলা ময়মনসিংহ
৫. আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল, গ্রাম অললী, থানা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ
৬. মৃত ওয়াহেদ আলী প্রধান, গ্রাম অললী, থানা গফরগাঁও, জেলা ময়মনসিংহ
৭. মৃত আব্দুল হেলিম খান, গ্রাম চাকুয়া, থানা গফরগাঁও, জেলা ময়মনসিংহ

৮. মৃত তাজুল ইসলাম, গ্রাম : অললী, থানা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ
৯. মৃত আব্দুস সামাদ মাস্টার, অলী, শিক্ষক, থানা গফরগাঁও, জেলা ময়মনসিংহ
১০. মৃত সিরাজ উদ্দিন আকন্দ, পিতা : আব্দুল বারেক আকন্দ, গ্রাম : পাতলাশী, থানা : গফরগাঁও
১১. আবুল কালাম, গ্রাম : সাদুয়া, থানা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ
১২. আব্দুল জব্বার, মওলানা, গ্রাম চাকুয়া, থানা গফরগাঁও, জেলা ময়মনসিংহ

[১৩]

৩৭. গলাচিপা থানা শান্তিকমিটি, পটুয়াখালী

১. আলাউদ্দিন শিকদার সম্পাদক

[৪৩]

৩৮. গাজীপুর জেলা শান্তিকমিটি, গাজীপুর

১. আলাউদ্দীন, গ্রাম : মুদাফা, থানা : টঙ্গী
২. আওয়াল, জয়দেবপুর
৩. নওয়াব আলী, এমপি জয়দেবপুর
৪. হাকিম উদ্দীন, মাধববাড়ি, জয়দেবপুর
৫. মজিব, মাধববাড়ি, জয়দেবপুর
৬. মনু : মাধববাড়ি, জয়দেবপুর

[১৩]

৩৯. গফরগাঁও থানা শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদ, ময়মনসিংহ

১. আবদুল হাকিম মণ্ডল ডা, সভাপতি
২. খন্দকার আবু সাঈদ শামসুল হুদা সম্পাদক
১৬৫ জন সদস্য

৪০. গোপালগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি

১. ওহিদুজ্জামান, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
২. কাফু মিয়া, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
৩. লালা মিয়া, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
৪. রতন মিয়া, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫. হেমায়েত, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
৬. মনি মিয়া, টুঙ্গপাড়া, গোপালগঞ্জ
৭. আরজ, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ

[১৩]

৪১. চাঁদপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার তৎকালীন কুমারখালী থানার চাঁদপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটির সদস্য ছিলেন—

১.	ফজলুল হক পীরজাদা, কমান্ডার	কুশলীপসা
২.	ছাবদার হোসেন	কুশলীপসা
৩.	আফতাব মুন্সী	করিমপুর
৪.	আলাউদ্দিন মাস্টার	
৫.	আকসেদ আলী	করিমপুর

[১৮]

৪২. চাপড়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া জেলার, কুমারখালী থানার (তৎকালীন) চাপড়া ইউনিয়নের শান্তিকমিটির সদস্যরা ছিলেন—

১.	সিরাজ মোক্তার	ইছাখালী
২.	আফজাল	সিংদা
৩.	মদনা বিহারি	ছেউরিয়া
৪.	হানিফ বিহারি	
৫.	মুসলিম	
৬.	মুকসেদ আলী, জয়নাবাদ	

[১৮]

৪৩. চুনারুঘাট শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ

১.	মুসলিম উদ্দিন	আহবায়ক
২.	আঃ হাসিম	সদস্য সচিব
৩.	গোলাম মোস্তফা চৌধুরী	সদস্য
৪.	ছুরুক আলী	সদস্য
৫.	বদিউর রহমান	সদস্য
৬.	আব্দুর রশিদ	সদস্য
৭.	তামাই মহালদার	সদস্য

[৮]

৪৪. চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শান্তিকমিটি

১.	এম. এ. খালেক মল্লিক	পুরাতন হাসপাতাল পাড়া
২.	নওয়াজেশ আহমদ, এ্যাডভোকেট	রেজেস্ট্রি অফিস পাড়া
৩.	সিরাজুল ইসলাম	রেলপাড়া
৪.	আবদুস সাত্তার, উকিল	—
৫.	নবী মল্লিক	গোরস্তান পাড়া
৬.	শাহাদত	বাগান প়াড়া

৭. গোলাম আনসারী	কাঁঠাল ওয়াপদা পাড়া
৮. মজিবর রহমান	জেলতলা পাড়া
৯. ছায়েদুর রহমান, ডা.	কলেজ পাড়া
১০. গোলাম রহমান, এ্যাডভোকেট	কোর্ট পাড়া
১১. মোজাম্মেল হক	পোস্ট অফিস পাড়া
১২. আইউব	বাগান পাড়া
১৩. এন. বাহেন উদ্দিন	কাঁঠাল জেল পাড়া
১৪. আজিজুর রহমান	জিনেদাহ-বোয়ালিয়া
১৫. মনিরুদ্দিন	জালশুকা
১৬. খোশাল মিয়া	ছয়খরিয়া
১৭. দলিলউদ্দিন	ছয়খরিয়া
১৮. রওশন আলী	ভাণ্ডার দোহায়
১৯. আকবর আলী	জিনেদাহ

[১৯]

৪৫. চুয়াডাঙ্গা শান্তিকমিটি

১. জামিউল আলম খান (কনভেনশন) : আহবায়ক ।

৪৬. জগন্নাথপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার তৎকালীন কুমারখালী থানার জগন্নাথপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি-

১. মুন্সি মজিবর রহমান	সভাপতি
২. নুরুল হক, দয়ারামপুর	সদস্য
৩. মোজাম, হাসিমপুর	সদস্য
৪. কামরুজ্জামান বাবু	সদস্য
৫. ইবাদ আলী, চাপাইগাছি	সদস্য
৬. আইজদ্দিন, জোতপাড়া	সদস্য
৭. অকাসদ্দিন, মহেন্দ্রপুর	সদস্য

[১৮]

৪৭. জয়পুরহাট মহকুমা শান্তিকমিটি

১. এস. এ. আজিজ, মাওলানা (জামাত)	আহবায়ক
২. আব্দুল আলিম	

৪৮. জামালগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি

১. আবুল মনসুর আহমদ	সভাপতি
২. আব্দুল গণি	সদস্য
৩. সিরাজুল ইসলাম	সদস্য
৪. সোনা মিয়া	সদস্য

৫. সৈয়দ আকবর আলী সদস্য
৬. আফতাব উদ্দিন সদস্য
৭. আব্দুন নূর সদস্য
৮. সিদ্দিক আলী সদস্য
৯. আব্দুল খালিক সদস্য
১০. এ সাত্তার, ডা. সদস্য
১১. শাহনূর সদস্য

৪৯. জামালপুর মহকুমা শান্তিকমিটি

১. আব্দুল আজিজ, প্রিন্সিপাল সভাপতি
২. মো. মক্তব হোসেন সাধারণ সম্পাদক

[৫৭]

৫০. জামালপুর সদর শান্তিকমিটি

১. নন্দ, বনপাড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর
২. ইউসুফ মাস্টার, সিংহেরজানি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক
৩. আব্দুল গণি, প্রফেসর, ইকবালপুর, জামালপুর সদর, জামালপুর
৪. আব্দুর রব, কলেজশিক্ষক, আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর
৫. মৃত আঃ আজিজ কলেজশিক্ষক, আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর
৬. মৃত আমেজউদ্দিন চেয়ারম্যান, ফুলবাড়িয়া স্টেশন রোড, জামালপুর
৭. চান মিয়া, চাকারীপাড়া, জামালপুর শহর; সুলেমান, কাটারীপাড়া, জামালপুর
৮. মৃত হানু মৌলভি, পলিশা, জাপালপুর, পৌরসভা জামালপুর
৯. নূরুল হক মাস্টার, পিতা ময়েজ উদ্দিন মণ্ডল, জঙ্গলপাড়া, পো বেলটিয়া, জামালপুর
১০. কাজী আব্দুল রহিম, বেলটিয়া, জামালপুর পৌরসভা, জামালপুর
[১৩]

৫১. ঝালকাঠি শান্তিকমিটি, বরিশাল

১. ছলিমুদ্দিন মিয়া সভাপতি

[৫৫]

৫২. ঝিনাইদহ জেলা শান্তিকমিটি

১. নওশের আলী
২. নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার
৩. সায়েম মোল্লা

[১৩]

৫৩. ঝিনাইদহ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি

১. সাদেক আলী সভাপতি
২. সদরউদ্দিন সদস্য

৩. শামসুদ্দিন, কসবা — সদস্য
৪. এস. এ. রউফ, জাহেদপুর — সদস্য
৫. আ. বারী, বেলগাছি — সদস্য
৬. নূর মোহাম্মদ, খোরশেদপুর — সদস্য

[১৮]

৫৪. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর

১.	কমরউদ্দিন বিএ	চৌরাস্তা	চেয়ারম্যান
২.	মোঃ শরিফ	রেলগেট	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	ডা. মাসুদুর রহমান	রেলগেট	সম্পাদক
৪.	জয়নুল আবেদীন	স্মিত রোড	সহকারী সম্পাদক
৫.	ওয়ালী আহমেদ	এনএস টাউন	সহকারী সম্পাদক
৬.	সগীর আহমেদ	রেলগেট	প্রচার সম্পাদক
৭.	নাজিমুদ্দিন আল আজাদ	যশোর	দপ্তর সম্পাদক
৮.	মোঃ হাসান	মিলন ট্রান্সপোর্ট	সদস্য
৯.	মির্জা মোঃ আলী	বি কে রেড	সদস্য
১০.	মাহবুব সাব্বানী	ঘোপ	সদস্য
১১.	নূর মহম্মদ	ঘোপ	সদস্য
১২.	কামরুজ্জামান	ঘোপ	সদস্য
১৩.	শেখ হাসান আলী	বারান্দীপাড়া	সদস্য
১৪.	সোলায়মান হাসান	লোন অফিসপাড়া	সদস্য
১৫.	নাজির উদ্দিন, অ্যাডভোকেট	লোন অফিসপাড়া	সদস্য
১৬.	আজিজুর রব খান, অ্যাডভোকেট	বারান্দীপাড়া	সদস্য
১৭.	রেজাউল হক, অ্যাডভোকেট	বারান্দীপাড়া	সদস্য
১৮.	এস এম ইলিয়াস	বেজপাড়া	সদস্য
১৯.	মুন্সি মোঃ ইয়াকুব	বেজপাড়া	সদস্য
২০.	হাফেজ বদরুজ্জামান	ইসলামিয়া হাই স্কুল	সদস্য
২১.	খন্দকার জহুরুল হক	ষষ্ঠিতলা পাড়া	সদস্য
২২.	শামসুর রহমান খোকা মিয়া	ষষ্ঠিতলা পাড়া	সদস্য
২৩.	বেগম আয়শা সরদার	যশোর	সদস্য
২৪.	ওয়ালিউল হক	বারান্দীপাড়া	সদস্য
২৫.	মনোয়ার হোসেন, অ্যাডভোকেট	যশোর	সদস্য

** **দ্রষ্টব্য** : ১৯৭১ সালের ১০ আগস্ট এক সভায় এই কমিটি চূড়ান্ত করা হয়।

[১২]

৫৫. টাঙ্গাইল জেলা শান্তিকমিটি

১. আনিস, ছাব্বিশা, ভূয়াপুর
২. সাজু, কালামাঝি, মধুপুর;

৩. লুৎফর, মৌলভী কালামাঝি, মধুপুর
৪. শাজাহান, কালামাঝি, মধুপুর
৫. রশীদ, কালামাঝি
৬. সামাদ, কালামাঝি, মধুপুর
৭. দুদু মিয়া, কালামাঝি, মধুপুর
৮. মনসুর, মধুপুর
৯. আকবর (মৃত) মধুপুর
১০. মাহেবুল, মির্জাপুর
১১. মাওলানা ওয়াদুদ, মির্জাপুর
১২. মকবুল হোসেন, ছাব্বিশা, ভূয়াপুর
১৩. রফিক, ছাব্বিশা, ভূয়াপুর
১৪. আশরাফ আলী, ছাব্বিশা, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল
১৫. হেকিম হাবিবুর রহমান — সভাপতি
১৬. আব্দুল খালেক সাধারণ — সম্পাদক
১৭. আব্দুল্লাহ- হেল- ওয়াসেক সদস্য

সূত্র : [১৩ ও ৩০]

৫৬. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি

	নাম	পদ
১.	হাবিবুর রহমান, হেকিম	চেয়ারম্যান
২.	আব্দুল খালেক	সেক্রেটারি
৩.	বিজু মিয়া	সদস্য
৪.	এমদাদ আলী খান দারোগা	সদস্য
৫.	আফাজ ফকির	সদস্য
৬.	শামসুজ্জামান খান, ঘাটাইল স্কুলের হেডমাস্টার	সদস্য
৭.	শওকত আলী ভূইয়া, ডা. খলপাড়া	সদস্য
৮.	আব্দুর রাজ্জাক আনসারী, বল্লা	সদস্য
৯.	মুহাম্মদ ইসহাক আলী	সদস্য
১০.	আব্দুল ওয়াদুদ, 'মৌলানা', মির্জাপুর	সদস্য
১১.	আব্দুল খালেক, গোপালপুর	সদস্য
১২.	মেহেদি খান পল্লী, করটিয়া	সদস্য
১৩.	সেলিম খান পল্লী, করটিয়া	সদস্য
১৪.	আজিজুল হক ওরফে বাকা মিয়া, টাঙ্গাইল	সদস্য
১৫.	আশরাফ মির্জা	সদস্য
১৬.	সাইদ দারোগা	সদস্য
১৭.	পটু হাফেজ	সদস্য
১৮.	গিনি মিয়া	সদস্য

১৯. সিরাজ, গুণ্ডা, বেতকা	সদস্য
২০. বাবু খান, আকুর টাকুর	সদস্য
২১. মতি, ড্রাইভার, সন্তোষ	সদস্য
২২. নজরুল, প্যারাডাইস পাড়া	সদস্য
২৩. তুলা মোক্তার	সদস্য
২৪. জলিল মিয়া, থানা পাড়া	সদস্য
২৫. টিপু মির্জা, শিবনাথ হাইস্কুলের শিক্ষক	সদস্য
২৬. হুমায়ুন হোসেন খান, নগরপুর	সদস্য
২৭. জোয়াহের খান, পোষণা-কালিহাতি	সদস্য
২৮. খন্দকার মহিউদ্দিন, পূর্ব আদালত পাড়া	সদস্য
২৯. বিশু মিয়া	সদস্য
৩০. টিপু ফকির	সদস্য
৩১. নান্নু	সদস্য
৩২. খন্দকার আব্দুর রহিম	সদস্য
৩৩. আব্দুল বাসেত, ক্যাপ্টেন, ডাক্তার, গাঙ্কিনা	সদস্য
৩৪. ভুঙ্গু মিয়া, মোগল পাড়া	সদস্য
৩৫. জালাল মিয়া, আদালত পাড়া	সদস্য
৩৬. গণি দারোগা	সদস্য
৩৭. রেজাউর রহমান	সদস্য
৩৮. হিরা, প্রফেসর	সদস্য
৩৯. আফজাল চৌধুরী	সদস্য
৪০. খালেক মিয়া	সদস্য
৪১. সামাদ, বিএনপি	সদস্য
৪২. লেবু মিয়া	সদস্য
৪৩. ইসমাইল মিয়া	সদস্য
৪৪. আব্দুর রশিদ, ভাতকুড়া	সদস্য
৪৫. ইউসুফ হাই এ্যাডভোকেট	সদস্য
৪৬. আব্দুল হাই সালাকী, সখিপুর	সদস্য
৪৭. আব্দুল সালাম দরদী	সদস্য
৪৮. আনোয়ার, হাজি	সদস্য
৪৯. তাজ মিয়া, তাজপ্রেস টাঙ্গাইল	সদস্য
৫০. আকরাম খান, আকুর টাকুর	সদস্য
৫১. বাল্টিন, করটিয়ার জমিদার পুত্র	সদস্য
৫২. মোটাবুলবুল, থানাবাড়ী	সদস্য
৫৩. নবাব আলী মাস্টার, করটিয়া	সদস্য

৫৭. ঠাকুরগাঁও জেলা শান্তিকমিটি

১. তাজু
২. ফজলুলর চেয়ারম্যান
৩. হেকিম উদ্দীন
৪. আব্দুর রহিম চেয়ারম্যান

[১৩]

৫৮. ঠাকুরগাঁও শান্তিকমিটি

১. তমিজউদ্দিন, মওলানা সভাপতি

৫৯. ঢাকা জেলা শান্তিকমিটি

১. আকবর, শাঁখারীবাজার;
২. তোতা মিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
৩. ঈমান আলী, রায়েবাজার;
৪. হেদায়েত উল্লাহ (মৃত), রায়েরবাজার

[১৩]

৬০. তালা থানা শান্তিকমিটি, সাতক্ষীরা

১. আনসার আলী সভাপতি

৬১. তেজগাঁ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, ঢাকা শহর

১. শাহবুবুর রহমান আহবায়ক

৬২. ত্রিশাল থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

১. মোহাম্মদ ফজলুল হক খান, থানা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
২. মৃত ওয়াজেদ আলী, গ্রাম ত্রিশাল চরপাড়া, থানা ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ
৩. মৃত ভেরা মিয়া, গ্রাম : কুমারিয়া, থানা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
৪. মৃত আব্দুল মোতালেব, থানা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
৫. হুরমত আলী, গ্রাম : চিকনা, থানা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
৬. চাঁন মিয়া, গ্রাম : ত্রিশাল বাজার, থানা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
৭. ইসমান আলী, গ্রাম : ত্রিশাল বাজার, থানা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
৮. মোঃ আদিল সরকার (চেয়ারম্যান), থানা ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ; বর্তমানে বিএনপি নেতা
৯. মোহাম্মদ আনিছুর রহমান (মানিক), গ্রাম মান্দাটিয়া, থানা : ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ
১০. আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম : কোনাবাড়ি, থানা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
১১. আলতাফ আলী, গ্রাম ত্রিশাল নামাপাড়া, থানা ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ
১২. হাজী আব্দুল হাই, গ্রাম ত্রিশাল উজান পাড়া, থানা ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ

১৩. আব্দুল মোতলেব, পিতা : মৃত হাতেম আলী মুন্সী, গ্রাম : ত্রিশাল নামাপাড়া, থানা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
১৪. আব্দুল ওয়াহাব, পিতা মৃত আঃ সামাদ সরকার, গ্রাম ত্রিশাল, থানা ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
১৫. হাসমত আলী, পিতা মৃত ফজর আলী, গ্রাম ত্রিশাল চরপাড়া, থানা ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
১৬. ইয়াকুব আলী, পিতা মৃত রজব আলী, গ্রাম ত্রিশাল চরপাড়া, থানা ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
১৭. আব্দুর রশিদ, পিতা মৃত রুস্তম আলী, গ্রাম ত্রিশাল চরপাড়া, থানা ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ
১৮. মৃত নওয়াব আলী সরকার, গ্রাম দূর্গাপুর, থানা ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ
১৯. মোহাম্মদ আনসার আলী, গ্রাম পোড়াবাড়ি, থানা ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ

[১৩]

৬৩. দিনাজপুর জেলা শান্তিকমিটি

১. এম.এ কাসে, অ্যাডভোকেট সভাপতি
২. সজিবুর রহমান, অ্যাডভোকেট, সহ সভাপতি
৩. মোঃ ফজলুল হক সাধারণ সম্পাদক
৪. এ. এস. রিয়াজুল ইসলাম দপ্তর সম্পাদক
৫. কে. জিলানী
৬. ডা. আব তাহের বধমালী, মসানা মতিউর রহমান খান
৭. মির্জা রুহুল আমিন
৮. নুরুল হক চৌধুরী
৯. মওলানা তমিজউদ্দীণ
১০. ওমর আলী, ডা. ইসমাইল, আলী
১১. খবিরদ্দীন, জালাল উকিল
১২. শামসুল মাস্টার
১৩. ইদ্রিস আলী
১৪. পজির মেম্বার
১৫. আকবর মেম্বার
১৬. মোঃ রউফ মিয়া
১৭. আঃ বারেক
১৮. ধদা মাহালিয়া
১৯. মুক্তারউদ্দিন

২০. মোবারক ডাক্তার
২১. আঃ রহিম
২২. বাজার মহাজন
২৩. আজিজুল হক
২৪. কসর আলী
২৫. মিজানুর রহমান
২৬. হাকিম বিশ্বাস
২৭. আঃ রহমান
২৮. ইব্রাহিম মুন্সি
২৯. আবু মুসা মণ্ডল।
[১৩]

৬৪. দিনাজপুর সদর থানা শান্তিকমিটি

১. এ. এস. রিয়াজুল ইসলাম সভাপতি
২. আবু তাহের বধমালী সাধারণ সম্পাদক
[১৩]

৬৫. দৌলতপুর শান্তিকমিটি, মানিকগঞ্জ, ঢাকা

১. শাহাদাৎ হোসাইন আহবায়ক

৬৬. দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তি ও কল্যাণ শান্তি পরিষদ, ঢাকা

১. সোলা সভাপতি
২. আবদুল মালিক সহ সভাপতি
৩. আবদুল মজিদ সহ সভাপতি
৪. আমির বক্স সাধারণ সম্পাদক

৬৭. দুর্গাপুর থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল

১. কিতাব আলী তালুকদার, গ্রাম : গুজিরকোনা, থানা : দুর্গাপুর
২. মৃত আলকাছ আলী মণ্ডল, গুজিরকোনা, থানা : দুর্গাপুর
৩. আমছর মেম্বর, জাগীরপাড়া, থানা : দুর্গাপুর
৪. মোক্তার মহিউদ্দিন মৃধা, থানা : দুর্গাপুর
৫. আব্দুল খালেক, থানা : দুর্গাপুর; ইদ্রিস মিয়া, থানা : দুর্গাপুর
৬. পিনু ভুঁইয়া, থানা : দুর্গাপুর
৭. মৃত শামছু মেম্বার, পুরাকান্দুলিয়া, থানা : দুর্গাপুর
৮. মৃত প্রতিক আলী, চেয়ারম্যান, থানা : দুর্গাপুর
৯. আব্দুর রশিদ, পুরাবান্দুলিয়া, থানা দুর্গাপুর
১০. মৌলভী আহসন আলী, খালিশাপুর, দুর্গাপুর
১১. আহম্মদ তালুকদার, জারিয়া, দুর্গাপুর
১২. কোবাদুজ্জামান খান হেলু মিয়া, জারিয়া, দুর্গাপুর

১৩. পিনু ভূঁইয়া, থানা : দুর্গাপুর, রুনু ভূঁইয়া, ঝানজাইল, থানা : দুর্গাপুর
১৪. মহীউদ্দিন মৃধা, দুর্গাপুর বাজার, থানা : দুর্গাপুর
১৫. ইদ্রিস চেয়ারম্যান, থানা : দুর্গাপুর
[১৩]

৬৮. নওগাঁ জেলা শান্তিকমিটি

১. লাহা প্রামাণিক
২. আহাদ উল্লাহ
৩. আহম্মদ উল্লাহ
[১৩]

৬৯. ১নং বারান্দীপাড়া পিস কমিটি, সদর, যশোর

[১৯৭১ সালের ৪ঠা মে'র সভায় ১২ সদস্যের যশোর সদর থানাধীন ১নং বারান্দীপাড়া পিস কমিটি গঠন করা হয়। জেলা পিস কমিটি ১৮ মে এই কমিটি অনুমোদন করেন। কমিটির সদস্য তালিকা নিচে দেয়া হলো।]

১.	এ. শাকুর	প্রেসিডেন্ট
২.	আবদুল হক	সেক্রেটারি
৩.	ইউসুফ গনি	সেক্রেটারি
৪.	জাফির উদ্দিন	ভাইস প্রেসিডেন্ট
৫.	কালিমুল হক	জয়েন্ট সেক্রেটারি
৬.	মোঃ ইজাজ	সদস্য
৭.	বাবু মিস্ত্রি	সদস্য
৮.	শেখ এ. হামীদ	সদস্য
৯.	হাবীবুর রহমান	সদস্য
১০.	আনিসুর রহমান	সদস্য
১১.	আব্দুর রউফ	সদস্য
১২.	শফি উদ্দিন	সদস্য

**** দ্রষ্টব্য** পরবর্তী এক সভায় জহুর, আজিজুল এবং ডা. সালাউদ্দিনকে এ কমিটিতে কো-অফ্‌ট করা হয়।
[১২]

৭০. নগরকান্দা থানা শান্তিকমিটি, ফরিদপুর

ফরিদপুরের নগরকান্দা থানা শান্তিকমিটির সদস্যরা ছিলেন-

১.	আবদুস সালাম (কাজী মৌলভী)	সভাপতি
২.	ওয়াহেদ সর্দার, দাঙ্গী ইউনিয়ন [পেশা কৃষিকাজ]	সদস্য
৩.	মকবুল খান, তালমা [পেশা কৃষিকাজ]	সদস্য

৪. মজিবর রহমান মিয়া, আটখর ইউনিয়ন]সদস্য
[পেশা কৃষিকাজ]
৫. আবুজাফর, পিতা, মৃত : হাতেম আলী সদস্য
[পেশা : ব্যবসা, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত]
৬. রুস্তম আলী খান, পিতা, মৃত : আব্দুল গণি খান, লস্কর দিয়া সদস্য
[পেশা : কৃষিকাজ]
৭. নাজিম মুন্সী, ভাওয়াল সদস্য
[পেশা : কৃষিকাজ]
৮. চাঁদ কাজী, পিতা : নুরুল হক, খাড়াদিয়া সদস্য
৯. খন্দকার বেলায়েত হোসেন, আইনপুর সদস্য
[পেশা : কৃষিকাজ]

[১৫]

৭১. নড়াইল জেলা শান্তিকমিটি

১. সলেমান, মওলানা সভাপতি

৭২. নন্দলালপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার তৎকালীন কুমারখালী থানার নন্দলালপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি-

১. ইসমাইল হোসেন, সদরপুর
২. মোফাজ্জেল হোসেন ক্ষানা, ছন্দা
৩. গোলাম সরোয়ার
৪. বাবর কবিরাজ, নন্দলালপুর

[১৮]

৭৩. নবীগঞ্জ শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ

১. আবু আবদুল্লাহ মোঃ ইসমাইল, মৌলানা আহবায়ক,
২. আব্দুর রহমান সদস্য সচিব,
৩. কাজী আবু ইউসুফ চৌধুরী সদস্য,
৪. আব্দুল লতিফ চৌধুরী সদস্য,
৫. মাশরুর খান সদস্য,
৬. সঞ্জব আলী সদস্য

[৮]

৭৪. নবীনগর থানা শান্তিকমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১. পিয়ারা মিয়া সভাপতি

[৩১]

৭৫. নলছিটি শান্তিকমিটি, বরিশাল

১. আমির গাজী সভাপতি

[৩২]

৭৬. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি, কুড়িগ্রাম

তৎকালীন কুড়িগ্রাম মহকুমার (জেলা :রংপুর) নাগেশ্বরী থানার শান্তিকমিটির যে তালিকা পাওয়া গেছে-

১.	আনসারী, নাগেশ্বরী কলেজের অধ্যক্ষ	চেয়ারম্যান
২.	উমর আলী আহমদ	ভাইস চেয়ারম্যান।
৩.	আদু খান	সদস্য।
৪.	নুরুল মোক্তার	সদস্য শান্তিকমিটি
৫.	শাহজাহান ব্যাপারী	সদস্য শান্তিকমিটি
৬.	আবদুল হক প্রধান	সদস্য শান্তিকমিটি
৭.	আছির আলী মিয়া	সদস্য শান্তিকমিটি
৮.	মাজহারুল ইসলাম	সদস্য শান্তিকমিটি
৯.	আসমত ব্যাপারী	সদস্য শান্তিকমিটি
১০.	গিয়াসউদ্দিন আহমেদ	সদস্য শান্তিকমিটি
১১.	আনসার মুন্সী	সদস্য শান্তিকমিটি
১২.	শামসুদ্দিন মণ্ডল	সদস্য শান্তিকমিটি
১৩.	হাবিবুর রহমান	সদস্য শান্তিকমিটি
১৪.	জসিমুদ্দিন	সদস্য শান্তিকমিটি
১৫.	লুৎফর রহমান খন্দকার	সদস্য শান্তিকমিটি
১৬.	রহিম উল্লা	সদস্য শান্তিকমিটি
১৭.	আহাম্মদ মোল্লা	সদস্য শান্তিকমিটি
১৮.	অদর দর্জি	সদস্য শান্তিকমিটি
১৯.	মতিয়ার রহমান (মওলানা)	সদস্য শান্তিকমিটি
২০.	খয়বর আলী	সদস্য শান্তিকমিটি
২১.	সৈয়দ	সদস্য শান্তিকমিটি
২২.	মকবুল হোসেন	সদস্য শান্তিকমিটি

[১৬]

*৭৭. নাটোর জেলা শান্তিকমিটি

১. মজিবর রহমান
২. আনোয়ারুল
৩. জলিল
৪. সহকারী কৃষি কেমিস্ট জামিল সিদ্দিকী
৫. ফোরম্যান হাজী আসগর আলী
৬. সহকারী প্রকৌশলী আনসারী

[১৩]

---

* নাটোর তখন মহকুমা। খুব সম্ভব এই ৬ জন সদর শান্তিকমিটির সদস্য ছিল।

৭৮. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি

১. কাঞ্চু উদ্দিন সভাপতি
২. আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক
৩. ইসমাঈল হক, পঞ্চগড়
৪. এসএম হালিম, সিও (ডেড), পঞ্চগড়
৫. এ. সামাদ, সিইউএস, পঞ্চগড়
৬. এইচএইচকে দাদ
৭. আবু আলম ইমাম মোহাম্মদ, পুলিশের সিআই, পঞ্চগড়
৮. লুৎফর রহমান, এমইউসি, অমরখানা
৯. খামির উদ্দিন প্রধান, এমইউসি, কাজলদিঘী
১০. তবিবুর রহমান, এমইউসি, পঞ্চগড়
১১. আবদুল হাই, এমইউসি, পঞ্চগড়
১২. এফ. করিম, পঞ্চগড়
১৩. মোজাম্মেল হক প্রধান
১৪. শেকুল ইসলাম চৌধুরী
১৫. আলতাফ হোসেন প্রধান
১৬. একে আজাদ
১৭. নাজির আহমেদ
১৮. সেময় আলী
১৯. মোস্তফা মওলানা
২০. কাসির উদ্দিন সরকার
২১. আবদুল আজিজ
২২. ইসহাক
২৩. আফাজউদ্দিন, যোগদায়েল
২৪. প্রমান আলী, ভিতরগড়
২৫. আনাজউদ্দিন, কুলুপাড়া
২৬. জামাল উদ্দিন, বড়শাহী
২৭. লেহাজউদ্দিন, ধাক্কামারা
২৮. আবেদিন আসেদ
২৯. শফিউল আলম
৩০. শফিউদ্দিন আহমদ, মাগুরা
৩১. ফায়েজ উদ্দিন
৩২. বাছের উদ্দিন আহমদ

[৫৩]

৭৯. নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন শান্তিকমিটি

১. গোদনাইল ইউসি-জনাব আলতাফ হোসেন।
২. হাজিগঞ্জ ইউসি-জনাব এম. এ. বাসেত
৩. খানপুর (পশ্চিম) জনাব লতিফ সরদার
৪. খানপুর ইউসি-জনাব সুলতান খান
৫. চাষাড়া ইউসি-জনাব গোলাম রব্বানী খান
৬. দেওভোগ ইউসি-জনাব জহির হোসেন
৭. নারায়ণগঞ্জ ইউসি-জনাব এস. এ. হালিম
৮. শীতলক্ষ্যা ইউসি-জনাব লাল মিয়া
৯. পাইকপাড়া ইউসি-জনাব আবদুল জলিল
১০. সোনাকন্দা ইউসি-জনাব ইসাক মিয়া
১১. বন্দর ইউসি-জনাব মোহাম্মদ আলী
১২. কদমরসুল ইউসি-আলহাজ্ব এ. লতিফ
১৩. নবীগঞ্জ ইউসি-জনাব মহিউদ্দিন আহমদ
১৪. ধামগড় ইউসি-জনাব (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল) আলহাজ্ব আবদুর রফিক

৮০. নোয়াখালি জেলা শান্তিকমিটি

১. সাইদুল হক, অ্যাডভোকেট সভাপতি

৮১. নান্দাইল থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

১. আব্দুল গফুর, ময়মনসিংহ
২. আঃ মতিন ভুঁইয়া, ময়মনসিংহ
৩. জসিমউদ্দিন ভুঁইয়া, ময়মনসিংহ
৪. শাহেদ আলী, ময়মনসিংহ
৫. আবদুল কুদ্দুস, ময়মনসিংহ
৬. আবদুল মন্নাফ, ময়মনসিংহ
৭. খোরশেদ খান, ময়মনসিংহ
৮. ইসমাইল হোসেন, ময়মনসিংহ
৯. সিদ্দিক, ময়মনসিংহ
১০. হাফিজউদ্দিন, ময়মনসিংহ
১১. খলিলুর রহমান, ময়মনসিংহ

* [খুব সম্ভব এটি থানা সদরের তালিকা]

[১৩]

৮২. নান্দাইল শান্তিকমিটি

ময়মনসিংহের তৎকালীন থানা, বর্তমানে উপজেলা নান্দাইল। সেখানকার শান্তি কমিটির সদস্যদের তালিকা ঠিকানাসহ (ইউনিয়নে) উল্লেখ করা হলো-

১. কাজী তসাদ্দক আলী, নান্দাইল সভাপতি
২. এ. এফ. এম. ইসহাক, নান্দাইল সহ-সভাপতি

৩.	আব্দুল গণি ভূঁইয়া, নান্দাইল	সম্পাদক
৪.	আব্দুল খালেক, ডাক্তার, নান্দাইল	সদস্য
৫.	আরিফ উদ্দিন আকন্দ, বেতাগৈর	সদস্য
৬.	ইব্রাহিম মাস্টার, নান্দাইল	সদস্য
৭.	মোবারক আলী, শেরপুর	সদস্য
৮.	মোয়াজ্জেম হোসেন সরকার, টাঙ্গাইল	সদস্য
৯.	ইয়াজজর সরকার, খারুয়া	সদস্য
১০.	আলী আকবর ভূঁইয়া, নান্দাইল	সদস্য
১১.	মোমতাজউদ্দিন ভূঁইয়া, রাজগাতি	সদস্য
১২.	লিলুর বাপ, নান্দাইল	সদস্য
১৩.	আবদুল্লাহ খান, আগারগাঁও	সদস্য
১৪.	হাসান আলী ফকির	সদস্য
১৫.	মোসলেম উদ্দিন, চণ্ডিপাশা	সদস্য
১৬.	আব্দুল হামিদ কোম্পানি, নান্দাইল	সদস্য
১৭.	কুতুবউদ্দিন খান, নান্দাইল	সদস্য
১৮.	মহব্বত আলী ভূঁইয়া	সদস্য

[২১]

৮৩. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর

১. মোঃ আঃ রহমান হাজী, পিতা হাছেন আলী, গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২. আকরামুজ্জামান, পিতা হাছেন আলী, গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩. আঃ মালেক, পিতা কাশেম আলী, গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৪. আঃ হান্নান, পিতা কাশেম আলী, গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫. আঃ হাই, পিতা কাশেম আলী, গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬. আঃ বারিক, পিতা : কাশেম আলী, গ্রাম : গোবিন্দনগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭. হাবিবউল্লাহ, পিতা হাজী শামছুদ্দিন (সুফী), গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮. মোতালেব, পিতা হাজী শামছুদ্দিন (সুফী), গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯. আবদুল্লাহ, পিতা হাজী শামছুদ্দিন (সুফী), গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০. আসাদুল্লাহ, পিতা : কাশেম আলী, গ্রাম : গোবিন্দনগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১. আঃ রাজ্জাক, পিতা মেহের আলী, গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর; আঃ রেজ্জাক, পিতা আঃ কাদির, গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১২. সিরাজ, পিতা খলিলুর রহমান, গ্রাম গোবিন্দনগর থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১৩. ইদ্রিস আলী, পিতা ছৈয়দ আলী, গ্রাম : গোন্দিনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১৪. রিয়াজ উদ্দিন, পিতা খলিলুর রহমান, গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১৫. মান্নান, পিতা নজর আলী, গ্রাম গোবিন্দনগর থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর;
১৬. আফছার আলী, পিতা আতাবদ্দিন, গ্রাম গোবিন্দনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১৭. রহিম গ্রাম : গোবিন্দনগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১৮. শিদ, গ্রাম : গোবিন্দনগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১৯. নুর মোহাম্মদ, পিতা আঃ হাকিম ডাক্তার, গ্রাম ছিটপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
২০. জামান উদ্দিন, পিতা আঃ হাকিম ডাক্তার, গ্রাম ছিটপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
২১. হুছেন আলী, পিতা আইনুদ্দিন মুন্সী, গ্রাম : ছিটপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
২২. জৈনদ্দিন (জনু), পিতা : তরু ফকির, গ্রাম ছিটপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
২৩. জমির উদ্দিন, পিতা আবুল হুসেন, গ্রাম ছিটপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
২৪. ছাত্তার, গ্রাম : ছিটপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর;
২৫. রজব আলী, গ্রাম : ছিটপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর;
২৬. ফজু, গ্রাম : ছিটপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর;
২৭. চাঁন মিয়া, গ্রাম : নামাছিটপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর;
২৮. মান্না, পিতা আবেদ আলী, গ্রাম নামাছিটপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
২৯. ছালাম, পিতা : শরাফত, গ্রাম : মোগানিয়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর;
৩০. কাদির পিতা : ছৈয়দ আলী, গ্রাম : মোগানিয়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩১. দুদু মিয়া, পিতা : শামছুদ্দিন ডাক্তার, গ্রাম : মোগানিয়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৩২. আজাদ, পিতা ছাবেদ আলী, গ্রাম মোগানিয়া , থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৩৩. শিদ, গ্রাম : মোগানিয়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৩৪. আক্কাছ আলী চেয়ারম্যান, পিতা : ছাবেদ আলী, গ্রাম মোগানিয়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৩৫. ইছব আলী মুন্সী, পিতা জৈধর আলী, গ্রাম মোগানিয়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৩৬. আঃ আজিজ, পিতা : মহর, গ্রাম : কাপাশিয়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর;
৩৭. আকবর আলী, পিতা আর মামুদ, গ্রাম বনপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৩৮. খায়রুল (খলিলুর), পিতা মহর আলী, গ্রাম কাপাশিয়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৩৯. অব্দুল গফুর, পিতা রহমত উল্লা, গ্রাম কাপাশিয়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪০. শামছদ্দিন, পিতা : ওছিমদ্দিন, গ্রাম : কাপাশিয়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪১. আবুল বাশার, পিতা আঃ আজি, গ্রাম কাপাশিয়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪২. শামছদ্দিন, পিতা নছিমউদ্দিন, গ্রাম কাপাশিয়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪৩. পাঞ্জর আলী, পিতা কাশেম আলী, গ্রাম বাথুরারকান্দা, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪৪. মালেক, পিতা ডিবু শেখ, গ্রাম বাথুরারকান্দা, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪৫. মোফাজ্জল ভেণ্ডার, পিতা সিরাজুল হক, গ্রাম বাইটকামারী, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪৬. জুলহাস উদ্দিন, পিতা মোহাম্মদ আলী, গ্রাম বাইটকামারী, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪৭. লতিফ, পিতা বছির উদ্দিন, গ্রাম বাইটকামারী, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪৮. আঃ রহমান, গ্রাম : কোন্নগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৪৯. হাশমত আলী, গ্রাম কোন্নাগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৫০. আনছারুল হক, পিতা মুনছুর আলী, গ্রাম কোন্নগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫১. আমীর আলী, পিতা : আহম্মদ আলী, গ্রাম : রানীগাঁও, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৫২. মনির, পিতা : জিন্নত আলী, গ্রাম : রানীগাঁও, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৫৩. বাতেন, পিতা : জিন্নত আলী, গ্রাম : রানীগাঁও, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৫৪. আঃ রহিম, পিতা   আহম্মদ আলী, গ্রাম   রানীগাঁও, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৫৫. আবু বকর, পিতা   আহম্মদ আলী, গ্রাম   রানীগাঁও, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৫৬. আবু সাঈদ, পিতা   আইনুদ্দিন, গ্রাম   রানীগাঁও, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৫৭. রইছদ্দিন বাইন্না, পিতা : আইনুদ্দিন, গ্রাম : কালিনগর, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৫৮. আঃ লতিফ, পিতা   আইনুদ্দিন, গ্রাম   কালিনগর, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৫৯. জামাল উদ্দিন, গ্রাম : কালিনগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬০. মোকাজ্জল হোসেন, গ্রাম : কালিনগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬১. হুসেন আলী, পিতা   চফুর উদ্দিন, গ্রাম   কালিনগর, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬২. আকিতুল্লা, পিতা   হাছেন আলী, গ্রাম   কালিনগর, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬৩. হাছেন আলী (কোচা), পিতা   সাহেব আলী, গ্রাম   কালিনগর, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬৪. হুরমুজ আলী, পিতা   নছর দেওয়ানী, গ্রাম   বাঘবেড় আখড়াপাড়া, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬৫. অহেদ আলী, পিতা   রহমত আলী, গ্রাম : শিমুলতলা, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬৬. নবী হুসেন, পিতা   জামাল উদ্দিন, গ্রাম   শিমুলতলা, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬৭. কালু, পিতা   মকবুল মেম্বার, গ্রাম   খালডাঙা, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর; কাজিমদ্দিন, গ্রাম : খালডাঙা, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬৮. আমজাত, পিতা   কপিল উদ্দিন, গ্রাম   চকপাড়া, থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৬৯. নুরা, গ্রাম : চকপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৭০. রফিজউদ্দিন দেওয়ান, পিতা   লালু মৃধা, গ্রাম   নালিতাবাড়ি বাজার থানা   নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭১. আজগর আলী খান, পিতা জোনাব আলী খান, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৭২. লিয়াকত, পিতা : ছয়ফল, গ্রাম নালিতাবাড়ি বাজার, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৭৩. শামছুল হক, গ্রাম : গেরাপচা, থানা : নালিতবাড়ি, শেরপুর
৭৪. আব্দুল করিম, পিতা : আশ্রাফ হাজী, গ্রাম গেরাপচা, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৭৫. দিল মামুদ, পিতা উমেদ আলী, গ্রাম ছালুয়াতলা, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৭৬. হাছেন আলী, পিতা বদন শেখ, গ্রাম সোহাগপুর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৭৭. তোফাজ্জল, পিতা কোরবান আলী, গ্রাম চকপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৭৮. আঃ কাদির, পিতা শরাফত আলী, গ্রাম কেন্দুয়াপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৭৯. গোলাম মোস্তফা, পিতা : রাইসউদ্দিন তালুকদার, গ্রাম : সোহাগপুর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮০. আঃ রহিম, পিতা : রিয়াজত আলী, গ্রাম : বারুয়াজানি, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮১. আঃ খালেক মাস্টার, পিতা আহমদ আলী, গ্রাম ঘাকপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮২. আমজত আলী, গ্রাম : খাইলারা, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮৩. মকবুল হোসেন, পিতা : ছামাদ আলী, গ্রাম : বেনুপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮৪. আঃ কুদ্দুছ, পিতা কুদ্রত আলী, গ্রাম বনকুড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮৫. রকিব, গ্রাম : বনকুড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮৬. কুদ্রত আলী, গ্রাম : বনকুড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮৭. ওসমান গণি, পিতা তনিসেখ, গ্রাম নন্নীউত্তর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮৮. ওলি মামুদ, পিতা কমরউদ্দিন, গ্রাম নিশ্চিন্তপুর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৮৯. বিশু মিয়া, গ্রাম বারমারী, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৯০. সুরুজ চৌকিদার, গ্রাম বারমারী, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৯১. আঃ কাদির, পিতা আঃ গফুর, গ্রাম : রাজনগর

৯২. আলেপ উদ্দিন, পিতা : রইছ উদ্দিন, গ্রাম : রাজনগর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৯৩. মকবুল হুসেন, পিতা কাশেম আলী, গ্রাম হাতীপাগার, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৯৪. কালু, পিতা ছফুর সরকার, গ্রাম বইগাইচাপুর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৯৫. ছফর উদ্দিন, পিতা : ওষন শেখ, গ্রাম : কেন্দুয়া পাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৯৬. তোফাজ্জল, পিতা শরাফত আলী, গ্রাম নয়ারিল, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৯৭. কাইয়ুম, পিতা মোতালেব মেম্বার, গ্রাম চাঁদগাঁও, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৯৮. নজরুল ইসলাম, পিতা : রুস্তম আলী, গ্রাম : চাঁদগাঁও, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
৯৯. মহির উদ্দিন, পিতা : কাছুম শেখ, গ্রাম : কেন্দুয়াপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০০. নারা, পিতা : ইব্রাহিম, গ্রাম : গুজাবুড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০১. নূর মোহাম্মদ, গ্রাম : বইগাচাপুর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০২. আলী, পিতা : লিলু, গ্রাম : বইগাচাপুর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০৩. ইনাতুল্লাহ, গ্রাম : বইগাচাপুর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০৪. আবুল কালাম আজাদ, পিতা শামছদ্দিন, গ্রাম বইগাছাপুর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০৫. আবুল ফজল (আংগুর), পিতা মোবারক উল্লাহ, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০৬. মোহাম্মদ হুসেন, পিতা আমানুল্লাহ হাজী, গ্রাম তারাগঞ্জ বাজার, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০৭. সিরাজ, পিতা আমানুল্লাহ হাজী, গ্রাম তারাগঞ্জ বাজার, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০৮. জোয়াদ আলী, গ্রাম : নন্নী নয়াপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১০৯. সোহরাব, গ্রাম : বারমারী, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১০. আঃ হক, গ্রাম : নন্নীউত্তর, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১১. জিয়ার উদ্দিন, গ্রাম : বন্দধারা, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১২. আহম্মদ আলী, পিতা : শহর আলী, গ্রাম : গুজাকুড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১৩. জয়নাল আবেদীন, পিতা আইনউদ্দিন, গ্রাম কয়ারপাড়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১৪. আঃ খালেক, পিতা নইমদ্দিন, গ্রাম : কয়ারপাড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১৫. কুদ্রত আলী, পিতা চৈয়দ আলী, গ্রাম : গুজাকুড়া, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১৬. হাবিলউদ্দিন, পিতা : নবাব আলী, গ্রাম : বাশকান্দা, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১৭. ছোহরাব আলী, পিতা আহম্মদ আলী, গ্রাম বাশকান্দা থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১৮. গারো, পিতা : বসু, গ্রাম : বাশকান্দা, থানা : নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১১৯. ময়জ উদ্দিন (৪ ভাই), পিতা মিরাজ আলী, গ্রাম মরিচপুরান, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১২০. আঃ আজিজ, পিতা আয়েন উদ্দিন, গ্রাম ভোগাইরপাড়, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১২১. সুরুজ আলী, পিতা হজরত আলী, গ্রাম ভোগাইরপাড় থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর
১২২. হাজী আব্দুর রহমান, নালিতাবাড়ি বাজার
১২৩. আজগর আলী খান, নালিতাবাড়ি শহীদ নাজমুল আহসান, পিতা মৃত সেকান্দার আলী : মৃত আহসান আলী, বারোয়াজানী
১২৪. আলী হোসেন, পিতা : আব্দুল মোতালেব

[১৩]

৮৪. নেত্রকোণার সদর শান্তিকমিটি

১. মঞ্জুরুল হক, প্রভাবশালী দালাল, মৌলানা
২. খোরশেদ আলী চৌধুরী
৩. ফজলুল করিম, প্রভাবশালী দালাল, মৌলানা
৪. ফজলুল করিম, মৌলানা, থানা : নেত্রকোণা
৫. আব্দুল খালেক, মৌলানা, মাস্টার, কুনিয়া, থানা : নেত্রকোণা
৬. আব্দুর রেজ্জাক, ডা. সুতারপুর, থানা : নেত্রকোণা
৭. খোরশেদ আলী চৌধুরী, সোনাজুর, নেত্রকোণা
৮. মৃত নূরুল আমিন মাস্টার, থানা : নেত্রকোণা সদর
৯. ফারুখ আহমেদ, থানা নেত্রকোণা সদর
১০. রিয়াজ উদ্দিন চেয়ারম্যান, বালি, থানা : নেত্রকোণা সদর
১১. আমীর আলী খান পাঠান, থানা : নেত্রকোণা সদর
১২. নোয়াব আলী আকন্দ, থানা : নেত্রকোণা সদর
১৩. নাবালক মিয়া, মদনপুর, থানা নেত্রকোণা সদর
১৪. মৃত অছিম উদ্দিন শেখ, আরামবাগ, থানা : নেত্রকোণা সদর

১৫. শেখ নজমুল হোসেন, নেত্রকোণা শহর থানা : নেত্রকোণা
১৬. মৃত মওলানা মিয়া, অজহর রোড, থানা : নেত্রকোণা
১৭. আঞ্জু মৌলানা
[১৩]

৮৫. নোয়াখালী জেলা শান্তিকমিটি

১. ফজলে আজিম
২. আব্দুর রব
৩. দুরবেশ
[১৩]

৮৬. পটুয়াখালী জেলা শান্তিকমিটি

১. মশু মিয়া
২. মহিউদ্দিন
৩. আলাউদ্দীন সিকদার।
[১৩]

৮৭. পাঁচ বিবি থানা শান্তিকমিটি, রংপুর

১.	রোস্তম আলী, ডা. মুসলিমলীগ নেতা	সভাপতি
২.	কাসেম উদ্দিন চৌধুরী	ব্যবসায়ী সম্পাদক

[১৭]

৮৮. পাবনা জেলা শান্তিকমিটি

১. এস. এ. এম. জায়েদী ক্যাপ্টেন (আহবায়ক) চেয়ারম্যান

৮৯. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য

১.	আব্দুস সোবহান, মওলানা	শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান	পাবনা
২.	খোদা বক্স্ খান, মওলানা	শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান	ঈশ্বরদী
৩.	আব্দুর রাজ্জাক মিঞা	শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান	বেড়া
৪.	আব্দুল গফুর	শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান	ফরিদপুর
৫.	ময়েন উদ্দীন	শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান	চাটমোহর
৬.	মো. বন্দে আলী মিঞা	শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান	ভাঁড়ালা
৭.	মো. নুরুজ্জামান	শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান	চাটমোহর
৮.	আতাউর রহমান, মওলান	শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান	দাশুড়িয়া
৯.	ইসহাক আলী খান	শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান	মুলাডুলী
১০.	মো. নুরু মিঞা	শান্তিকমিটির সদস্য	বেড়া
১১.	এন্তাজ আলী, হাজী	শান্তিকমিটির সদস্য	বেড়া
১২.	কফিল উদ্দীন, ডাক্তার	শান্তিকমিটির সদস্য	ভাঁড়ালা
১৩.	আব্দুল ওহাব, শিক্ষক	শান্তিকমিটির সদস্য	বেড়া

১৪. মো. মফিজ উদ্দীন	শান্তিকমিটির সদস্য	বেড়া
১৫. মো. আসাদ আলী	শান্তিকমিটির সদস্য	বেড়া
১৬. মো. মোজাম্মেল হক	শান্তিকমিটির সদস্য	ফরিদপুর
১৭. নাছির উদ্দিন, মওলানা	শান্তিকমিটির সদস্য	ঈশ্বরদী
১৮. ইসমাইল, মওলানা	শান্তিকমিটির সদস্য	ঈশ্বরদী
১৯. মো. নতুব আলী শেখ	শান্তিকমিটির সদস্য	ভাঁড়ালা
২০. মো. মজিবুল হব কিরমানী	শান্তিকমিটির সদস্য	ভাঁড়ালা

[৪]

৯০. পার্বতীপুর থানা শান্তিকমিটি

১. নঈম কাজী — সভাপাতি

[৩৩]

৯১. পাল্টি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার তৎকালীন কুমারখালী থানার পাল্টি ইউনিয়ন শান্তিকমিটিতে যারা ছিলেন-

১. খিলাফত হোসেন	সভাপতি
২. রজব আলী	সদস্য
৩. রুস্তম আলী	সদস্য
৪. শফিউদ্দিন	সদস্য
৫. কুতুবউদ্দিন	সদস্য
৬. শহিদুল ইসলাম ঝন্টু	সদস্য
৭. জোনাব আলী	সদস্য

৯২. পিরোজপুর জেলা শান্তিকমিটি

১. মানিক খন্দকার
২. আশরাফ আলী শিকদার
৩. হারুন
৪. হামিদ জমাদার
৫. মোসলেম খাঁ, হামিদ মজুমদার
৬. শুকুর মৃধা
৭. সরদার সুলতান মাহমুদ
৮. ইসমাইল হোসেন
৯. অ্যাডভোকেট আজিজ মল্লিক
১০. সালেহ আহমেদ
১১. ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন
১২. মান্নান
১৩. আশ্রাব আলী শিকদার
১৪. আজিজুল হক মোক্তার

১৫. দেলোয়ার হোসেন সাঈদী
১৬. শর্ষিণার পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ
১৭. মওলানা আব্দুর রহীম
[১৩]

৯৩. পাটাভোগ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. আব্দুল মান্না — আহবায়ক

৯৪. পিরোজপুর মহকুমা শান্তিকমিটি

১. খানবাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল — সভাপতি

৯৫. পিস কমিটি, যশোর

[১৯৭১ সালের ২৮ এপ্রিল সকাল ১০টায় যশোর জেলা শান্তি (পিস) কমিটির এক সভা যশোর কালেক্টরেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শান্তিকমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট সৈয়দ শামছুর রহমান।

সভায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের মনোবল বৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য আলোচনা করা হয়। একই সাথে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সভায় অপর এক প্রস্তাবে জরুরীভিত্তিতে মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম, শহর এবং সকল মহল্লায় দ্রুত শান্তি (পিস) কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যেককে কাজ করার কথা বলা হয়। এ সভায় কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়।]

কমিটি নিম্নরূপ :

পুনর্গঠন এবং সমন্বয় কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. এ এম বদরুল আলা—কনভেনর
২. আব্দুল কাইয়ুম মল্লিক
৩. হারেস উদ্দীন আহমেদ
৪. মোঃ রফিউদ্দীন
৫. ডা. ইসমাঈল
৬. মোঃ কামরুদ্দীন
৭. এস.এম.এ আহাদ
৮. জালাল উদ্দীন আকবর
৯. এস.জি. মোস্তফা
১০. আব্দুল মজিদ খান
১১. আমজাদ হোসেন
১২. এন.এ. চৌধুরী
১৩. শামছুর রহমান ওরফে খোকা মিয়া
১৪. সৈয়দ শামছুর রহমান

১৫. আর হক
১৬. নাজিম উদ্দীন আজাদ
১৭. মোঃ হোসেন
১৮. জেলা মৎস্য অফিসার

ডিফেন্স কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. এস জি মোস্তফা—কনভেনর
২. বারীউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
৩. আব্দুল আজিজ
৪. সৈয়দ খান
৫. আনোয়ার খান
৬. নিসার আহমেদ
৭. মল্লীক নেয়াদুল হক
৮. ফজলুর রহমান
৯. কাজী নুরুল হাসান
১০. আব্দুর রশীদ
১১. আতা করিম
১২. ডা. সোলেমান ভাই
১৩. গোলাম রসুল
১৪. ইয়ার আলী
১৫. আব্দুর রহমান
১৬. আব্দুল মাজেদ
১৭. শামছুল হুদা
১৮. মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ
১৯. শেখ সিরাজ
২০. মোঃ শাকীর
২১. ইলিয়াস
২২. আমজাদ হোসেন
২৩. জালাল উদ্দীন আকবর
২৪. সুলতান আহমেদ
২৫. ফিরোজ সিদ্দিক
২৬. এ. রউফ
২৭. হাসান ইমাম
২৮. মোঃ শরীফ
২৯. আব্দুল কাইয়ুম মল্লীক
৩০. হারেজ উদ্দীন আহমেদ

৩১. আবুল কাসেম
৩২. ডা. মোঃ ইসমাইল
৩৩. মোঃ আইউব

সন্ত্রাস দমন কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. রাশেদ আহমেদ চৌধুরী—কনভেনর
২. মোঃ আইউব
৩. জালাল উদ্দীন আকবর
৪. আব্দুল কাইয়ুম মল্লিক
৫. আতা করিম
৬. এ. ওহাব
৭. মোঃ রফিউদ্দীন
৮. কাজী নুরুল ইসলাম
৯. আলা উদ্দীন
১০. ডা. মাসুদুর রহমান
১১. আব্দুস সামাদ
১২. কফিল উদ্দীন আহমেদ
১৩. মহিউদ্দীন
১৪. মির্জা মো. আলী
১৫. মোঃ শামছুর রহমান
১৬. আব্দুল ওয়াহীদ
১৭. মশিউল আযম খান
১৮. ডা. আব্দুস সাত্তার
১৯. হারেজ উদ্দীন আহমেদ
২০. মতিউর রহমান খান
২১. ডা. নিসার আহমেদ
২২. মুন্সী আমিরুল্লাহ
২৩. মোঃ মোস্তফা
২৪. শামছুদ্দিন
২৫. সোলেমান হোসেন
২৬. কাফিল উদ্দীন গাজী
২৭. সলিমুল্লাহ খান
২৮. ইমদাদুল ইসলাম চৌধুরী
২৯. আজিজুর রব খান
৩০. তরিকুল আলম
৩১. মোঃ জুনায়েত
৩২. মোঃ ইয়া সায়েম

আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. মোঃ আব্দুল কাইয়ুম মল্লিক
২. এস.জি. মোস্তফা
৩. এম. শামসুল হুদা
৪. নাজিমুদ্দীন আল আজাদ
৫. মাসুদুর রহমান, ডা.
৬. সৈয়দ শামসুর রহমান
৭. এ. রাজ্জাক, ডা.
৮. শেখ মাহবুবুর রহমান
৯. মোঃ আইয়ুব
১০. মোঃ হানিফ
১১. আবুল কাশেম
১২. জালাল উদ্দীন আকবর
১৩. রফি উদ্দিন
১৪. হারেজ উদ্দিন
১৫. আতা করিম
১৬. আমজাদ হোসেন
১৭. ইসমাইল সরদার
১৮. এ.এম. বদরুল আলা
১৯. আব্দুল হক
২০. আজিজুর রব খান
২১. মোঃ ইসমাইল, ডা.
২২. সোলেমান হাসান
২৩. হাসান ইমাম
২৪. নিসার আহমেদ, ডা.
২৫. ফিরোজ সিদ্দিক

শহর কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

[এই "শহর কমিটি, যশোর" গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ২৮ এপ্রিল এবং অবশ্য ১৯৭১ সালের ১০ আগস্ট "টাউন পিস কমিটি (টিপিটি)" পুনর্গঠিত হয়। দ্র. 'যশোর টাউন পিস কমিটি, সদর']

১. এস.জি. মোস্তফা—প্রেসিডেন্ট
২. আবুল কাসেম—ভাইস প্রেসিডেন্ট
৩. আব্দুর রশিদ—ভাইস প্রেসিডেন্ট
৪. জালাল উদ্দিন আক্তার—সম্পাদক

৫. এ. রাজ্জাক, ডা.—সহকারী সম্পাদক
৬. শামছুর রহমান ওরফে খোকা মিয়া—সহকারী সম্পাদক
৭. আব্দুর রহমান
৮. কাজি সিরাজুল ইসলাম
৯. কাজি নুরুল ইসলাম
১০. শামছুদ্দিন আহমেদ
১১. শেখ হাফিজুল্লাহ
১২. গোলাম রসূল
১৩. সগীর আহমেদ
১৪. মো. মোস্তফা
১৫. রফিকুল ইসলাম
১৬. মোঃ হানিফ
১৭. মোঃ শরীফ
১৮. মোঃ আইয়ুব
১৯. ইসমাইল সরদার
২০. হাবীব চৌধুরী
২১. তারিকুল আলম
২২. ফজলুর রহমান
২৩. শরিফুদ্দিন আহমেদ
২৪. হাসনাইন
২৫. আব্দুল মজিদ খান
২৬. শেখ হাসান আলী
২৭. মোঃ মুসা
২৮. সোলায়মান-বারান্দী
২৯. রফিউদ্দিন চৌধুরী
৩০. কাসেদ আলী আনসারি
৩১. সুলতান আহমেদ -উপশহর
৩২. নিজাম উদ্দিন -উপশহর
৩৩. শামীম উদ্দিন -উপশহর
৩৪. ফিরোজ সিদ্দিক -উপশহর
৩৫. শামছুল হক
৩৬. এম.এ. ওহাব, অ্যাডভোকেট
৩৭. রেজানুল হক, অ্যাডভোকেট
৩৮. জয়নাল আবেদীন, অ্যাডভোকেট
৩৯. সগীর আহমেদ, অ্যাডভোকেট

৪০. ইমদাদুল ইসলাম চৌধুরী
৪১. আতা করিম
৪২. মোঃ সগীর
৪৩. আব্দুল কাইয়ুম মল্লিক
৪৪. মোঃ ইউসুফ
৪৫. কামরুদ্দিন
৪৬. হাবীবুর রহমান খান
৪৭. অ্যাডভোকেট আজিজুর রব খান
৪৮. শেখ যাবিউল্লাহ
৪৯. গোলাম সিদ্দিক
৫০. মোঃ হুসাইন
৫১. আব্দুর রশিদ
৫২. শামছুর রহমান ,' মওলানা'
৫৩. শামছুদ্দিন তরফদার
৫৪. এ.এম.বদরুল আলা
৫৫. মোঃ শাফিউদ্দিন
৫৬. নিজাম হোসেন খান
৫৭. নাজির আহমেদ-উপশহর
৫৮. নুর মোহাম্মদ
৫৯. মোঃ ইয়াকুব
৬০. রাইত আলী
৬১. মাসুদুর রহমান, ডা.
৬২. এ সাত্তার ডা.
৬৩. এ লতিফ, ডা.
৬৪. শেখ মাহবুবুর রহমান
৬৫. রেজাউল হক, অ্যাডভোকেট
৬৬. আব্দুস সালাম
৬৭. আকরাম আলী
৬৮. আমজাদ হোসাইন
৬৯. মো. আইয়ুব
৭০. নুর মোহাম্মদ মল্লিক
৭১. আতিয়ার রহমান
৭২. আলাউদ্দীন খান
৭৩. আতাউর রহমান ঝন্টু

অর্থ কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. মোঃ হোসাইন—কনভেনর
২. এস এম এ আহাদ
৩. মমতাজুল করিম
৪. মোয়াজ্জেম হোসাইন খান
৫. মোহাম্মদ কমরুদ্দীন
৬. আবদুর রশীদ
৭. নাজিমউদ্দীন
৮. আব্দুল মাজেদ খান
৯. নুর মোহাম্মদ
১০. সোলেমান ভাই
১১. আলা উদ্দিন
১২. এ.এম.বদরুল আলা
১৩. কে.এ. নোমানি
১৪. মোস্তাক আহমেদ রেজা
১৫. মহিউদ্দিন (দাদা ভাই)
১৬. হাবীব চৌধুরী
১৭. রাজ্জাক ভাই
১৮. মোহাম্মদ সোনাউল্লাহ
১৯. মোহাম্মদ ইয়াসিন
২০. জি.এম. হোসেন
২১. আবীদ হুসাইন

কৃষি উন্নয়ন কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. মোহাম্মদ রফি উদ্দিন—কনভেনর
২. আবুল কুসুম
৩. শামসুদ্দিন আহমদ (শংকরপুর)
৪. এ. সামাদ
৫. আব্দুর রশিদ
৬. সাহেদ আলী আনসার
৭. মো. ইব্রাহীম, ডা.
৮. জালাল উদ্দিন আহমেদ
৯. ওয়ালিউল হক
১০. মশিউদ্দিন
১১. ফিরোজ সিদ্দিক

১২. শেখ মাহবুবুর রহমান
১৩. ইসহাক আলী বিশ্বাস
১৪. মোহাম্মদ ইসহাক, ডা.
১৫. সাবির আহম্মেদ
১৬. ফাইজুল হক
১৭. মুন্সি মোহাম্মদ আলী
১৮. তাজিমুদ্দিন মুন্সি
১৯. শেখ এরশাদ আলী
২০. এম.এ. সালাম

ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. আব্দুল মাজেদ খান—সমন্বয়কারী
২. মোহাম্মদ হুসাইন-সহকারী সমন্বয়কারী
৩. মোহাম্মদ ইসমাইল, ডা.
৪. মহিউদ্দীন
৫. কাজি নাসরুল হক
৬. মোজ্জাম হুসাইন খান
৭. আব্দুস সামাদ
৮. তবিবুর রহমান খান (নাভারণ)
৯. মাহবুবুর রহমান (বারোবাজার)
১০. আব্দুল্লা মুন্সি (কেশবপুর)
১১. সোরাব মোল্লা (বাঘারপাড়া)
১২. আমিনুর রহমান
১৩. নুর মোহাম্মদ
১৪. আমজাদ হুসাইন
১৫. মোফাজ্জার হুসাইন (আমদাবাজার)
১৬. রাকিবুদ্দিন আহমদ
১৭. আজিজুর রব খান
১৮. আতিউর রহমান ঝন্টু

মৎস্য উন্নয়ন কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. জেলা মৎস্য অফিসার—কনভেনর
২. আলহাজ কুনু মিয়া
৩. মোজাফফর হুসাইন
৪. আব্দুল মাজেদ খান
৫. আব্দুর রহমান

৬. ডা. আব্দুল লতিফ
৭. মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন
৮. আব্দুল হাসেম
৯. আকরাম আলী
১০. মোহাম্মদ হুসাইন
১১. ডা. মোহাম্মদ ইসহাক
১২. আবুল কাসেম মুক্তার
১৩. অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন
১৪. অ্যাডভোকেট রেজাউল হক
১৫. ডা. আব্দুস সাত্তার

পরিবহন এবং যোগাযোগ কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. মোহাম্মদ কামরুদ্দিন—কনভেনর
২. মোহাম্মদ ইয়াকুব
৩. এস. শামসুল হুদা
৪. এ.এম. বদরুল আলা
৫. এস.জি মোস্তফা
৬. মোহাম্মদ আতিয়ার রহমান
৭. মোহাম্মদ আইয়ুব
৮. কাজী নুরুল ইসলাম
৯. মোহাম্মদ মুসা
১০. নিহাল আহমেদ
১১. মোহাম্মদ সফি
১২. কাজী সিরাজুল হক
১৩. মোহাম্মদ ইয়াসিন
১৪. আব্দুল কাদের মৃধা
১৫. জয়নাল সিদ্দিকী
১৬. হাফিজ বদরুজ্জামান
১৭. হামিদ হুসাইন
১৮. জিয়ার মোহাম্মদ
১৯. পান্নু আমিরুল্লাহ
২০. আকবর আলী মোল্লা
২১. এম. শামছুর রহমান (খোকা মিয়া)
২২. আবুল কাসেম মল্লিক
২৩. এম. হাসান

২৪. মোস্তাক আহমেদ রেজা

প্রচার কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. হারেজ উদ্দিন আহম্মেদ—কনভেনর
২. সাবির আহম্মেদ—সহকারী কনভেনর
৩. মওলানা শামসুর রহমান
৪. শেখ হাসান আলী
৫. আব্দুর রশিদ (চশমা দোকান মালিক)
৬. হাফিজুল্লাহ
৭. শেখ সিরাজ
৮. এম.এ. ওহাব
৯. জয়নাল আবেদীন
১০. আব্দুল মজিদ (ড্রেস কো)
১১. নাজিম উদ্দিন আল আজাদ
১২. মো. নূর হোসাইন
১৩. হাজী বদরুদ্দিন
১৪. আব্দুল গফফার
১৫. মোঃ সাব্বির
১৬. সিরাজুল হক
১৭. আমজাদ হোসেন
১৮. সুলতান আহমেদ
১৯. ওয়ালী আহমেদ

ত্রাণ ও পূনর্বাসন কমিটি, পিস কমিটি, যশোর

১. ডা. মোহাম্মদ ইসমাইল
২. আব্দুর রশিদ
৩. আব্দুর রশিদ (চশমা দোকান মালিক)
৪. ডা. এম.আর. লতিফ
৫. ডা. আব্দুর রাজ্জাক
৬. সাগীর আহমেদ
৭. শেখ হাফিজুল্লাহ
৮. মোহাম্মদ রফিউদ্দিন
৯. মোহাম্মদ কামরুদ্দিন
১০. মোহাম্মদ হারেজ উদ্দিন
১১. মোহাম্মদ হানিফ
১২. ডা. মাসুদুর রহমান

১৩. সুলতান আহমেদ
১৪. মওলানা শামসুর রহমান
১৫. মুন্সি আমানউল্লাহ
১৬. নিজামুল হক
১৭. জিএম হাসনাইন
১৮. শেখ আব্দুল্লাহ
১৯. ইমদাদুল ইসলাম চৌধুরী
২০. নবীবুর রহমান খান
২১. মতিউর রহমান খান

**** দ্রষ্টব্য** ১২টি কমিটির এই তালিকা চূড়ান্ত করে তাতে স্বাক্ষর করেন জেলা পিস কমিটির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সৈয়দ শামসুর রহমান।

যশোরে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পরিচয়পত্র ইস্যু করতেন :

১. যশোর জেলা পিস কমিটির চেয়ারম্যান
২. জেলা পিস কমিটির সহ-সভাপতি (১নং)
৩. জেলা পিস কমিটির সাধারণ সম্পাদক
৪. টাউন পিস কমিটির চেয়ারম্যান এবং
৫. টাউন পিস কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

**** দ্রষ্টব্য-১** ১৯৭১ সালের ১৮ জুন যশোর জেলা পিস কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ শামসুর রহমান জেলা পিস কমিটির সাধারণ সম্পাদককে এক লিখিত চিঠিতে যশোরের বিহারী হিসেবে নাম অর্ন্তভুক্ত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের নাম পাঠানোর অনুরোধ জানায়। ওই তালিকার অনুলিপি মার্শাল ল' হেড কোয়াটারে পাঠানোর জন্যও বলা হয়।

**** দ্রষ্টব্য-২** বারান্দীপাড়া পিস কমিটির সভাপতি ১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট টাউন পিস কমিটির মাধ্যমে ডেপুটি সাব মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্টেটররের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে বলা হয় ঢাকা ব্রিজ ও আশপাশের লোকজনের জানমালের নিরাপত্তার জন্য শুধুমাত্র লাঠি দিয়ে মুক্তি বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই পিস কমিটির কাছে কিছু অস্ত্র ও পাঠানোর কথা বলা হয়। চিঠিতে আরো বলা হয় কোতোয়ালি থানার ওসি ইতোমধ্যে ১৫টি রাইফেল বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করেছে।

**** দ্রষ্টব্য-৩** ১৯৭১ এর ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক(সদর) এর অফিস কক্ষে এলটমেন্ট কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মহকুমা প্রশাসক। সভায় উপস্থিত সদস্যরা হল, অ্যাডভোকেট সৈয়দ শামসুর রহমান, ডা. মাসুদুর রহমান, আমজাদ হোসেন, মো.কমর উদ্দিন, শেখ আব্দুলা্লহ ও আলহাজ্ব মেজবা উদ্দিন আহমেদ।

এই সভায় নগদ অর্থ, গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি ও ভোকেশনাল গ্রান্ট বাবদ ১ লাখ ৯১ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির কনভেনর ছিল ডা. মাসুদুর রহমান। সদস্য ছিল ৪ জন। এরা হলো পৌর পিস কমিটিরি ভাইস-চেয়ারম্যান **এস জি মোস্তফা,** জেলা পিস কমিটির সম্পাদক **আমজাদ হোসেন সাব্বির** ও টাউন পিস কমিটির সভাপতি **কমর উদ্দিন**।
[১২]

৯৬. পুরাতন কসবা ও ঘোপ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, সদর, যশোর

১.	শামসুল হুদা	ঘোপ	চেয়ারম্যান
২.	সৈয়দ আলী ইমাম	ঘোপ	
৩.	বদরুদ্দীন আহমেদ	ঘোপ	ভাইস-চেয়ারম্যান
৪.	ডা. মাহবুবুর রহমান	ঘোপ	জয়েন্ট সেক্রেটারি
৫.	মীর্জা আহমেদ বেগ	ঘোপ	
৬.	আব্দুর রউফ	ঘোপ	
৭.	কামরুজ্জামান	ঘোপ	
৮.	আতিয়ার রসূল বিএল	ঘোপ	
৯.	মাহবুব সোবহানী	ঘোপ	
১০.	নিজামউদ্দিন হাওলাদার	ঘোপ	
১১.	কাজী নুরুল ইসলাম	পুরাতন কসবা	
১২.	রফিকুল ইসলাম	পুরাতন কসবা	জয়েন্ট সেক্রেটারি
১৩.	শামছুদ্দিন তরাফদার	পুরাতন কসবা	
১৪.	কে.জি. মোস্তফা এল.এল.বি	পুরাতন কসবা	ভাইস-চেয়ারম্যান
১৫.	কাজী মল্লীক এল.এল.বি	পুরাতন কসবা	ভাইস-চেয়ারম্যান
১৬.	আবুল কাসেম	পুরাতন কসবা	
১৭.	ইসহাক (অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ)	পুরাতন কসবা	
১৮.	এ. রাজ্জাক	পুরাতন কসবা	
১৯.	ফজলুর রহমান	পুরাতন কসবা	
২০.	মীর রহমত আলী	পুরাতন কসবা	
২১.	এসএম হাসনাইন	আহমাদাবাদ কলোনি	
২২.	শরফুদ্দীন আহমেদ	পুরাতন কসবা	
২৩.	এস.কে.এ. জব্বার	পুরাতন কসবা	
২৪.	বেগম আয়শা সরদার	পুরাতন কসবা	
২৫.	মমতাজ উদ্দিন	খাদেম কারবালা	

২৬. কিউ.এস.হক	পুরাতন কসবা	সেক্রেটারি
২৭. জাকিউল্লাহ খান	পুরাতন কসবা	
২৮. আমির হুসাইন	পুরাতন কসবা	

[*দ্র : ইউনিয়ন ও মহল্লা পিস কমিটি, যশোর*। ১৯৭১সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের এক সভায় ইউনিয়ন এবং মহল্লা পিস কমিটি গঠন সংক্রান্ত আলোচনা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে যশোর সদরের পুরাতন কসবা ও ঘোপ এলাকার গঠিত দু'টি মহল্লা কমিটির সদস্যদের নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল।]

[১২]

৯৭. পুরাতন কসবা মহল্লা শান্তিকমিটি, সদর, যশোর

১. কাজী নুরুল ইসলাম	
২. রফিকুল ইসলাম	সেক্রেটারি
৩. শামছুদ্দিন তরফদার	
৪. কে.জি. মোস্তফা এল.এল.বি	
৫. কিউ. মল্লীক	
৬. আবুল কাসেম	
৭. ইসহাক (অবসরপ্রাপ্ত এস.আই.পুলিশ)	
৮. এ. রাজ্জাক	
৯. ফজলুর রহমান	
১০. রহমত আলী	
১১. এসএম হাসনাইন	জয়েন্ট সেক্রেটারি
১২. শরাফুদ্দিন আহমেদ	
১৩. শেখ.এ. জব্বার	
১৪. বেগম আয়শা সরদার	
১৫. মমতাজ উদ্দিন খাদেম, কারবালা	
১৬. কিউএস হক	ভাইস চেয়ারম্যান
১৭. আবদুর রাজ্জাক মিয়া, ঢাকারোড	
১৮. আলী আহমেদ	
১৯. ইদ্রিস আলী	
২০. আমীর হুসাইন	চেয়ারম্যান
২১. জহির উদ্দিন	আহমাদাবাদ কলোনি
২২. ওয়ালী খান	পালবাড়ী
২৩. আব্দুর রহমান	পাদুকা ভবন

২৪. শেখ সাকবুল আহমাদাবাদ কলোনি
২৫. রুহুল আমিন আহমাদাবাদ কলোনি
২৬. জাকি উল্লাহ খান আহমাদাবাদ কলোনি—ভাইস চেয়ারম্যান
২৭. সিদ্দিক খান আহমাদাবাদ কলোনি

**** দ্রষ্টব্য :** শহর পিস কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ কমরুদ্দীন ১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট এ কমিটি অনুমোদন করেন। সভায় কমিটির সদস্যদের নিজ এলাকার শান্তি রক্ষার এবং 'অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের' কাছ হতে দেশ (পাকিস্তান) রক্ষার জন্য সবসময় সশস্ত্র সৈন্যদল (পাকিস্তানি) কে চাওয়া মাত্রই সাহায্য করার দাবি জানানো হয়।

[১২]

৯৮. পূর্বধলা থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল

১. বশির আকন্দ, পূর্বধলা
২. শরাফ উদ্দিন, পূর্বধলা
৩. আব্দুল মান্নান কুলু, পূর্বধলা
৪. মৌলভী ফজলুল হক, খরিশাপুর, পূর্বদলা
৫. মৌলভী আহম্মদ আলী, দামপাড়া, পূর্বধলা
৬. আদম আলী মীর, গোলা, পূর্বধলা

[১৩]

৯৯. ফরিদপুর জেলা শান্তি ও কল্যাণ পরিষদ

১. এরাজউদ্দিন, গোসাইর হাট, প্রাক্তন
২. এম.পি.এ চেয়ারম্যান
৩. বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের ভাইস চেয়ারম্যান

১০০. ফরিদপুর জেলা শান্তিকমিটি

১. আফজাল হোসেন আজাদী আহ্বায়ক
২. কাজী ইমদাদুল হক, ভাংগা, ফরিদপুর
৩. আবুল কালাম আহাদ বাচ্চু,
৪. আফজাল উদ্দিন, উকিল
৫. মুসা বিন শমসের
৬. খিদির খাঁ
৭. নান্নু, বদু
৮. বিনয়
৯. চন্দ
১০. কানা হাসি

১১. খোকন, নগরকান্দা, ফরিদপুর
১২. ডা. হামিদি
১৩. আলাউদ্দিন
১৪. ময়েজ উদ্দিন

[১৩]

১০১. ফতুল্যা থানা শান্তিকমিটি, নারায়ণগঞ্জ

১. বন্দে আলী মিয়া, হাজি আহবায়ক

১০২. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

১. আবুল চেয়ারম্যান, বাশাটি, ১ নং ছনধরা ইউনিয়ন, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২. শুকুরন, বাশাটি, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩. কফিল উদ্দিন, ছনধরা, ফুলপুর, ময়শনসিংহ
৪. আরমান, ছনধরা, ফুলপুর, ময়শনসিংহ
৫. বংগা, ছনধরা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৬. খলির, ছনধরা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৭. আব্দুল হান্নান, ছনধরা, ফুলপুর, ময়শনসিংহ
৮. আহম্মদ আলী, সাং : লাউয়ারী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৯. আমছর উদ্দিন, ছনধর, থানা ফুলপুর, ময়মনসিংহ
১০. আজিম উদ্দিন, লাউয়ারী, ফুলপুল, ময়মনসিংহ
১১. একেএম শামসুল হুদা সুরুজ মিয়া (মৃত), গোদারিয়া স্পেশাল কমান্ডার
১২. একেএম রফিকুল হুদা, মুন মিয়া (মৃত), গোদারিয়া
১৩. জবেদ ফকির, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
১৪. আঃ রশিদ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
১৫. আঃ আজিজ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
১৬. আঃ আজিজ সরকার, রূপসী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
১৭. হারেজ আলী, পুলিশ, ফুলপুর থানা, ফুলপুর, ময়মনিসংহ
১৮. আবু বক্কর, ফুলপুর, ময়মনিসংহ
১৯. আঃ মোতালেব, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২০. আনসার মোতালেব, কাকনী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২১. মৃত আইয়ুব আলী, বাঁশটি, দালাল আইনে মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২২. এরশাদ উল্লাহ, মওলানা ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২৩. আবুল কাশেম, মওলানা বালিয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২৪. আবুল কাশেম, কাতুলী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২৫. ওমর আলী খাঁ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ

২৬. রফিক উদ্দিন, ফুলপুর, অধ্যাপক ময়মনসিংহ
২৭. দৌলত আলী (মৃত), মওলানা ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২৮. বশিরউদ্দীন ওরফে (বশির মেকার), বালিয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২৯. এটিএম মোস্তফা, বালিয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩০. মৃত আফরোজ, আমুয়াকান্দা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩১. আঃ কুদ্দুস, আমুয়াকান্দা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩২. মমিন উদ্দিন তালুকদার, নলদিঘী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩৩. একেএম রফিকুল হুদা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩৪. মুন মিয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩৫. জৈমত চেয়ারম্যান, চরপাড়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩৬. হাফিজ উদ্দিন, চরপাড়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩৭. হাফিজ উদ্দিন বিএসসি, গোদারিয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩৮. আজম আলী চেয়ারম্যান, ইমাদপুর, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৩৯. জানাব আলী চেয়ারম্যান, রাইমগঞ্জ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৪০. শাসছুল হক ওরফে হক চেয়ারম্যান, চরপাশাঘাট, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৪১. জোবেদ ফকির, চেয়ারম্যান, ফুলপুর থানা, ময়মনসিংহ
৪২. আমির খান, ফুলপুর থানা, ময়মনসিংহ
৪৩. রজব আলী ফকির, ফুলপুর থানা, ময়মনসিংহ
৪৪. আবু বকর সিদ্দিক, ফুলপুর থানা, ময়মনসিংহ
৪৫. মুন্সেফ মিয়া, ফুলপুর থানা, ময়মনসিংহ
৪৬. তৈয়ব, ফুলপুর থানা, ময়মনসিংহ
৪৭. আঃ আজিজ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ

[১৩]

১০৩. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

১. আজমত হোসেন, হাজী, চিফ কমান্ডার, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২. মৃত আব্দুস সাত্তার মাস্টার, চাঁদপুর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৩. মৃত হাসেন আলী, জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৪. মৃত নৈমদ্দিন, গ্রাম ফুলবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৫. মোঃ কলিম উদ্দিন, ফুলবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৬. মোঃ কলিম উদ্দিন, ফুলবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৭. মৃত আফসার উদ্দিন, ফুলবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৮. নৈইমউদ্দিন, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৯. মোঃ নুরুল ইসলাম, পিতা নৈইমদ্দিন, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১০. মোঃ হাবিবুর রহমান (হবি) ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

১১. মোঃ কলিম উদ্দিন, কোশমাইল, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১২. মৃত নুরুল আমিন, কোশমাইল, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১৩. আজমত হোসেন, হাজী, পলাশিহাটা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১৪. মৃত হাতেম আলী, নাওগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১৫. আবুল হোসেন, ডা. ফুলবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১৬. মৃত কাসুমিয়া, নাওগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১৭. চান্দু মিয়া, নাওগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১৮. আব্দুল খালেক, নাওগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১৯. মো : শহীদুল্লাহ মণ্ডল, নাওগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২০. মোঃ আব্দুস কুদ্দুস, নাওগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২১. সিরাজ আলী, বাদিহাটি, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২২. চান্দু, পিতা : হাজী ইমান আলী, নামাশ্রী, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২৩. মৃত আ : হাই, নিশ্চিন্তপুর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২৪. মো : আঃ খালেক, নিশ্চিন্তপুর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২৫. মৃত শাহান আলী, নিশ্চিন্তপুর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২৬. হাজা ডাকাতা (আজাতার), নিশ্চিন্তপুর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২৭. আঃ সালাম, নিশ্চিন্তপুর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২৮. নুরু ডাক্তা, নিশ্চিন্তপুর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
২৯. আব্দুস সামাদ, মাওলানা ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৩০. মোঃ আব্দুস সামাদ, দক্ষিণপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৩১. মোঃ আশরাফ আলী, দক্ষিণপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৩২. মোঃ মালেখ মুন্সী, নাওগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৩৩. মোবারক আলী মগা, নাওগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৩৪. মোহাম্মদ আলী, বাদিহাটি, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৩৫. আহাদ উল্লাহ, পিতা : কামিনী মণ্ডল, নাওগাঁও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
৩৬. সৈয়রত উদ্দিন ড্রাইভার, ফুলবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

[১৩]

১০৪. বগুড়া জেলা শান্তিকমিটি

১. দুলাল মেম্বার
২. ইমামুদ্দিন
৩. শামসু
৪. আজাহার মির্জা
৫. ইমামুদ্দিন
৬. চাঁন মিয়া

৭. শামসু
৮. নুরুদ্দিন খরিফা
৯. ইমামুদ্দিন
১০. খলিলুর রহমান
১১. আব্দুল হক
[১৩]

১০৫. বগুড়া সদর থানা শান্তিকমিটি

১. হাবিবুর রহমান খান, ডা. (কনভেনশন) : আহবায়ক।

১০৬. বড়লেখা থানা শান্তিকমিটি, সিলেট

১. আফতাব উদ্দিন আহমদ আহবায়ক
২. আকাদ্দস আলী সম্পাদক

১০৭. বরিশাল শান্তিকমিটি

১. আবদুর রব প্রাক্তন এম.এন.এ সভাপতি
১. খান চৌধুরী ফজলে রব, প্রাক্তন এম.এল.এ সহ সভাপতি

১০৮. বাঁশখালী থানা শান্তিকমিটি

চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানায় শান্তিকমিটি গঠিত হয় ২২ মে। থানা ১২টি ইউনিয়নে ও শান্তিকমিটি গঠিত হয়েছিল। থানা ও ইউনিয়নে শান্তিকমিটির মোট সদস্য ছিল ৬২ জন। বাঁশখালি থানা শান্তিকমিটির সদস্যরা ছিল-

১. আহমদ সগীর, 'মওলানা'
২. আনোয়ারুল আজিম
৩. লিউল ইসলাম চৌধুরী
৪. শফিকুর রহমান, 'মওলানা'
৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
৬. আতাউল কবির চৌধুরী
৭. মোহাম্মদ ইউসুফ
[১৮]

১০৯. বাঁশখালীর ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তিকমিটির আহবায়ক

ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তিকমিটিতে আহবায়ক ছিলেন—

১. ১ নং ইউনিয়ন : মওলানা আবুবকর।
২. ২ নং ইউনিয়ন : মওলানা নুরুল হক
৩. ৩ নং ইউনিয়ন : মওলানা আবুবকর আরবী
৪. ৪ নং ইউনিয়ন : মৌলবী আহমদ কবীর
৫. ৫ নং ইউনিয়ন : হারুন রশিদ
৬. ৬ নং ইউনিয়ন : আলহাজ্ব নরুল ইসলাম চৌধুরী

৭. ৭ নং ইউনিয়ন : মওলানা সিকান্দার
৮. ৮ নং ইউনিয়ন : হাজী হারুন রশিদ
৯. ৯ নং ইউনিয়ন : রশিদ আহমদ বি.এ.
১০. ১০ নং ইউনিয়ন : সিরাজুল হক বি.এ.
১১. ১১ নং ইউনিয়ন : আহম্মদ শফি চৌধুরী
১২. ১২ নং ইউনিয়ন : মাওলানা আব্দুর রহমান

থানা ও ইউনিয়ন কমিটিতে মোট ৬২ জন কর্মকর্তা ছিলেন। কমান্ডার ছিল সাধনপুরের আশরাফ মিয়া।

[১]

১১০. বাগুলাট ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, কুষ্টিয়া

তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার বাগুলাট ইউনিয়ন শান্তিকমিটির সদস্য ছিলেন-

১. মো. আব্দুল কাইউস, এ্যাডভোকেট
২. ইয়াছিন, দারোগা
৩. শওকত
৪. আমজাদ হোসেন
৫. বারী খান, নাতুড়িয়া
৬. ফটিক, দুহকমড়া
৭. সাজ্জাদ হোসেন বান্দা, দুহকমড়া
৮. রফিকুল ইসলাম মোক্তার, দমদমা

১১১. বাগেরহাট শান্তিকমিটি

১.	রজ্জব আলী ফকির	সভাপতি
২.	মোজাম্মেল হোসেন, ডা.	সদস্য
৩.	মো. আফছারউদ্দিন, এ্যাডভোকেট	সদস্য
৪.	মতিয়ার রহমান খান	সদস্য
৫.	মো. এছহাক উদ্দিন	সদস্য
৬.	মোসলেম উদ্দিন, ডা.	সদস্য
৭.	রজ্জব আলী ফকির	সদস্য
৮.	মোক্তার আলী খান	সদস্য
৯.	মো. হাসান আলী এ্যাডভোকেট	সদস্য
১০.	কাজি আ. হামিদ, এ্যাডভোকেট	সদস্য
১১.	কাজি আজহার আলী, এ্যাডভোকেট	সদস্য
১২.	মো. ইউসুফ আলী, এ্যাডভোকেট	সদস্য
১৩.	মো. জিল্লুর রহমান, এ্যাডভোকেট	সদস্য

১৪. সেখ আলতাফ আলী মোক্তার সদস্য
১৫. মো. মোরশেদুল আলম মোক্তার সদস্য
১৬. আবিদ আলী, ডা. সদস্য
১৭. মো. আ. ছত্তার সদস্য
১৮. নূর মো. চৌধুরী সদস্য
১৯. কাজী ছায়েম উদ্দিন সদস্য
২০. সিরাজ উদ্দিন, মও. সদস্য
২১. আকিজ উদ্দীন, আড়িখালি, বাগেরহাট
২২. সিরাজ মাস্টার, গোটাপাড়া, বাগেরহাট
২৩. নূরুল ইসলাম, গোটাপাড়া, বাগেরহাট
২৪. শাহজাহান, গোটাপাড়া, বাগেরহাট
২৫. আব্দুল লতিফ তালুকদার, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট
২৬. কাসেম মেম্বার
২৭. মজিদ কসাই

[৫৮ ও ১৩]

১১২. বানিয়াচং শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ

১. সৈয়দ ফজলুল হক আহবায়ক
২. দেওয়ান আলী রেজা সদস্য সচিব
৩. মৌলানা মোস্তফা আহমদ সদস্য
৪. মখর উল্লাহ সদস্য
৫. মনওয়ার মিয়া সদস্য

৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থী হিসেবে সদর আসন থেকে ডা. আবুল হাসেম নির্বাচিত হন। পাকিস্তানি সৈন্যরা ফিরে এলে ডা. আবুল হাসেম তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার পক্ষে তৎপরতা পরিচালনা করেন। এ সময় ঢাকা বেতারে ভাষণ দেন।

[৮]

১১৩. বারহাট্টা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রোকোণা

১. আব্দুল খালেক আহবায়ক
২. শামছুদ্দিন ভূঞা সদস্য
৩. আব্বাস আলী সদস্য
৪. সিদ্দা হোসেন চৌধুরী সদস্য
৫. রহমতুল্লাহ সদস্য
৬. মুসলেম, বারহাট্টা
৭. তোতা, বারহাট্টা

৮. বাদশা, বারহাট্টা
৯. আব্দুর রেজ্জাক, আলোকদিয়া, বারহাট্টা
১০. দুদু মিয়া, আলোকদিয়া, বারহাট্টা
১১. মৃত আফতাব উদ্দিন, ছালিপুর, বারহাট্টা
১২. দুদু মিয়া, আলোকদিয়া, বারহাট্টা
১৩. আব্বাস আলী খান, কৈলাটী, বারহাট্টা
১৪. চৌধুরী দারোগা, কৈলাটী, বারহাট্টা
১৫. আব্দুল মালেক মাস্টার, কৈলাটী, বারহাট্টা
১৬. জাহেদ ইমাম, চন্দ্রপুর, বারহাট্টা
[১৩ ও ৫৪]

১১৪. বাহুবল শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ

১.	মোঃ আব্দুল্লাহ, এডভোকেট	আহবায়ক
২.	আবদুর রহমান, হাজী	সদস্য সচিব
৩.	ববরু মিয়া মাস্টার	সদস্য
৪.	জলিল মিয়া	সদস্য
৫.	ইউনুস মিয়া	সদস্য
৬.	খিজির মিয়া	সদস্য
৭.	আবদুল বারিক	সদস্য
৮.	নুনু মিয়া	সদস্য
৯.	আবদুর নূর চৌধুরী	সদস্য
১০.	মাসুক চৌধুরী	সদস্য

[৮]

১১৫. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ১), যশোর

১.	শামছুর রহমান	চেয়ারম্যান
২.	মোজাফফার হোসেন	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	মোঃ ইয়াসিন	ভাইস চেয়ারম্যান
৪.	আলহাজ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ	সম্পাদক
৫.	মোঃ আলী মিয়াজ	যুগ্মসম্পাদক
৬.	সুলতান আহমেদ	সদস্য
৭.	নিশাত উল্লাহ	সদস্য
৮.	মনোয়ার হোসেন	সদস্য
৯.	নাসির খান	সদস্য
১০.	আনোয়ার হোসেন	সদস্য

১১. আবদুস সাত্তার — সদস্য
১২. শাহাদাৎ হোসেন — সদস্য

[১২]

১১৬. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ২), যশোর

১. এম এ লতিফ, ডা. — চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর আব্দুর রহমান — ভাইস চেয়ারম্যান
৩. খন্দকার জহুরুল হক — ভাইস চেয়ারম্যান
৪. মোঃ ইয়াসিন — ভাইস চেয়ারম্যান
৫. মো. হানিফ — সম্পাদক
৬. ইয়াকুব হোসেন — যুগ্মসম্পাদক
৭. সিদ্দিক হোসেন — যুগ্মসম্পাদক
৮. মোঃ সোলায়মান — সহকারী সম্পাদক
৯. মাসুদুর রহমান, ডা. — সদস্য
১০. মোঃ হানিফ — সদস্য
১১. আহমেদ খান — সদস্য
১২. মোঃ শরিফ — সদস্য
১৩. এম.এ. হোসেন — সদস্য
১৪. লিয়াকত হোসেন — সদস্য
১৫. খোরশেদ আলম — সদস্য
১৬. এম.এ. মজিদ — সদস্য
১৭. আফসার উদ্দিন আহমেদ — সদস্য
১৮. মোঃ ভূটান — সদস্য
১৯. মোঃ ইউসুফ — সদস্য
২০. এ. আজিম — সদস্য
২১. সৈয়দ খান — সদস্য
২২. মোঃ ইলিয়াস — সদস্য
২৩. মোঃ নেসার আলী — সদস্য

[১২]

১১৭. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৩), যশোর

১. নাসিরুদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২. খোরশেদ আহমেদ তরফদার — ভাইস চেয়ারম্যান
৩. মোঃ ইসরাইল — সম্পাদক
৪. এএস মোঃ আব্দুর রশিদ — যুগ্ম সম্পাদক

৫. মোঃ মনির খান সহকারী সম্পাদক
৬. খলিলুর রহমান সদস্য
৭. এ.এম. সাঈফউদ্দিন আহমেদ সদস্য
৮. আব্দুল আজিজ মোল্লা সদস্য
৯. শেখ শহিদুল হক সদস্য
১০. মোঃ আসাদুজ্জামান সদস্য
১১. এস.এম. জাহিদ সদস্য
১২. মোস্তানজির বিল্লাহ সদস্য
১৩. মোঃ ইসলাম সদস্য
১৪. শেখ বেলায়েত হোসেন্ সদস্য
১৫. হোসেন কাওসার সদস্য
১৬. মোঃ হোসেন সদস্য
১৭. নাসিরুদ্দিন সদস্য
১৮. আতিয়ার রহমান (১) সদস্য
১৯. আতিয়ার রহমান (২)। সদস্য

[১২]

১১৮. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ৪), যশোর

১. মোঃ আযম খান চেয়ারম্যান
২. আলহাজ সানাউল্লাহ ভাইস চেয়ারম্যান
৩. কাজী জায়াল আহমেদ সাধারণ সম্পাদক
৪. মোঃ ইউনুস সহকারী সম্পাদক
৫. মির জহুরুল হক সহকারী সম্পাদক
৬. আব্দুর রউফ সহকারী সম্পাদক
৭. সালাউদ্দীন আহমেদ সহকারী সম্পাদক

[১২]

১১৯. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ৫), যশোর

১. মুজিবুর রহমান চেয়ারম্যান
২. নিসার আহমেদ ভাইস চেয়ারম্যান
৩. মোঃ হাবিবুল্লাহ সম্পাদক
৪. তারিফুদ্দিন বিশ্বাস যুগ্ম সম্পাদক
৫. মোঃ ইয়াহিয়া সদস্য
৬. ওয়ালি মোহাম্মদ সদস্য
৭. আব্দুর রাজ্জাক (১) সদস্য

৮.	শাহেব জান	সদস্য
৯.	আব্দুল হামিদ	সদস্য
১০.	আব্দুর রব	সদস্য
১১.	আব্দুর রাজ্জাক (২)	সদস্য
১২.	মোঃ ইয়াকুব	সদস্য
১৩.	তবিবর রহমান	সদস্য
১৪.	কাজী মোফাজ্জাল হোসেন	সদস্য
১৫.	ইব্রাহীম।	সদস্য

[১২]

১২০. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ৬), যশোর

১.	গোলাম রসুল	চেয়ারম্যান
২.	জহির হাসান	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	নুরুজ্জামান	সাধারণ সম্পাদক
৪.	আনসার উদ্দিন	যুগ্ম সম্পাদক
৫.	মোঃ হাসেম আলী	সহকারী সম্পাদক
৬.	সিরাজ উদ্দিন	সদস্য
৭.	আব্দুর রহিম	সদস্য
৮.	আব্দুস সাকুর	সদস্য
৯.	আব্দুস সাত্তার খান	সদস্য
১০.	আব্দুল ওহাব	সদস্য
১১.	শেখ রহিম বক্স	সদস্য
১২.	কাজী সুলতান আহমেদ	সদস্য
১৩.	মাসুদুর রহমান	সদস্য
১৪.	মহিউদ্দিন আহমেদ	সদস্য
১৫.	প্রফেসর আব্দুর রউফ	সদস্য

[১২]

১২১. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৭), যশোর

১.	মোঃ সফি	চেয়ারম্যান
২.	শেখ বদরুদ্দোজা	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	মোঃ আনসার উদ্দিন খান	সাধারণ সম্পাদক
৪.	মোঃ এ রহিম	যুগ্মসম্পাদক
৫.	এস এম গিয়াসউদ্দিন	সহকারী সম্পাদক
৬.	মোঃ আব্দুর রহিম বিশ্বাস	সদস্য

৭.	মখলেছুর রহমান	সদস্য
৮.	শেখ আব্দুল গনি	সদস্য
৯.	রওশন আলী	সদস্য
১০.	খন্দকার মনোয়ার হোসেন	সদস্য
১১.	কাজী ফকরুল ইসলাম	সদস্য
১২.	আব্দুল মালেক	সদস্য
১৩.	রুপাই বেপারী	সদস্য
১৪.	এ. রউফ	সদস্য
১৫.	শওকত আলী	সদস্য

[১২]

১২২. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর

১.	মিয়া আবুল কাসেম	চেয়ারম্যান
২.	শামছুদ্দিন আহমেদ	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	আবু বক্কর	সাধারণ সম্পাদক
৪.	শেখ আমির আলী	যুগ্মসম্পাদক
৫.	এসএম গিয়াস উদ্দিন	যুগ্মসম্পাদক
৬.	হানিফ মোল্লা	সদস্য
৭.	ওয়াখিল উদ্দিন আহমেদ	সদস্য
৮.	মোঃ তাহী মোল্লা	সদস্য
৯.	এলাহী বক্স মোল্লা	সদস্য
১০.	আব্দুল জলিল সরদার	সদস্য
১১.	ইব্রাহীম মোল্লা	সদস্য
১২.	জহুরুল হক গাজী	সদস্য
১৩.	ইজ্জত আলী মোল্লা	সদস্য
১৪.	রাকাব্বর শেখ	সদস্য
১৫.	তাফসিরুদ্দীন আহমেদ	সদস্য
১৬.	আরশাদ আলী সরদার	সদস্য
১৭.	সেকেন্দার আলী	সদস্য
১৮.	আবুল হোসেন শেখ	সদস্য
১৯.	বেলাল উদ্দিন আহমেদ	সদস্য
২০.	মোঃ মকিম	সদস্য
২১.	শামসুর রহমান খান	সদস্র
২২.	জীব্রাঈল	সদস্য
২৩.	মাবুদ আলী	সদস্য

২৪. সোলায়মান — সদস্য
২৫. সাখওয়াত আলী — সদস্য
২৬. আব্দুল মতালেব গাজী — সদস্য
২৭. জুলফিকার — সদস্য
২৮. বাবর আলী — সদস্য
২৯. আব্দুল মান্নান — সদস্য
৩০. আবুল হুসাইন — সদস্য
৩১. ইয়াসিন তরফদার — সদস্য
৩২. কাজী শাকুর আলী — সদস্য

[১২]

১২৩. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৯), যশোর

১. শেখ মাহবুবুর রহমান — চেয়ারম্যান
২. আব্দুস সামাদ — ভাইস চেয়ারম্যান
৩. শেখ মফিজুল্লা — সম্পাদক
৪. এসএম ইয়াহিয়া — যুগ্মসম্পাদক
৫. শেখ আব্দুস সামাদ — যুগ্মসম্পাদক
৬. মোঃ মতিয়ার রহমান — সহকারী সম্পাদক
৭. সিরাজউদ্দিন — সদস্য
৮. মাহবুবুর রহমান খান — সদস্য
৯. আব্দুর রহমান — সদস্য
১০. মোঃ আলী — সদস্য
১১. মোঃ জাফর আলী খান — সদস্য
১২. নূর মোহাম্মদ খান — সদস্য
১৩. নুরুল হুদা — সদস্য
১৪. আব্দুল মজিদ — সদস্য
১৫. হাজী গোলাম মোস্তফা — সদস্য
১৬. শেখ লুৎফর রহমান — সদস্য

[১২]

১২৪. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ১০), যশোর

১. খান হাবিবুর রহমান খান — চেয়ারম্যান
২. মোঃ ইব্রাহীম — ভাইস চেয়ারম্যান
৩. মীর আব্দুস সাকুর — সম্পাদক
৪. শেখ শামছুল হক — যুগ্ম সম্পাদক

৫.	শেখ সফিউদ্দিন আহমেদ	যুগ্ম সম্পাদক
৬.	শেখ কোরবান আলী	যুগ্ম সম্পাদক
৭.	আব্দুল গফফার তরফদার	যুগ্ম সম্পাদক
৮.	আব্দুল করিম	সদস্য
৯.	আব্বাস আলী লস্কর	সদস্য
১০.	শেখ সাঈফ	সদস্য
১১.	শেখ কাদের বকস	সদস্য
১২.	ফখরুদ্দিন	সদস্য
১৩.	মোঃ সফি	সদস্য
১৪.	শেখ আখতার হোসেন	সদস্য
১৫.	মোঃ ইসহক	সদস্য
১৬.	কালু মিয়া	সদস্য
১৭.	আব্দুর রাজ্জাক	সদস্য
১৮.	শেখ আব্দুল জলিল	সদস্য
১৯.	শেখ মোঃ আলী	সদস্য
২০.	মেসবা উদ্দিন আহমেদ	সদস্য

** দ্রষ্টব্য এই তালিকাটি তৈরি করেন ইউনিয়ন পিস কমিটির সম্পাদক সলিমুল্লাহ খান। এটি অনুমোদন করা হয় ১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট। অনুমোদন করেন শহর পিস কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ কামরুদ্দীন।

[১২]

১২৫. বেড়া থানা শান্তিকমিটি

১.	রাজা মিঞা	চেয়ারম্যান
২.	নুরু মিঞা	সদস্য
৩.	পিরু মিঞা	সদস্য
৪.	এন্তাজ আলী, হাজী	সদস্য
৫.	আব্দুল ওহাব	সদস্য
৬.	মফিজ উদ্দিন	সদস্য

[৪]

১২৬. বেলকুচি থানা শান্তিকমিটি, সিরাজগঞ্জ

১. এম. এ. জলিল (কনভেনশন) : আহবায়ক।

১২৭. বাঘরা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. তোফাজ্জাল হোসেন আহবায়ক

১২৮. ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকার শান্তিকমিটি

১. ওয়ার্ড ১ হারুনউর রশীদ আহ্বায়ক

২. ওয়ার্ড ২ সৈয়দ মোহাম্মদ আহম্মদ আহবায়ক

৩. ওয়ার্ড ৩ কেরামত আলী আহ্বায়ক
৪. ওয়ার্ড ৪ আব্দুল গফুর আহ্বায়ক
৫. ওয়ার্ড ৫৬ আবেদ আলী

১২৯. বাড়ৈখালি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. এ জলিল খান আহবায়ক
২. এ বি এম সিদ্দিক প্রচার সম্পাদক
৩. রোস্তম মিয়া সহকারী প্রচার সম্পাদক

২০ জন সদস্য

১৩০. ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা শান্তিকমিটি

১. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক আহবায়ক

১৩১. বালিয়াকান্দি থানা শান্তিকমিটি, ফরিদপুর

১. এম. এ. গফুর আহবায়ক

১৩২. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

১. মৃত আতিক উল্লাহ চৌধুরী (ধনু মিয়া), ধামচইর, ভালুকা, ময়মনসিংহ
২. মৃত বেলা খাঁ, মেদুয়ারী, ভালুকা
৩. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান, সাং খারুয়ারী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৪. মোঃ আব্দুল হামিদ ক্বারী, সাতেংগা, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৫. আবুল হাশেম, ভালুকা, ময়মনসিংহ ভুলুকা থানা বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক
৬. হেলাল উদ্দিন মণ্ডল, পিতা : মোজাম্মেল হক, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৭. শামসুল হক ফকির, পিতা : মেহের আলী ফকির, খারুয়ারী, ভালুকা
৮. খোকন মেম্বার, ভালুকা, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৯. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার (কানকাটা), ভালুকা, ময়মনসিংহ
১০. মৃত আব্দুল মান্নান (কানকাটা), ভালুকা, ময়মনসিংহ
১১. মোঃ আব্দুল মজিদ শেখ (কানকাটা), কাঠালী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১২. আব্দুস শহিদ মাস্টার, পিতাধ জরিফ খাঁ, কাঁঠালী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৩. মাঈনউদ্দিন (সাংবাদিক), সাতেংগা, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৪. আব্দুল হাই, পিতা : ময়না, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৫. আবুল হাশিম, পিতা : ময়না, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৬. মৃত আজমত আলী, বান্দাবর, কাঁঠালী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৭. মৃত হামিদুল্লাহ, আউলিয়া চালা, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৮. মৃত ছুমে, ডাকাতিয়া, কাঁঠালী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৯. শাদউল্লাহ, আউলিয়া চালা, ভালুকা, ময়মনসিংহ
২০. মাওলানা মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, ক্ষুরধর, ভালুকা, ময়মনসিংহ

২১. আবুল হোসেন, ক্ষুরধর, ভালুকা, ময়মনসিংহ
২২. দুলা মল্লিক, গয়ারী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
২৩. মফিজ উদ্দিন (চেয়ারম্যান), ভালুকা, ভালুকা, ময়মনসিংহ
২৪. মৃত তাহের আলী (চেয়ারম্যান) ভালুকা, ময়মনসিংহ
২৫. মৃত কালিমুল্লাহ মাস্টার, কাতলা বাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ
২৬. শাহ নাজিম, মিরকা, ভালুকা, ময়মনসিংহ
২৭. গোলাপ, পিতা : মৃত আব্দুর রশিদ, ভালুকা, ময়মনসিংহ
২৮. আব্দুল আউয়াল, খারুয়ারী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
২৯. আব্দুর রাজ্জাক, পিতা : মৃত আব্দুর রহিম, খারুয়ারী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩০. বাদশা, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩১. মৃত হোসেন আলী মুন্সী, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩২. মোসাম্মৎ মরিয়ম আক্তার, স্বামী মৃত তাহের আলী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩৩. মৃত হেকমত, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩৪. আব্দুল, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩৫. আহমদ আলী পাগল, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩৬. মৃত হাফিজ উদ্দিন, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩৭. আবু ছায়েদ বাশি, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩৮. মৃত আজমত দফাদার ধানছইর, ভালুকা, ময়মনসিংহ
৩৯. কালু মিদুয়ারী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
[১৩]

১৩৩. মদন থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল

১. আব্দুল জব্বার, চানগাঁও, মদন
২. আব্দুল মালেক, মদন, মদন
৩. আব্দুল বারেক, মদন, মদন
৪. মোঃ আব্দুল মোতালেব, বালাই, মদন
৫. সামসুল হুদা, মদন
৬. মোঃ আব্দুস সোবহান, মদন
৭. হেদায়েত উল্লাহ বিএসসি ওরফে আঞ্জু মৌলনা, কুলশ্রী, মদন
[১৩]

১৩৪. ময়মনসিংহ সদর শান্তিকমিটি

১. ভূলা মিয়া, হেজবুল্লাহ রোড, ট্রাকপট্টি
২. মুন্সেফ মিয়া
৩. তৈয়ব
৪. জোবেদ ফকির, চেয়ারম্যান
৫. আমির খান

৬. রজব আলী ফকির
৭. আবু বকর
৮. আবু বকর সিদ্দিক
৯. শুকুর
১০. আবুল চেয়ারম্যান
১১. কফিল উদ্দিন
১২. আব্দুল হান্নান
১৩. আহম্মদ আলী
১৪. আমছর
১৫. বংগা
১৬. খলিল
১৭. আজিম উদ্দিন
১৮. আরমান উদ্দিন
[১৩]

১৩৬. মাগুরা মহকুমা শান্তিকমিটি

১. করিম, দক্ষিণ নিশ্চিন্তপুর, মাগুরা
২. আলী সরকার, কলেজ পাড়া, মাগুরা
৩. সরওয়ার, কলেজপাড়া, মাগুরা
৪. নওশের মুন্সি, কলেজ পাড়া, মাগুরা
৫. তোয়েব মুন্সি, কলেজপাড়া, মাগুরা
৬. আবু সালাম, কলেজপাড়া, মাগুরা
৭. আমিনুল রাশেদ, কলেজপাড়া, মাগুরা
৮. রিজু, হাজিপুর, মাগুরা
৯. লতিফ হাজিপুর, মাগুরা
১০. আউয়াল, হাজিপুর, মাগুরা
১১. ওবায়দুর রহমান, হাজিপুর, মাগুরা
১২. মাহবুব মওলানা, হাজিপুর, মাগুরা
১৩. ইউসুফ মিয়া, হাজিপুর, মাগুরা
১৪. আইয়ুব মিয়া, হাজিপুর, মাগুরা
১৫. ওবায়দুল্লাহ, পীর, মাগুরা
১৬. মাহবুবুর রহমান, মাগুরা
১৭. আইয়ুব চৌধুরী, মাগুরা
১৮. মাওলানা শামসুল হক, মাগুরা
১৯. আবু বক্কর শেখ, শালিখা, মাগুরা
২০. শের আলী, শালিখা, মাগুরা

২১. লাল মিয়া, শালিখা, মাগুরা
২২. জামিউল আলম খান (কনভেনশন মুসলিম লীগ) আহ্বায়ক
[১৩]

১৩৬. মাদারীপুর জেলা শান্তিকমিটি

১. খলিল জমাদ্দার
২. বাবুল
৩. নান্নু
৪. শাহেদ আলী
৫. খলিলুর রহমান
৬. মওলানা
৭. নান্নু অ্যাডভোকেট
৮. পাপ্পু
৯. আব্দুল খালেক
১০. আব্দুল হামিদ খন্দকার
১১. হায়দার মোল্লা
১২. মোজাফ্ফর বক্স মোল্লা
১৩. মাদার বক্স মোল্লা
১৪. আবু তালেব
১৫. শাহেদ আলী
[১৩]

১৩৭. মাধবপুর শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ

১.	জাহেদ উদ্দিন চৌধুরী	আবহবায়ক
২.	মতি মিয়া	সদস্য সচিব
৩.	আফতাব মোল্লা	সদস্য
৪.	আঃ রহিম	সদস্য
৫.	লাল মিয়া	সদস্য
৬.	আব্দুল হামিদ	সদস্য

[৮]

১৩৮. মাইজবাগ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

১. আবদুল হালিম খান সভাপতি
২. আবদুল গণী সম্পাদক
৩. তাহের উদ্দিন

১৩৯. মুলাদী থানা শান্তি ও কল্যাণ পরিষদ

১. আব্দুল্লাহ হারুণ
২. আব্দুল মজিদ যুগ্ম আহবায়ক

১৪০. মৌলভীবাজার মহকুমা শান্তিকমিটি

১. এনাম উল্লাহ, প্রাক্তন এমপিএ সভাপতি

২. মিসির উল্লাহ আহবায়ক

১৪১. মিরপুর থানা শান্তিকমিটি, ঢাকা শহর

মোজ্জাম্মেল হোসাইন খান চৌধুরী (কনভেনশন) : আহবায়ক।

১৪২. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

১. মণিরুজ্জামান, আর কে উচ্চ বিদ্যালয় ধর্মীয় শিক্ষক, মৌলভী

২. সুরুজ, পাড়াটংগী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

৩. চাঁনু, পাড়াটংগী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

৪. এ এম ইজহারুল হক মাস্টার, আর কে উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক

৫. ক্বারী আব্দুল কাদের, দামপাড়া

৬. মানিক চৌধুরী, মানকোন

৭. মোঃ আনছার উদ্দিন মাস্টার, পিতা : বাসু ফকির, নন্দীবাড়ি

৮. হেলাল উদ্দিন, পিতা : মৃত জালাল উদ্দিন, কুমারগাতা

৯. আজিজুল হক, পিতা : মৃত আব্দুল জব্বার, কুমারসাতা

১০. দানেশ আলী, ঘোষবাড়ি

১১. শামসুল আলম (আক্কেল আলী), ডা.,গোয়ারী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১২. আলতাফ আলী (আলতা) বেজবাড়ি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১৩. মৃত আব্দুল হাই মৌলভী, মহিষতারা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১৪. মৃত আবেদ আলী, মহিষতারা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১৫. জুলু, পিতা : মৃত আব্দুস সাত্তার, লিচুতলা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১৬. মোঃ আবুল বাশার (বাসায়েত), লিচুতলা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১৭. আবু হানিফা, মহিষতারা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১৮. মোঃ চাঁন মিয়া, তারটি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

[১৩]

১৪৫. মুলাডুলি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, ঈশ্বরদী থানা

ইসহাক আলী খা সভাপতি

[৩৪]

১৪৩. মেহেরপুর জেলা শান্তিকমিটি

১. মতিন উকিল

২. মেহের উকিল

৩. সাফদার মাস্টার

[১৩]

১৪৪. মেহেরপুর শান্তিকমিটি
সরদার আলী (কনভেনশন) : আহবায়ক

১৪৫. মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
১. আব্দুল খালেক, পানুর, মোহনগঞ্জ
২. লাল হোসেন, দেওথান, মোহনগঞ্জ
৩. মৃত সোনামদী খাঁ, বাহাম, মোহনগঞ্জ
৪. আব্দুল আজিজ নায়েভ, মানশ্রী, মোহনগঞ্জ
৫. সুরুজ আলী খান পাঠান, মোহনগঞ্জ
৬. আব্দুল হাই (কারি মিয়া) মাখান, মোহনগঞ্জ
৭. মাহতাব উদ্দিন, মোহনগঞ্জ
৮. ইব্রাহিম, দেওখান, মোহনগঞ্জ
৯. মৃত হাবিবুর রহমান সম্রাট, বড়কাশিয়া, মোহনগঞ্জ
১০. মৃত আব্দুল খালেক, বড়কাশিয়া, মোহনগঞ্জ
১১. মৃত চাঁন মিয়া, মাযান, মোহনগঞ্জ
১২. মৃত করিম নেওয়াজ খাঁ, পানুর, মোহনগঞ্জ
১৩. চুন্নু মিয়া, বড়কাশিয়া, মোহনগঞ্জ
১৪. নজরুল শেখ, মোহনগঞ্জ
১৫. নজরুল ইসলাম, মানশ্রী, মোহনগঞ্জ
১৬. রবিউল্লাহ, মানশ্রী, মোহনগঞ্জ
১৭. গোলাম রব্বানী খান পাঠান, বড়কাশিয়া, মোহনগঞ্জ
১৮. ছদ্দু মিয়া, বড়কাশিয়া, মোহনগঞ্জ
১৯. আব্দুস সাত্তার, ঘড়মশ্রী, মোহনগঞ্জ
২০. আশরাফ আলী চৌধুরী, ঘড়মশ্রী
২১. মৃত আব্দুর রেজ্জাক, আলোকদিয়া, বারহাট্টা
২২. মৃত গিয়াস উদ্দিন, বড়কাশিয়া, মোহনগঞ্জ
২৩. মৃত চুন্নু মিয়া, বড়কাশিয়া, মোহনগঞ্জ
২৪. মাহতাব উদ্দিন আহম্মদ, বড়কাশিয়া, মোহনগঞ্জ
২৫. আমজাদ মিয়া, বড়কাশিয়া, মোহনগঞ্জ
২৬. ছোয়াব উদ্দিন চেয়ারম্যান, মাহসুদপুর, মোহনগঞ্জ

[১৩]

১৪৬. মৌলভীবাজার জেলা শান্তিকমিটি
১. মোঃ ইদ্রিস,
২. আরিফ, হাজী
৩. আসাদ গাজী, চেয়ারম্যান

[১৩]

১৪৭. যদুবয়রা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি

১. সাহাবুদ্দিন বিশ্বাস — সভাপতি
২. খোন্দকার আব্দুস সামাদ — সদস্য
৩. ইব্রাহীম, চৌরঙ্গী — সদস্য

[১৮]

১৪৮. যশোর জেলা শান্তিকমিটি

১. সৈয়দ শামসুর রহমান (কাউন্সিল) : আহবায়ক
২. সৈয়দ বদরুল আলম (কনভেনশন) : সাধারণ সম্পাদক।
৩. মোহাম্মদ কায়েস উদ্দিন সভাপতি
৪. আমজাদ হোসেন সম্পাদক
৫. হারেজ উদ্দীন আহম্মেদ প্রচার সম্পাদক
৬. আমজাদ মোল্লা, বাঘাপাড়া, যশোর
৭. কায়েম আলী, বাঘারপাড়া, যশোর
৮. গাফ্ফর, ডা., উপশহর, যশোর

[১৩ ও ৫৩]

১৪৯. রংপুর জেলা শান্তিকমিটি

মোঃ আমিন (কিউ. এম. এল.) : চেয়ারম্যান।
আব্দুল মান্নান (কনভেনশন) : সাধারণ সম্পাদক।

১৫০. রাজবাড়ি সদর শান্তিকমিটি

১. ইজাহার মিয়া — চেয়ারম্যান
২. সৈয়দ কামাল — সদস্য
৩. আবদুর রব সোবাহানী — সদস্য
৪. আলাউদ্দিন মিয়া — সদস্য
৫. আবদুল জব্বার — সদস্য
৬. মজিবুর রহমান প্রামাণিক — সদস্য
৭. মজিদ মোল্লা — সদস্য
৮. আলাউদ্দিন মোল্লা — সদস্য
৯. আব্দুল গফুর মোল্লা — সদস্য
১০. মজিদ খান — সদস্য
১১. হাবিবুর রহমান — সদস্য
১২. মোহন মিয়া — সদস্য

এদের মধ্যে আলাউদ্দিনকে রাজবাড়ি পৌরসভার চেয়ামম্যান করা হয়েছিল।

[২০]

১৫১. রংপুর জেলা শান্তিকমিটি

১. সিরাজুল ইসলাম, প্রাক্তন এম.এন.এ সভাপতি
২. নাসিম আহমদ উসমানী সাধারণ সম্পাদক

১৫২. রাজনগর থানা শান্তিকমিটি, সিলেট

১. আব্দুল গফুর চেয়ারম্যান
২. আজমল খান, হাজি আহবায়ক
৩. আবদুল করিম সম্পাদক

১৫৩. রাঢ়ীখাল ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. সোলায়মান খান আহবায়ক

১৫৪. রূপগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, ঢাকা

১. হান্নান, 'মওলানা' সাধারণ সম্পাদক

১৫৫. রিকাবী বাজার শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. আজিজ মাষ্টার আহবায়ক
২. আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

১৫৬. লাকসাম শান্তিকমিটি

১.	আব্দুল গফুর	সভাপতি
২.	ইসমাইল চৌধুরী রাহমানী	সহ-সভাপতি
৩.	আব্দুল মজিদ খান	
৪.	আব্দুল খালিক	

[১০]

১৫৭. লাখাই শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ

১.	করিম হোসেন, হাজী	আহবায়ক
২.	হরমুজ আলী	সদস্য সচিব
৩.	আবদুর নূর	সদস্য
৪.	ইসমাইল হোসেন	সদস্য
৫.	হরমুজ আলী	সদস্য
৬.	সুলতান খান	সদস্য
৭.	আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া	সদস্য
৮.	নবাব মিয়া	সদস্য
৯.	হোসেন মিয়া	সদস্য

[৮]

১৫৮. শরীয়তপুর জেলা শান্তিকমিটি, কুস্টিয়া

১. জয়নাল ভূঁইয়া

[১৩]

১৫৯. শিলাইদহ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি

১. সাদেক আলী সভাপতি
২. সদরউদ্দিন সদস্য
৩. শামসুদ্দিন, কসবা সদস্য

৪. এস. এ রউফ, জাহেদপুর সদস্য
৫. আ. বারী, বেলগাছি সদস্য
৬. নূর মোহাম্মদ, খোরশেদপুর সদস্য
[১৮]

১৬০. শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. ফজলুল হক, ডা. আহ্বায়ক

১৬১. শ্রীনগর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. আঃ বাচির মিয়া আহবায়ক

১৬২. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি

১. শাহজাহান চৌধুরী, রাঙসা শেরপুর টাউন, শেরপুর
২. মোজাম্মেল চৌধুরী (মৃত), রাঙসা শেরপুর টাউন, শেরপুর
৩. আব্দুস সাত্তার (মৃত), প্রফেসর, শেরপুর সরকারী কলেজ, শেরপুর
৪. মতিউর রহমান (মতি চেয়ারম্যান) নয়াআনী বাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর
৫. সামেদুল হক মৃত নারায়ণপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর
৬. জয়নাল আবেদীন মুক্তার (মৃত), খরমপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর
৭. কামাল টাইপিস্ট, পিতা জয়নাল আবেদীন, খরমপর, শেরপুর টাউন, শেরপুর
৮. শামসুল হুদা, এডভোকেট, খরমপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর
৯. আলী আজম মাস্টার, খরমপুর, শেরপুর, টাউন, শেরপুর
১০. আমিনুল ইসলাম, এডভোকেট, খরমপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর
১১. সৈয়দ আহম্মদ চেয়ারম্যান চাপাতলী, শেরপুর টাউন, শেরপুর
১২. নাসির উদ্দিন (মৃত), মিলিটারি, খরমপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর
১৩. সালফেট মজিবর (মৃত), খরমপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর
১৪. জিয়ারত আলী খান, সূর্য্যদী, থানা+শেপুর
১৫. মকবুল হোসেন, নবীনগর, শেরপুর টাউন, শেরপুর
১৬. আঃ আহিমদ চেয়ারম্যান (মৃত) বাজিতখিলা, শেরপুর টাউন, শেরপুর
১৭. সাখাওয়াত হোসেন (মৃত), পিতা : আফছার উদ্দিন, রঘুনাথপুর, শেরপুর
১৮. জমশেদ আলী মেম্বার, নামা হাওড়া, থানা+ শেরপুর
১৯. এসহাক আলী, সাপয়ারী, থানা+শেরপুর
২০. জোনাব আলী মৃত, তারাকান্দী, থানা+শেরপুর
২১. শুকুর মাসুদ মৃত, তারাকান্দী, থানা+শেরপুর
২২. মহেজউদ্দিন মেম্বার, তারাকান্দী, থানা+শেরপুর
২৩. মোবারক হোসেন, ইউনিয়ন : গাজীর খামার, থানা+শেরপুর
২৪. মহেজউদ্দিন মাস্টার, গাজীরভিটা, থানা+শেরপুর
২৫. মোঃ ইয়াদ আলী খান, সূর্য্যদী, শেরপুর সদর, শেরপুর

২৬. মোঃ জুনাব আলী, আলিনাপাড়া, শেরপুর সদর, শেরপুর
২৭. মোঃ সোহাবাজ আলী, আলিনাপাড়া, শেরপুর সদর, শেরপুর
২৮. মোঃ জয়নাল মিয়া, চরসাপমারী, শেরপুর সদর, শেরপুর
২৯. মোঃ ইসহাক, সাপমারী, শেরপুর সদর, শেরপুর
৩০. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, রঘুনাথপুর, থানা+শেরপুর
[১৩]

১৬৩. শ্রীনগর থানা শান্তিকমিটি, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জের তৎকালীন শ্রীনগর থানা শান্তিকমিটি-

১.	সৈয়দ আব্দুল মান্নান, বাসাইলজেগ	আহবায়ক
২.	মাহতাবউদ্দিন আহমেদ, দামলা	সদস্য
৩.	আলিমুল্লাহ, সিংপাড়া	সদস্য
৪.	আব্দুস সামাদ লস্কর, কুকুটিয়া	সদস্য
৫.	আব্দুল জলিল খান, শ্রীনগর	সদস্য
৬.	শাহআলম, আরধিপাড়া	সদস্য
৭.	নুরুল ইসলাম, সিংপাড়া	সদস্য
৮.	আমিনুল হক, কুকুটিয়া	সদস্য

[২৫]

১৬৪. ষোলঘর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

১. দেওয়ার হোসেন আহবায়ক

১৬৫. সাতক্ষীরা মহকুমা শান্তিকমিটি

১. এ. গফুর (কনভেনশন) আহবায়ক

১৬৬. সান্তাহার শান্তিকমিটি

আব্দুল মজিদ তালুকদার সভাপতি

১৭০. সিরাজগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি

শফিউদ্দিন মিয়া, মাওলানা (কনভেনশন) আহবায়ক

১৬৮. সিরাজগঞ্জ মহকুমা শান্তিকমিটি

১. আসাদ উদ্দৌল্লা সিরাজী, মাওলানা (কনভেনশন) : চেয়ারম্যান
২. গোলাম আযম (কিউ. এম. এল.) : সেক্রেটারী
৩. তোফাজ্জল হোসাইন সোজার (কনভেনশন) : আহবায়ক।
৪. মজিবর রহমান সদস্য

১৬৯. সিলেট শহর শান্তিকমিটি

১. সহিদ আলী, অ্যাডভোকেট আহবায়ক

১৭০. সিলেট জেলা শান্তিকমিটি

১. নজুল হোসেন—আহবায়ক

২. ওয়াহিদ উল্লাহ
৩. সরাফত উল্লাহ
৪. আবদুস সালাম
৫. আব্দুল আহাদ চৌধুরী
৬. ইউনুস মিয়া, দালাল

[১৩]

১৭১. সুনামগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি

১.	আনোয়ার রাজা	আহবায়ক
২.	আব্দুস সামাদ, এ্যাডভোকেট	সদস্য
৩.	ফারুক চৌধুরী	সদস্য
৪.	শওকত মিয়া	সদস্য
৫.	মিসবাউদ্দোজা রেজা চৌধুরী	সদস্য
৬.	লাল মিয়া	সদস্য
৭.	মাহমুদ আলী	সদস্য
৮.	মন্তমিয়া	সদস্য
৯.	ফকির চেয়ারম্যান	
১০.	রেজা মিয়া	
১১.	আনোয়ার মিয়া	
১২.	আঃ সাত্তার	
১৩.	আঃ গণি রফিক	
১৪.	নাসিম,	
১৫.	লিডার আহমদ আলী খান	
১৬.	মুসলিম উল্লাহ	
১৭.	আবদুল ওয়াতির	
১৮.	আব্দুর রাজ্জাক	
১৯.	জগন্নাথপুর	
২০.	ইয়াহিয়া	
২১.	জগন্নাথপুর	

[১৩]

১৭২. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি

হবিগঞ্জে পাকিস্তানি সৈন্যরা ফিরে আসার পর স্থানীয় দালালরা সংগঠিত হয়ে শান্তি কমিটি গঠন করে । তৎকালে হবিগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক শুরু থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানি সৈন্যরা ফিরে আসার আগেই তিনি ভারতে চলে যান। ফলে অতিরিক্ত মহকুমা প্রশাসক এ. টি. এম. আবেদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মহকুমা প্রশাসকের দায়িত্ব

পালন করেন। হবিগঞ্জ মহকুমা শান্তিকমিটির এই তালিকা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সহযোগিতার প্রস্তুত করা হয়েছে।

তালিকা নিম্নরূপ :

১.	সৈয়দ কামরুল আহসান	আহবায়ক
২.	সৈয়দ মুহিবুল আহসান	সদস্য সচিব
৩.	মোঃ আবু আবদুল্লাহ ইসমাইল	সদস্য
৪.	সৈয়দ মধু মিয়া	সদস্য
৫.	মোঃ আব্দুল বারী	সদস্য
৬.	মোঃ আবদুল্লাহ, এড	সদস্য
৭.	জাহেদ উদ্দিন চৌধুরী	সদস্য
৮.	আলী রেজা	সদস্য
৯.	নূর আলম বাচ্চু	সদস্য
১০.	মাসুক চৌধুরী	সদস্য
১১.	দরবেশ মিয়া	সদস্য
১২.	মর্তুজা মিয়া	সদস্য
১৩.	মাহফুজ আলী খান	সদস্য
১৪.	নওশাদ চৌধুরী	সদস্য
১৫.	সৈয়দ নুরুল আহসান	সদস্য
১৬.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সদস্য

[৮]

১৭৩. হাইতকান্দি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, মিরেরসরাই, চট্টগ্রাম

১. জামানুল্লাহ, ডা. আহবায়ক

১৭৪. হাষাড়া ইউনিয়ণ শান্তিকমিটি, মুন্সিগঞ্জ

২. রিয়াজউদ্দিন মিয়া আহবায়ক

১৭৫. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

১. মোঃ শামছুল ইসলাম (শামসু খলিফা), হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
২. তাজী মামুদ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৩. মোঃ মোফাজ্জল হোসেন খাঁ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৪. মোঃ আব্দুল কাশেম সিকদার, হালুঘাট, ময়মনসিংহ
৫. মোঃ রুহুল আমিন, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৬. হযরত আলী, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৭. সাইফুল ইসলাম (ভেণ্ডার ও দলিল লেখক), হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৮. আমীর আলী, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৯. সুলতান খাঁ, হালুয়াঘাট
১০. মোঃ আবুল কাশেম সিকদার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ

১১. মোঃ আজিজুল ইসলাম, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১২. মোঃ আব্দুল হাই, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৩. মাওলানা দৌলত আলী, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৪. মাওলানা গিয়াস উদ্দিন, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৫. রবসির মেকার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৬. রজব আলী ফকির, হালুয়াঘাট ময়মনসিংহ
১৭. আলী হোসেন, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৮. মোঃ হরমুজ আলী, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৯. মোঃ মোফাজ্জল হোসেন খাঁ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
২০. রমজান আলী, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
২১. আকরাম হোসেন, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
২২. সুলতান খাঁ, উত্তর খয়ড়াকুড়ি, হালুয়াঘাট
২৩. মোসলেম খারিফা, উত্তর খয়রাকুড়ি, হালুয়াঘাট
২৪. মোঃ আজিজুল ইসলাম, কতলমারি, গাজীরভিটা, হালুয়াঘাট
২৫. মোঃ হরমুজ আলী, লামুক্তা, গাজীরভিটা, হালুয়াঘাট
২৬. রিয়াজ উদ্দিন (মৃত), মনিকুড়া, হালুয়াঘাট
২৭. দেওয়ান, পোঃ+হালুয়াঘাট
২৮. আলী, পোঃ+হালুয়াঘাট
২৯. আবু, পোঃ+থানা : হালুয়াঘাট
৩০. সাইফুল ইসলাম ভেণ্ডার (মৃত) সুমনিয়াপাড়া, হালুয়াঘাট
৩১. আঃ হেকিম (মৃত) মনিকুড়া, হালুয়াঘাট
৩২. নুরুল ইসলাম (নুরু) তেলিখালী, হালুয়াঘাট
৩৩. আঃ মতিন, ইসলামপুর, হালুয়াঘাট
৩৪. রমজান আলী, ইসলামপুর, হালুয়াঘাট
৩৫. আকরাম হোসেন, ইসলামপুর, হালুয়াঘাট
৩৬. আব্দুল বারেক (মৃত), ইসলামপুর, হালুয়াঘাট
৩৭. হেদায়েথ উল্লাহ, ইসলামপুর, হালুয়াঘাট
৩৮. মোঃ আব্দুল হাই, ভুবনকুড়া, হালুয়াঘাট
৩৯. সৈয়দ মনা হাজী, দরিনগুয়া, হালুয়াঘাট
৪০. মোঃ শামছুল ইসলাম খলিফা, বীরগুছিনা পোঃ ধারাবাজার, থানা হালুয়াঘাট
৪১. তোজী মাসুদ, মাঝিয়ালী, পোঃ ধারাবাজার, হালুয়াঘাট
৪২. মোঃ মোফাজ্জল হোসেন খাঁ, পিতা আরমান আলী খাঁ, মাঝিয়ালী, হালুয়াঘাট
৪৩. রামজাদ আলী, পিতা : তাসির উদ্দিন, ধারা, পোঃ ধারাবাজার, হালুয়াঘাট
৪৪. হারেজ আলী, পিতা হাসেন আলী, ধারা হালুয়াঘাট

৪৫. আরেজ আলী, পিতা : কিওতা শেখ, ধারা, হালুয়াঘাট
৪৬. সামছু, (মৃত), পিতা : জারু শেখ, সাং : ধারা, হালুয়াঘাট
৪৭. শরাফ উদ্দিন, পিতা : ফটিক খাঁ, মাঝিয়ালী, পোঃ ধারা বাজার, হালুয়াঘাট
৪৮. আরমান, পিতা : লহর খাঁ, সাং : মাঝিয়ারী, হালুয়াঘাট
৪৯. আব্দুর রউফ (ঠাণ্ডু ড্রাইভার), দরিনগুয়া, পোঃ ধারা বাজার, হালুয়াঘাট
৫০. আমির, সংরা, পোঃ : বাঘাইতলা, হালুয়াঘাট
৫১. আজমত আলী, পিতা : তাসিরউদ্দিন, ধারা বাজার
৫২. হারেজ আলী, পিতা : হাসেন আলী, ধারা
৫৩. মারেজ আলী, পিতা : কিওতা শেখ, ধারা
৫৪. সামছু, মৃত পিতা : জারু শেখ, ধারা
৫৫. আব্দুর রউফ (ঠাণ্ডু ড্রাইভার) পিতা মৃত কনে পিরন দরিনগুয়া, পোঃ ধারাবাজার
৫৬. মোঃ আব্দুল বারেক, পিতা হাজী মোঃ খালেক কয়রাহাটি (লালারপাড়) আওয়ামী লীগ ক্ষমতার সময় সভাপতি ছিল
৫৭. মোৎ আজিজুল ইসলাম, কাতলমারী, পোঃ গাজীরভিটা, হালুয়াঘাট

[১৩]

১৭৬. ঢাকা শহরের বিভিন্ন শান্তিকমিটি

'ঢাকা, ১১ই মে। বিভিন্ন এলাকায় আরও ২৫টি শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপিতে জানান হইয়াছে।

নবগঠিত কমিটিগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল :

১. পুরানা মোগলটুলি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব আবদুর রাজ্জাক।
২. কোন্ডা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব আবদুল ওয়াদুদ।
৩. শুভাড্যা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : হাজি আবদুস সামাদ বেপারী।
৪. কালিন্দি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : আবদুল ওয়াদুদ।
৫. যাত্রাবাড়ী ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : আব্বাস উদ্দিন আহমদ।
৬. দেওয়ান বাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : চাঁদ মিয়া।
৭. সিদ্দিক বাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী।
৮. মওলবী বাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : হাফিজ উদ্দিন আহমদ।
৯. নারিন্দা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : হাফিজ উদ্দিন আহমদ।
১০. জিন্দাবাহার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব মোহাম্মদ সোখী।
১১. ফরিদাবাদ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব খন্দকার হাবিবুর রহমান।
১২. আজিমপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব হাফিজ আবদুল কাশেম।

১৩. কাউন্দিয়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব আজিজুর রহমান।
১৪. সাভার থানা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব আবদুল হালিম।
১৫. শ্যামপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব ফজলুল করিম।
১৬. ওয়ারি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব এ রহিম।
১৭. টঙ্গীবাড়ী ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব মজিবর রহমান মল্লিক।
১৮. আবদুল্লাহপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : আলহাজ্ব তাহের আহমদ।
১৯. টঙ্গীবাড়ী থানা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব সিরাজুল ইসলাম মল্লিক।
২০. নওয়াপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব সৈয়দ মহসীন আলী।
২১. ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ মোবারক হোসেন।
২২. টঙ্গী ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব আবদুল মজিদ সরকার।
২৩. জিঞ্জিরা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব মোহাম্মদ হোসেন।
২৪. চকবাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব মহিবুজ্জামান
২৫. চুরিহাট্টা মহল্লা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : হাজি সলিমুল্লাহ মিয়া।

সাবেক এম. এন. এ. জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীকে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা শান্তিকমিটি সংগঠনের আহবায়ক নিয়োগ করা হইয়াছে।

দৈনিক আজাদ ২২ মে ১৯৭১



ষষ্ঠ পর্ব

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন

ঢাকায় নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন

নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত শুক্রবার ঢাকায় খাজা খায়ের উদ্দিনকে আহবায়ক করে ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করা হয়েছে। এপিপি'র খবরে প্রকাশ, কমিটি মঙ্গলবার জোহর নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার মসজিদ পর্যন্ত এক মিছিল বের করেন। কমিটি এক কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে কাজ করার পরিকল্পনা করছে। গত ৯ই এপ্রিল ঢাকায় প্রতিনিধিত্বশীল নাগরিকদের এক সভায় এক শান্তিকমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি খাজা খায়ের উদ্দিনকে আহবায়ক মনোনীত করেছেন।

কমিটিতে মোট ১৪০ জন সদস্য রয়েছেন। এই কমিটির বৃহত্তর ঢাকায় ইউনিয়ন ও মহল্লা পর্যায়ে অনুরূপ কমিটি গঠনের ক্ষমতা রয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় এগুলো কাজ করবে। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কমিটি সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কমিটি প্রথম দফায় এই মাসের ১৩ই এপ্রিল মঙ্গলবার জোহর নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার মসজিদের কাছে পর্যন্ত একটি মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত করেন।

কমিটিতে অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন : এ. কিউ. এম. শফিউল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, আবদুল জব্বার খদ্দর, মাহমুদ আলী, এম. এ. কে. রফিকুল হোসেন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবুল কাশেম, এম. ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, সৈয়দ আজিজুল হক, এ. এস. এম. সোলায়মান, পীর মোহসেনউদ্দিন, এডভোকেট শফিকুর রহমান, মেজর আফসার উদ্দিন, সৈয়দ মোহসিন আলী, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ্ব সিরাজউদ্দিন, এডভোকেট এ. টি. সাদী, এডভাকেট আতাউল হক খান, মকবুবুর রহমান, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আকিল, অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, ইয়ং পাকিস্তান সম্পাদক নূরুজ্জামান, মওলানা মিয়া মফিজুল হক, এডভোকেট আবু সালেক, এডভোকেট আবদুল নায়েম ও অন্যান্যরা।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সভা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্থানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে। এই বিপজ্জনক খেয়াল—যা মহাযুদ্ধের পথে এগুতে পারে—লিপ্ত না হওয়ার জন্য এই সভা ভারতীয় নেতাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। এই সভা মনে করে যে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে হিন্দুস্থান বস্তুত্যঃপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশপ্রেমে চ্যালেঞ্জ করছে। এই সভা আমাদের প্রিয় দেশের সংহতি ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই চ্যালেঞ্জ সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আকুল আহবান জানাচ্ছে।'

দৈনিক পাকিস্তান : ১১ এপ্রিল ১৯৭১

মৌলভী ফরিদ আহামদের নেতৃত্বে আরো একটি কমিটি গঠন

ঢাকা, ১২ই এপ্রিল। শান্তিরক্ষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনা এবং দেশের এই অংশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় মিথ্যা প্রচারণা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে গত শনিবার মৌলভী ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এছলামিক রিপাবলিক পার্টির সভাপতি মওলানা নূরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁহাকেই ষ্টিয়ারিং কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। জনাব কোরবান আলী (বার-এট-ল), জনাব ওয়াজী উল্লাহ খান, জনাব আজিজুর রহমান, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, কাজী ফিরোজ সিদ্দিকী, চট্টগ্রামের এডভোকেট জনাব এ. কে. এম. নূরুল করিম নির্বাচিত এমপিএ (স্বতন্ত্র) জনাব মাহমুদ আলী কমিটির কার্য্যনির্বাহক সদস্য থাকিবেন। বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য আগামী ১৪ই এপ্রিল কমিটি এক বৈঠকে মিলিত হইবে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সর্বত্র আস্থার ভাব ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় বেতারের মিথ্যা প্রচারণা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটি পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিল সংগঠন করিবে।

কার্যকরীভাবে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবেলা এবং ভারতীয় প্রচারণায় কর্ণপাত না করিয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণে জনসাধারণকে উৎসাহিত করাই হইবে কাইন্সিল সমূহের অন্যতম লক্ষ্য।

দৈনিক আজাদ ১৩ এপ্রিল ১৯৭১

ঢাকায় শান্তিকমিটির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ঢাকা শহর শান্তিকমিটির আহবানে ঢাকার শান্তি প্রিয় নাগরিকগণ গতকাল (মঙ্গলবার) বিকাল পৌনে তিনটায় বায়তুল মোকররম প্রাংগন হইত এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বাহির হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পবিত্রভূমিতে ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে এই মিছিল বাহির করা হয়।

খাজা খয়ের উদ্দিন, আব্দুস সবুর খান, গোলাম আজম ও শফিকুল ইসলাম প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাসহ সমাজের বিভিন্ন স্ত রের নাগরিক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি নবাবপুর রোড, সদরঘাট, পাটুয়াটুলী, ইসলামপুর, মিটফোর্ড, চকবাজার ও আজিমপুর হইয়া নিউমার্কেটে গমন করে।

প্রবল ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া মিছিলকারীরা বিভিন্ন শ্লোগান খচিত শতশত ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করে। বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুনে "ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক", পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ কর", 'ভারত ভারত হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার', 'ভারতীয় এজেন্টরা সাবধান সাবধান' প্রভৃতি শ্লোগান লিখিত মিছিলে জাতির পিতা কায়েদে আজম, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কায়েদে মিল্লাত, লিয়াকত আলী খান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিরাট প্রতিকৃতি বহন করা হয়। পথিপার্শ্বে ও বিভিন্ন ভবনের উপরে অপেক্ষমান হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধ বনিতা "পাকিস্তান জিন্দাবাদ", "কায়েদে আজম জিন্দাবাদ" প্রভৃতি শ্লোগানের মাধ্যমে মিছিলকারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

মিছিলকারীরা পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, ইয়াহিয়া খান জিন্দাবাদ, টিক্কা খান জিন্দাবাদ, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, ভারতীয় এজেন্টরা হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, ভারতীয় অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করিব না, "পাকিস্তানকা মতলব কিয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু", আমার নেতা তোমার নেতা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা", মুসলিম মুসলিম জেগেছে প্রভৃতি শ্লোগান ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করিয়া তোলে।

মিছিল শেষে খাজা খায়ের উদ্দিন এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে অধ্যাপক গোলাম আজম পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি কামনা করিয়া মোনাজাত করেন।'

দৈনিক আজাদ ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

মোছলেম লীগ নেতৃবৃন্দের সর্বত্র শান্তিকমিটি গঠনের আহবান

ঢাকা, ১২ই এপ্রিল। পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগের (ফজলুল কাদের গ্রুপ) প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুল হুদা ও সাধারণ সম্পাদক জনাব এ. এন. এম. ইউসুফ দেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার, সর্বপ্রকার সন্দেহ প্রবণতা দূরীকরণ, মিথ্যা

গুজব উত্তেজনা সৃষ্টিকর অলীক কাহিনী প্রচারে বিরত করার উদ্দেশ্যে প্রদেশে সকল পার্টির ইউনিটকে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে লইয়া কমিটি গঠনের জন্য স্ব-স্ব অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালানোর আহবান জানাইয়াছেন।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মোছলেম লীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, এই মুহূর্তে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশে পরিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। এমতাবস্থায় তাঁহারা দলীয় ইউনিগুলিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কমিটি গঠনের আহবান জানান।

বিবৃতিতে তাঁহার বলন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণকে মিথ্যা প্রচারণা ও উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী শোনাইয়া বিভ্রান্ত করা সম্ভব হইবে না। ভারত পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ করায় এদেশের জনগণ একবাক্যে উহার নিন্দা করিয়াছে। তাঁহারা বলেন, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য ভারতের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ রহিয়াছে।

দৈনিক আজাদ ১৪ এপ্রিল ১৯১৭

মওলবী ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে প্রাদেশিক শান্তিকমিটির সভা

"এছলাম ও পাকিস্তানের দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ"

ঢাকা, ১৪ই এপ্রিল।—মওলবী ফরিদ আহমদের সভাপতিত্বে আজ প্রাদেশিক শান্তি ও জনকল্যাণমূলক ষ্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ষ্টিয়ারিং কমিটির প্রাদেশিক ও ইউনিট পর্যায়ে গৃহীত আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে মওলবী ফরিদ আহমদ সভায় বক্তৃতা করেন।

সভায় মওলানা নূরুজ্জামান ষ্টিয়ারিং কমিটির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, কমিটি সারা প্রদেশব্যাপী তাহার তৎপরতা অব্যাহত রাখিবে এবং কমিটির মূল লক্ষ্য হইতেছে জনমনে আস্থার ভাব পুনরুদ্ধার করা এবং জীবনের সর্বপর্যায়ে স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনা। জনাব নূরুজ্জামান কমিটির লক্ষ্য সম্পর্কে আরও বলন যে, এছলাম ও পাকিস্তানের দুশমনের সহিত সংগ্রাম করার জন্য জনগণকে প্রস্তুত রাখার ব্যাপারেও আমাদের তৎপরতা অব্যাহত থাকিবে।

দৈনিক আজাদ ১৫ এপ্রিল ১৯১৭

ঢাকায় ইউনিয়ন ও মহল্লায় শান্তিকমিটি গঠনের জন্য কনভেনর মনোয়ন

ঢাকা, ১৯শে এপ্রিল।—শহরের ইউনিয়ন ও মহল্লায় শান্তিকমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি কনভেনার মনোয়ন করিয়াছেন। বহু স্থানে ইতিপূর্বেই ইউনিট

কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ইউনিট কমিটিসমূহের কার্যকলাপ সম্পর্কে যাবতীয় খবর, ৫, এলিফ্যান্ট লেন, মগবাজার, ঢাকা ঠিকানায় কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় অফিস ২৪ ঘন্টা খোলা থাকিবে এবং অফিস সেক্রেটারী এডভোকেট জনাব নূরুল হক মজুমদার সর্বসাধারণের সমস্যাবলী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অফিসে অবস্থান করিবেন।

প্রদেশের সর্বত্র শান্তিকমিটি গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য প্রতিদিন শান্তিকমিটির বৈঠক হইয়া থাকে। জনসাধারণকে স্বাভাবিকভাবে জীবনে যাত্রার নির্বাহে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার জন্য এবং বিভিন্ন স্থানে ইউনিট শান্তিকমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি বিভিন্ন জেলায় ও মহকুমায় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কমিটির তরফ হইতে উহার সদস্যদের মধ্যে হইতে লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে। তাঁহারা জনসাধাণের অসুবিধাদি সম্পর্কে তথ্যাদি গ্রহণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আর্মি সেক্টরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ঐগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করিয়াছেন।

প্রতিদিন কেন্দ্রীয় অফিসে রিপোর্ট দাখেলের জন্য লিয়াজোঁ অফিসারদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোতোয়ালী থানা

১. জনাব আজিজ আহমেদ শাহ, আহসান মঞ্জিল, ৯৭, আহসানুল্লাহ রোড, ঢাকা। ফোন : ২৪৬৩৪০।
২. জনাব মোহাম্মদ সাকী সুলতান, ১২, কাশাইটাব, ঢাকা, ফোন : ২৫১৩৫১।

লালবাগ থানা

১. আলহাজ্ব নাজির হোসেন চেয়ারম্যান, লালবাগ ইউনিয়ন কমিটি, ৫৩, জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা, ফোন : ২৫৩৬৮১।
২. জনাব এস.এম. হাবিবুল হক, হাউস নং ৬১২, রোড নং ১৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন : অফিস ২৫০৮০৬, বাসা ২৫৪০৬৪।
৩. জনাব নোয়া আলী, অ্যাডবোকেট, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা, ফোন ২৫০২৬১।

সূত্রাপুর থানা

১. আলহাজ্ব সিরাজুদ্দীন প্রাক্তন এমপিএ, ৯১, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা, ফোন : অফিস ২৮১৩৪১, বাসা ২৮২৫৪০।
২. জনাব মাহতাবুদ্দীন খান ৫৪, আর.কে, মিশন রোড, ঢাকা, ফোন ২৪৫৩৫৪।

৩. ফজলুল হক, ১২, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, ফোন : ২৫৭৫৯৬।
৪. জনাব তমিজউদ্দিন, ৩১, জরিয়াত আলী লেন, ফোন : ২৫৭২৫৬।
৫. জনাব আবদুর রশীদ, ১৬ হাটখোলা রোড, ফোন : ২৫০৯০৯।

তেজগাঁও থানা

১. জনাব ইকবাল ইদরিস, ৭৫, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকা, ফোন অফিস ২৫১১০৭, বাসা ৩১০৯৮০।
২. জনাব মাহবুবুর রহমান, গুরহা, ফোন : ৩১১১৭১।
৩. এম.এস.এস. হাবিবুল হক, হাউস নং ৬১২, রোড নং ১৮, ধানমন্ডি, ফোন : অফিস ২৫০৮০৬, বাসা ২৫৪০৬৪।
৪. জনাব নোয়াব আলী, হেড মাষ্টার আই.পি.এইচ. স্কুল মহাখালী (অয়্যারলেস কলোনীর নিকট)

মীরপুর থানা

১. জনাব লাইক আহমেদ সিদ্দিকী, ২৬, এ/সি মীরপুর ফাষ্ট কলোনী, ঢাকা।

মোহাম্মদপুর থানা

১. জনাব এম.এ. বারেক, ৩০/৬, মোহাম্মদপুর কলোনী, ফোন ৩১১৫৩৮।
২. ডা. ওসমান ('এ' ব্লকের মসজিদের নিকট) মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন : অফিস ৩১১২৬৮, বাসা ৩১৬৬৯৫।
৩. জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ ফারুক, কায়দে আজম রোড, (রাফাকাত খানের বাড়ির নিকট) মোহাম্মদপুর, ঢাকা, পোন : ২৫৪৮০৮।
৪. জনাব শফিকুর রহমান, অ্যাডভোকেট, ৬৮, ঝিকাটোলা, ঢাকা, ফোন : ২৪৬৪৬৭।
৫. জনাব আবদুর রহমী চৌধুরী, হাউস নং ৭৯০, হাউস নং ৭৯০, রোড নং ৯৯, ধানমন্ডি আর, এ ঢাকা, ফোন : ৩১১০৩৩।

রমনা থানা

১. আতাউল হক খান অ্যাডভোকেট, ১৯৭, বড় মগবাজার, ঢাকা।
২. জনাব জি, এ, খান, অ্যাডভোকেট ২৪, দিলু রোড, এস্কাটন ঢাকা-২, ফোন : ২৫৪০৩৫।
৩. প্রফেসার এ, হাশেম।
৪. জনাব জুলমত আলী খান, অ্যাডভোকেট, ১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২, ফোন : ২৫৪৮৫৫।

৫. জনাব মোহাম্মদ আয়ুব আলী, সি-৫৮৭, এ চৌধুরীপাড়া, খিলগাঁও, ফোন : ২৫৪৮০৮।
৬. অ্যাডভোকেট এ, ওয়াদুদ মিয়া, শান্তিনগর, ঢাকা।"

দৈনিক আজাদ ২০ এপ্রিল ১৯৭১

ঢাকা শহর সর্দারদের বৈঠক
"কর্তৃপক্ষের সহিত একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত"

'ঢাকা, ১৮ এপ্রিল।—সাবেক প্রাদেশিক উজির ও ঢাকায় নওয়াব হাসান আসকারীর বাসভবনে ঢাকা শহরের শীর্ষ স্থানীয় সর্দারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত সর্দারদের মধ্যে জনাব আবু নাসের, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী আবদুল মাজেদ সরকার (ঢাকা হোটেলের মালিক), শিল্পপতি জনাব সিরাজুদ্দীন সভায় যোগদান করেন। বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে মৌলভী ফরিদ আহমদ ও মৌলভী মুহাম্মদ নুরুজ্জামান (যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক) বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সর্দারগণ পরিষদের কর্মতৎপরতার সুযোগ ও সেবা সম্পর্কে জানিতে চাহেন। তাহারা তাহাদের সম্মুখে যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, সে ব্যাপারে তাহারা কতখানি সহযোগিতা করিতে পারেন, সে সম্পর্কেও জানতে চান। তাহাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা সম্মত হন যে, শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে সকল উদ্যোগ পরিচালিত হইতে হইবে। তাহারা এ ব্যাপারে সকল প্রকার সহযোগিতা ও সমর্থনের নিশ্চয়তা দেন। তাহারা শহরের সকল সর্দারদের একটি বৃহৎ সভার আয়োজন, একটি বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত একযোগে কাজ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।'

দৈনিক আজাদ ২০ এপ্রিল ১৯৭১

ঢাকা সমিতির নেতৃবৃন্দের বিবৃতি
"স্বাভাবিক পেশাগত কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আহবান"

ঢাকা, ১৯ এপ্রিল।—ঢাকা সমিতির নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি প্রসংগে নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন প্রকার আশংকা না করিয়া স্বাভাবিক পেশাগত কাজকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ, ঢাকা শহরের সর্দারগণ এবং ঢাকা সমিতির কর্মকর্তাগণ শহরের প্রত্যেক অধিবাসীকে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তাহাদের তল্পিবাহকদের এছলাম ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার প্রতি কর্ণপাত না করার জন্য আবেদন করিতেছি।

আমরা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ঢাকায় পাকিস্তানের এই ভূমিতে ১৯০৫ সালে শাহবাগে পাকিস্তানের বীজ সর্বপ্রথম বপন করা হয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে এই ঢাকা শহরেই ভারতীয় ও পাকিস্তানের বীজ অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এক নম্বর ঘাঁটি হিসাবে থাকিবে। শহরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাত্রা কায়েম হইয়াছে এবং আল্লাহর দোওয়ায় নাগরিকগণ শহরে ও সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শূন্যতা পূরণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের সহিত সহযোগিতায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন।

মৌলভী ফরিদ আহম্মদের নেতৃত্বে ও পরিরচালনাধীন গঠিত পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের কর্মতৎপরতার প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাইতেছি। জানমালের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন প্রকার আশংকা অথবা সন্দেহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিক পেশাগত কাজকর্মে প্রবত্ত হওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকের নিকট আবেদন জানাইতেছি। পরিশেষে আমরা ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বীর সশস্ত্র সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বাক্ষরকারীগণ সিরাজুদ্দীন আহমদ, প্রেসিডেন্ট ঢাকা সমিতি; মাজেদ আলী সর্দার, ঢাকা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ, মওলাবখশ সরদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা সমিতি; এস. এ. ওয়াজেদ আলী, জেনারেল সেক্রেটারী, ঢাকা সমিতি ও আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলিম শাহাবুদ্দীন আহমদ।

দৈনিক আজাদ ২০ এপ্রিল ১৯৭১

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ২০শে এপ্রিল। কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির কার্য্যনির্বাহক কমিটি গতকাল এক বৈঠকে মিলিত হইয়া প্রদেশের সর্বত্র শান্তিকমিটি গঠনের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এস. কে. খায়েরুদ্দিন। কমিটির লালবাগ এলাকায় জনাব এস. হাবিবুল হকের স্থলে জনাব মাহাবুবুজ্জামানকে একজন লিয়াজোঁ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। রমনা থানা লিয়াজোঁ অফিসার হিসাবে ৩৭৫, উত্তর শাহজাহানপুরের জনাব ফজলুল হক চৌধুরী, ১৫১, দক্ষিণ কমলাপুরের শাহ মফিজুদ্দিন, ২২৫, মালিবাগের জনাব আবদুল হাইকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির দৈনন্দিন কাজ কারবার পরিচালনার জন্য নিম্ন বর্ণিত সদ্যদের লইয়া কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়।

১. জনাব এ. এম. শফিকুল ইসলাম।
২. অধ্যাপক গোলাম আজম।
৩. জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর।
৪. জনাব এ. কে. এম. সোলায়মান।
৫. জনাব আবদুল মতিন।
৬. এস. কে. খায়েরুদ্দিন।

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব এস. কে. খায়েরুদ্দিনের অনুপস্থিতিতে জনাব কিউ এম. শফিকুল ইসলাম, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর এবং মনসুর আলী আরামবাগ এলাকা সফর করিয়া শান্তিকমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেন। স্থানীয় জনসাধারণ অবিলম্বে শান্তিকমিটি গঠনের কাজ হাতে লইয়াছেন।

দৈনিক আজাদ ২২ এপ্রিল ১৯৭১

শান্তিকমিটি প্রতিনিধিদের জেলা ও মহকুমায় পাঠানো হচ্ছে

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির মিশন পূরণের জন্য জেলাও মহকুমা সদর দফতরের কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির প্রতিনিধীদের পাঠানো হচ্ছে।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রটনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে গতকাল রোববার এপিপি জানিয়েছে যে, ইতিমধ্যেই যদি এ ধরণের কোন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে এসব কমিটিকে স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় অফিসে তাদের নাম পাঠাতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকৃত শান্তিকমিটির রির্পোট দেবে।

তাছাড়া ঢাকা শহরে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি স্কোয়াড বের করা হচ্ছে। শহর ও শহরের আশেপাশে আরও ১৬টি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে ...

দৈনিক পাকিস্তান ২৬ এপ্রিল ১৯৭১

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তি

"শান্তিকমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে জেলা ও মহাকুমাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে।"

ঢাকা, ২৫ শে এপ্রিল। কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির মিশন পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা সদর দফতরে কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির প্রতিনিধিদের পাঠান হইতেছে।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রটনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হইয়াছে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল রবিবার জানান হইয়াছে যে, ইতিমধ্যেই যদি এই ধরনের কোন কমিটি গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সব কমিটিকে স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির কেন্দ্রীয় অফিসে তাহাদের নাম পাঠাইতে বলা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট স্বীকৃত শান্তি কমিটি রিপোর্ট প্রদান করিবে।

তাহা ছাড়া ঢাকা শহর পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির উদ্যেগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি স্কোয়াড বাহির করা হইয়াছে।

শহর ও শহরতলীতে আরও ১৬টি শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে।

১. পূর্ব তেজগাঁও ইউনিয়ন শান্তিকমিটি—মো. ফজলুর রহমান।
২. ধানমণ্ডি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি—এস. এম. হাবিবুল হক।
৩. নারায়ণগঞ্জ শহর শান্তিকমিটি—আবদুল আজিজ সরদার।
৪. দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি—মোহাম্মদ মনসুর আলী।
৫. জোয়ার শাহারা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি—পেয়ার আলী আহসান।
৬. শরাফতগঞ্জে ইউনিয়ন শান্তিকমিটি—গিয়াস উদ্দীন আহমদ।
৭. খিলগাঁও ইউনিয়ন শান্তিকমিটি—ডা. মোহাম্মদ আইয়ুব আলী।
৮. নবীনগর থানা শান্তিকমিটি—(কুমিল্লা জেলা) মওলবী সেকান্দার আলী।
৯. জয়দেবপুর থানা শান্তিকমিটি—আবদুল মজিদ সরদার।
১০. জয়দেবপুর থানা শান্তিকমিটি—মোহাম্মদ মোস্তান খান।
১১. রেকাবী বাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি—ইদ্রিস বেপারী।
১২. মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি—দেওয়ান ওয়ারেসাত আলী।
১৩. দিলু রোড মহল্লা শান্তিকমিটি—জি. এ. খান।
১৪. নিউ ইস্কাটন শান্তিকমিটি—মজিবুর রহমান।
১৫. পূর্ব ধানমন্ডি শান্তিকমিটি—এম. এ. খালেক।
১৬. মহাখালী মহল্লা শান্তিকমিটি-এ. কে. এম. আবদুল্লাহ খান।

দৈনিক আজাদ ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

নেজামে ইসলাম নেতা মাওলানা আহমদ সগীরের বিবৃতি

‘ভারতের বর্তমান বিরূপ আচরণ বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে’

চট্টগ্রাম, ৯ই জনু। নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাচিত এমপি ও মাওলানা আহমদ সগীর শাহজাদা আজ বলেন যে, ভারতের ‘বাংলাদেশ’ মিথ্যা প্রচারের মোহে

পড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে গমনকারী মুসলমানদের প্রতি ভারতের বর্তমান বিরূপ আচরণ, যাহারা ভারতীয় চক্রান্তের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছে; তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। চট্টগ্রামের বাঁশখালী নির্বাচনী কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত এমপিএ মওলানা আহমদ বলেন, বর্তমানে প্রত্যেক পাকিস্তানী তাহাদের প্রিয় দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষা করিতে এবং ভারতের যে কোন কারসাজি ব্যর্থ করিয়া দিতে দৃঢ়চিত্ত ও সতর্ক রহিয়াছে।

নেজাম ইসলাম পাটির নেতা বলেন যে, ছয় দফা কর্মসূচিতে যাহা কিছু ছিল, ভারতীয়চর ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সৃষ্ট গোলযোগ ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান তাহার চাইতে অনেক বেশি অঘটন ঘটিয়াছে।

নিজামে ইসলাম পার্টির নেতা বলেন যে, ছয় দফা কর্মসূচিতে যাহা কিছু ছিল, ভারতীয়চর ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সৃষ্ট গোলযোগ ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান তাহার চাইতে অনেক বেশি অঘটন ঘটিয়াছে।

মাওলানা ছাহেব যথাসময়ে শত্রুর ক্রুর চক্রান্ত নস্যাৎকারী আল্লাহ আশীর্বাদপুষ্ট আমাদের সেনাবাহিনীকে অভিনন্দিত করেন।

দৈনিক আজাদ ১০ জনু ১৯৭১

কক্সবাজারে নাগরিক সভা

কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত জীবনের সর্বস্তরের প্রতিনিধি সম্বলিত ৭৯ জন নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের এক সভায় কক্সবাজার মহকুমার সকল দেশপ্রেমিক ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কাছে দুষ্কৃতিকারী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বন্দী ও উচ্ছেদ করার এবং তাহাদেরকে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশন কিংবা সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে সোপর্দ করার আহবান জানান হইয়াছে।

উক্ত সভায় সাতজন রাষ্টবিরোধী ব্যক্তিকে বন্দী ও উচ্ছেদের জন্য এবং কক্সবাজার টেজারী ও সাব জেলকে রক্ষা করার ব্যাপারে বাহারচরা এলাকার আনসার, মুজাহিদ ও জনগণ পুলিশকে যে বীরোচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন সেই জন্য তাহাদের সকলের প্রতি সশ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

উক্ত দুষ্কৃতিকারী উচ্ছেদ অভিযানের নেতৃত্ব করেন জনাব মকবুল আহমদ, জনাব নাছির, জনাব এম. এ. জলিল সওদাগর, জনাব তানহা মিয়া, জনাব সিরাজ আহমদ এবং আরও কয়েকজন।

উক্ত সভায় এডভোকেট জনাব মইদুর রহমান চৌধুরীকে আহবায়ক নির্বাচিত করিয়া প্রাদেশিক পরিষদের প্রাক্তন সদস্য জনাব জাফর আলম চৌধুরীসহ আরও দশজন সদস্য সম্বলিত একটি শান্তি ও কল্যাণ কমিটি গঠিত হয়।

দৈনিক আজাদ ২১ মে ১৯৭১

চট্টগ্রাম জেলা শান্তিকমিটির সভা

চট্টগ্রাম অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলা শান্তিকমিটির এক সাধারণ সভা চট্টগ্রাম শহর ও জেলার সর্বত্র পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আসার ব্যাপারে উক্ত শান্তিকমিটি স্থানীয় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতার জন্য যেসব পন্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়।
উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলা পিডিপির সভাপতি ও চট্টগ্রাম জেলা শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব মহমুদুন্নবী চৌধুরী।

দৈনিক আজাদ ২১ মে ১৯৭১

নোয়াখালীর পল্লীতে জনসভা
'পাকিস্তানের সংহিত রক্ষার আহবান'

নোয়াখালী, ২৮শে আগস্ট। সম্প্রতি এখলাসপুরে সদর মহকুমা শান্তিকমিটি-উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আদিলুজ্জামান এবং ভাষণ দান করেন নোয়াখালী মোছলেম লীগ ও শান্তিকমিটির সেক্রেটারী জনাব আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য নেতা।

জনাব সুফিয়ান ভাষণ দানকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহিত রক্ষাকল্পে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য রাজাকারদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চিরদুশমন ভারতের জঘন্য কার্যকলাপেরও তীব্র নিন্দা করেন।

ডা. আদিলুজ্জামান মিথ্যাবাদী দুশমনদের বেতার প্রচারণা শ্রবণ না করিয়া নিয়মিতভাবে পাকিস্তান রেডিওর অনুষ্ঠান শুনার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানান।

দৈনিক আজাদ ২৯ আগস্ট ১৯৭১

নায়ায়ণগঞ্জ বন্দর ইউনিয়ন ও বগুড়া জেলা শান্তিকমিটির সভা
'ভারতের যে কোন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা'

নারায়ণগঞ্জ ৯ই জুন। গতকাল সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বপাড়স্থ বাবুপাড়ায় জনাব মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে বন্দর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটির ৫০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। বন্দর ইউনিয়ন শান্তিকমিটির আহবায়ক এবং নারায়ণগঞ্জ শহর মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাব মো. ফইজুল হক, জনাব হাবিবুর রহমান, জনাব ফজুল হক এবং সভাপতি স্বয়ং।

তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্থানের ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পাক সেনাবাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপ ও পাকিস্তানের শত্রুদের দেশ হইতে চিরতরে বিতাড়ন করায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ হিন্দুস্থানের দাসত্ব শৃংখলের অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সভায় বিশ্বের বৃহত্তম মোছলেম দেশ পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা ও হিন্দুস্থানের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করা হয়। সভাপতি দেশে শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার আহবান জানান। তিনি শান্তিকমিটির বাণী প্রতিটি মহল্লায় ও গ্রামে পৌঁছাইয়া দেওয়ার এবং জনসাধারণকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সজাগ থাকিতে আহবান জানান, যাহাকে গণ-দুশমনরা জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার বিভ্রান্তি ও অঘটন ঘটাইতে না পারে।

দৈনিক আজাদ ১১ জুন ১৯৭১

বগুড়ায় শান্তিকমিটি সভা

বগুড়া, ৭ই জুন। সম্প্রত্তি বগুড়া সেন্ট্রাল হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বগুড়া জেলা শান্তি কমিটির সভাপতি জনাব ডা. হাবিবুর রহমান ছাহেবের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হঁয়। সভায় হিন্দুস্থানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের এবং হিন্দুস্থানের ক্রীড়নক অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের দেশ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং হিন্দুস্থানের যে কোন ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার কঠিন সংকল্প গ্রহণ করা হয়। সভায় কমিটি সহ-সভাপতি প্রিন্সিপাল মওলানা নজিবুল্লা ছাহেব ও বগুড়া জেলা জামায়াতের ইসলামীর আমীর ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মওলানা আবুদর রহমান দুষ্কৃতিকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গণ-বিরোধী কার্যকলাপের ফিরিস্তি বর্ণনা করেন এবং পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিত প্রদানের জন্য জনসাধারণের নিকট অনুরোধ কনে। গত ৩০শে মে অনুরূপ একটি সভা স্থানীয় চকফরিদ কলোনীতে অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক আজাদ ১১ জুন ১৯৭১

কিশোরগঞ্জ মহকুমা শান্তিকমিটির জনসভায় মোছলেহ্ উদ্দিনের ঘোষণা
'জনগণ দেশের সংহতি রক্ষাকল্পে শেষ রক্তবিন্দু দিতে প্রস্তুত'

'মহকুমা শান্তিকমিটির সভাপতি জনাব মোছলেহ্ উদ্দিন বলেন যে, জনগণ পাকিস্ত ানের সংহতি ও কল্যাণের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়া সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত।

এখানে মহকুম শান্তিকমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণদান কালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি পাকিস্তান বিরোধী লোকদের গুজবে কোনরূপ কর্ণপাত না করিয়া সতর্কতার সহিত দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যাওয়ার

জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। অধ্যাপক মাহতাব উদ্দিন আহমদ, জনাব শফিকুল হোসেন, জনাব বদিউজ্জামান প্রমুখ বক্তা বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি মোবারকবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

দৈনিক আজাদ ১২ জুন ১৯৭১

পিরোজপুর মহকুমা শান্তিকমিটি গঠন

বরিশাল, ৭ই মে।—নিখিল পাকিস্তান মোছলেম লীগের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক উজির খান বাহদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালকে সভাপতি করিয়া পিরোজপুর মহকুমা শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে। নবগঠিত মহকুমা শান্তিকমিটি সর্বতোভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। মহকুমায় ইতিমধ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়া আসিয়াছে। শহরের সবকয়টি বাজার দোকানপাট খুলিয়া গিয়াছে। বর্ধিত সংখ্যায় লোকজন অফিসে যোগদান করিতেছে এবং বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু হইয়াছে। নিরাপরাধ জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের একমাত্র হেতু দুষ্কৃতিকারীদের সকল নেতা নির্মূল হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এখানকার জীবন-ব্যবস্থা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে এবং জনসাধারণ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতেছে।

দৈনিক আজাদ ৮ মে ১৯৭১

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সিনিয়র সদস্য আব্দুর জব্বার খদ্দরের বিবৃতি
"সেনাবাহিনীর সময়োচিত ব্যবস্থার প্রশংসা"

ঢাকা, ৩০ মে।—পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের প্রাক্তন চীপ হুইপ জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষকল্পে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, চট্টগ্রামের জনসাধারণ উহার ভুয়াসী প্রশংসা করে।

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির কার্যনির্বাহক সংস্থার অন্যতম সিনিয়র সদস্য জনাব জব্বার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, দুষ্কৃতিকারী ও রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে জনগণ সেনাবাহিনীকে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা দান করে।

তিনি বলেন যে, চট্টগ্রামের দেশদরদী ও সাহসী মুছলমানদের সর্বাত্মক চেষ্টার ফলেই প্রায় সব কয়িটি সেতু ও সড়ক অক্ষত থাকে।

বিবৃতিতে তিনি জানান যে, শান্তিকমিটি গঠন প্রসঙ্গে গত দুই সপ্তাহে তিনি চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন অংশ সফর করেন।

তিনি বলেন যে, চট্টগ্রামে অবস্থানকালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা শান্তিকমিটির সদস্যদের সহিত বৈঠকে মিলিত হইয়া এলাকার শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিইয়া আনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন।

তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি নোয়াখালী জেলায় ফেনী, সোনাগাজী ও অন্যান্য আরও কতিপয় স্থান সফর করে। এই সমস্ত এলাকার কোন কোন স্থানে শান্তিকমিটি গঠিত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে শান্তিকমিটির গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

জনাব জব্বার আরও প্রকাশ করেন যে নোয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব সইদুল হক এডভেকেট তাহারকে জানাইয়াছে যে, জনগণ ভারতের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং উহার প্ররিপ্রেক্ষিতে তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করিয়াছে।

স্থানীয় জনগণ যে কোন্ মূল্যে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর বলিয়া তিনি জানান।

দৈনিক আজাদ ৩১ মে ১৯৭১

বিভিন্ন এলাকায় আরও ২৫টি শান্তিকমিটি গঠন

'ঢাকা, ১১ই মে। বিভিন্ন এলাকায় আরও ২৫টি শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপিতে জানান হইয়াছে।
নবগঠিত কমিটিগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল :

১. পুরানা মোগলটুলি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব আবদুর রাজ্জাক।
২. কোন্ডা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব আবদুল ওয়াদুদ।
৩. শুভাড্যা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক হাজি আবদুস সামাদ বেপারী।
৪. কালিন্দি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : আবদুল ওয়াদুদ।
৫. যাত্রাবাড়ী ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : আব্বাস উদ্দিন আহমদ।
৬. দেওয়ান বাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : চাঁদ মিয়া।
৭. সিদ্দিক বাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী।
৮. মওলবী বাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক হাফিজ উদ্দিন আহমদ।
৯. নারিন্দা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : হাফিজ উদ্দিন আহমদ।
১০. জিন্দাবাহার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ সোখী।

১১. ফরিদাবাদ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব খন্দকার হাবিবুর রহমান।
১২. আজিমপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব হাফিজ আবদুল কাশেম।
১৩. কাউন্দিয়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব আজিজুর রহমান।
১৪. সাভার থানা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব আবদুল হালিম।
১৫. শ্যামপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব ফজলুল করিম।
১৬. ওয়ারি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব এ রহিম।
১৭. টঙ্গীবাড়ী ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব মজিবর রহমান মল্লিক।
১৮. আবদুল্লাহপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক আলহাজ্ব তাহের আহমদ।
১৯. টঙ্গীবাড়ী থানা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব সিরাজুল ইসলাম মল্লিক।
২০. নওয়াপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব সৈয়দ মহসীন আলী।
২১. ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ মোবারক হোসেন।
২২. টঙ্গী ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব আবদুল মজিদ সরকার।
২৩. জিঞ্জিরা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব মোহাম্মদ হোসেন।
২৪. চকবাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক : জনাব মহিবুজ্জামান
২৫. চুরিহাট্টা মহল্লা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি, আহবায়ক হাজি সলিমুল্লাহ মিয়া।

সাবেক এম. এন. এ. জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীকে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা শান্তিকমিটি সংগঠনের আহবায়ক নিয়োগ করা হইয়াছে।

দৈনিক আজাদ ২২ মে ১৯৭১

আমাদের সেনাবাহিনী ভারতীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে

চট্টগ্রাম ২০শে মে, পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আলী এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় রাষ্ট্র বিরোধীর সাহার্যের মাধ্যমে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ভারতীয় চক্রান্তকে আমাদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে যাহার জন্য পূর্ব পাকিস্তানীগণ সেনাবাহিনীর নিকট কৃতজ্ঞ।

চট্টগ্রাম জেলা শান্তিকমিটির সদস্য ও কর্মীদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে তিনি আরও বলেন যে, ইতিপূর্বেই জনসাধারণ পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা এবং পাকিস্তানের জনগণের ঐক্যকে ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় চক্রান্ত নস্যাৎ করিতে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করিয়াছে।

তিনি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য কতিপয় বিদেশী শক্তির চক্রান্ত সম্পর্কে জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেন এবং জাতীয় জীবনের বর্তমান সংকটজনক মুহূর্তে প্রস্তুত থাকা এবং সাহসিকতার সহিত বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

পিডিপি নেতা শ্রেণীগত মনোভাব পরিত্যাগ এবং জাতীয় জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগকারী সংখ্যাগুলির সহিত পূর্ণ সহযোগিতা দানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। জনাব মাহমুদ আলী পাকিস্তান অর্জনে পূর্ব পাকিস্তানীদের ত্যাগের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, তাহারা কাহাকেও এই ত্যাগ অর্থহীন করিয়া তুলিতে দেবে না। জনগণ বর্তমানে ঐ সকল লোককে উৎখাত কল্পে সেনাবাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দান করিতেছেন বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সকল পর্য্যায়ে শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং উক্ত কমিটিগুলি জনগণের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে।

কমিটিগুলি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে প্রশাসনিক যন্ত্রের সহিত সহযোগিত করিবে। উক্ত সভায় জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর এবং এডভোকেট আবু সালেকও ভাষণ দান করেন।

দৈনিক আজাদ ২৩ মে ১৯৭১

ময়মনসিংহের মাইজবাগ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি ও জমিয়াতুল মোদারেছিন-এর যৌথ উদ্যোগে জনসভা

মাইজবাগ (মোমেনশাহী) ২৫শে জুন সম্প্রতি আউলিয়ার চর সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ১৭নং মাইজবাগ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি ও জামিয়াতুল মোদারবেছিনের যুক্ত উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় ছাত্র-শিক্ষক সহ বহু গণমান্য ব্যক্তি ও বিপুলসংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আবদুল হালীম খান। বক্তৃতা করেন ইউনিয়ন শান্তিকমিটির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবদুল গণী ও মাওলানা তাহের উদ্দীন প্রমুখ। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক কমিটি গঠন করায় মোবারকবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অপর প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদী ভারত ও তদীয় প্রচার বাহনের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ মিথ্যা ও প্রচারণার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ভারতরে হীন চক্রান্তের

দাঁতভাঙ্গা জবাব দানের জন্য পাকিস্তানের জওয়ানদের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও গভর্নর লে. জে. টিক্কা খানকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানানো হয়। সভায় পাকিস্তানের সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে ১৭নং মাইজবাগ ইউনিয়নের বিভিন্ন অনৈসলামিক নামের গ্রামগুলির নূতন ইসলামী নামকরণ করা হয় এবং শান্তিকমিটির সেক্রেটারী সাহেবকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উহার কপি পাঠাইয়া অনুমোদনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হয়।

দৈনিক আজাদ ২৮ জুন ১৯৭১

নারায়ণগঞ্জ শহরেও শান্তিকমিটি গঠিত

'নারায়ণগঞ্জ ১১ই মে (এপিপি)। সম্প্রতি এক প্রতিনিধিত্বমূলক সমাবেশে নারায়ণগঞ্জ শহর শান্তিকমিটি গঠন করা হয়। জনাব এ. আজিজ সরদারকে উক্ত কমিটির আহবায়ক নির্বাচন করা হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ পৌর এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা হইতেছে ১২৪ জন এবং ১৪ জনকে এই কমিটি সমূহের আহবায়ক নিয়োক করা হইয়াছে। নিম্নে ১৪ জন আহবায়কের নাম দেওয়া হইল :

১. গোদনাইল ইউসি-জনাব আলতাফ হোসেন।
২. হাজিগঞ্জ ইউসি-জনাব এম. এ. বাসেত
৩. খানপুর (পশ্চিম) জনাব লতিফ সরদার
৪. খানপুর ইউসি-জনাব সুলতান খান
৫. চাষাড়া ইউসি-জনাব গোলাম রব্বানী খান
৬. দেওভোগ ইউসি-জনাব জহির হোসেন
৭. নারায়ণগঞ্জ ইউসি-জনাব এস. এ. হালিম
৮. শীতলক্ষ্যা ইউসি-জনাব লাল মিয়া
৯. পাইকপাড়া ইউসি-জনাব আবদুল জলিল
১০. সোনাকন্দা ইউসি-জনাব ইসাক মিয়া
১১. বন্দর ইউসি-জনাব মোহাম্মদ আলী
১২. কদমরসুল ইউসি-আলহাজ্ব এ. লতিফ
১৩. নবীগঞ্জ ইউসি-জনাব মহিউদ্দিন আহমদ
১৪. ধামগড় ইউসি-জনাব (ইন্ডাস্ট্রিয়াল) আলহাজ্ব আবদুর রফিক

গত রবিবার শান্তিকমিটির উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ রাইফেল ক্লাবভবনে ঈদে মিলাদুন্নবী যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদযাপিত হয়।

দৈনিক আজাদ ১২ মে ১৯৭১

মোহাম্মদপুরে শান্তিকমিটির বৈঠক

'ঢাকা, ২রা মে।—গতকাল সন্ধ্যায় সাবেক এম. এন. এ. জনাব আবুল কাসেমের বাসভবনে মোহাম্মদপুর ও লালমাটিয়ার শান্তিকমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া এই মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহীদের বহু উস্কানী সত্বেও এই এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে।

উক্ত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহত রাখার জন্য সেনাবাহিনীকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য কমিটি আরও উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত প্রচেষ্টা চালাইবে। কমিটির এই প্রচেষ্টার প্রতি সহযোগিতা করার জন্য নরনারী নির্বিশেষে সকলের প্রতি আবেদন জানানো হয়।'

দৈনিক আজাদ ৫ মে ১৯৭১

"শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-ছাত্রদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে সরকারকে সহায়তা প্রদানের আহবান"

'নারায়ণগঞ্জ, ২৭ শে জুন,।—গত শুক্রবার এখানে নারায়ণগঞ্জ শহর শান্তিকমিটির সদস্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটির আহবায়ক জনাব এম. এ. আজিজ সরদারের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন জনাব সহীদুল্লাহ সাবেক এম.এন. এ. জনাব নাজিরুদ্দীন আহমদ, জনাব আমির আলী ও সাবেক এম. পি. এ. জনাব জাহের।

সভায় বক্তৃতাকালে বক্তাগণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে বিশেষতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকদের উপস্থিতির মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে সহায়তার ক্ষেত্রেও শান্তিকমিটির দায়িত্ব পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।'

দৈনিক পাকিস্তান ১৯ জুলাই ১৯৭১

নালিতাবাড়িতে শান্তিকমিটির উদ্যোগে জনসভা

'ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তোলার আহবান'

নালিতাবাড়ি, ২৬শে জুন।—সম্প্রতি নালিতাবাড়ি অভ্যর্থনা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভা হয়। উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন স্থানীয় মহকুমা হাকিম ও নালিতাবাড়ি থানা অফিসার।

থানা অফিসার মো. সেরাজুল ইসলাম পাকিস্তান অর্জনের পটভুমিকা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া হইতেই ভারত তাহা মানিয়া

লইতে পারে নাই। ফলে তাহারা নানা রকম কলা-কৌশল ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়াছে। ১৯৬৫ সালে বিনা উস্কানী ও বিনা ঘোষনায় ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে। কিন্তু সে আক্রমনের পাল্টা জবাবে হিন্দুস্থান পর্যুদস্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর হিন্দুস্থান নীরবে বসিয়া না থাকিয়া কিছু সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী কুইসলিং লইয়া পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্য নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠাইয়া এবং আকাশবাণীর মিথ্যা প্রচারণার সাহায্যে পাকিস্তানের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে। তিনি বলেন কিন্তু তৎসত্ত্বে দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানীদের পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতির প্রতি অটুট রহিয়াছে। তথাকথিতে বিচ্ছিনতাবাদী ও দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূল করার জন্য বীর পাক সেনাবাহিনী ভারতীয় দূরভিসন্ধিতে নস্যাৎ করিয়া দেয়। দুষ্কৃতিকারীদের উদ্দেশ্য ছিল লুটতরাজ, নরহত্যা ও ধ্বংসাত্মক কার্যদ্বারা ভারতকে লাভবান করা। জনগণের আশা-আকাঙ্খার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি আরও বলেন, পাক সেনাবাহিনীর পাকিস্তানের সংহতি, সার্বভৌমত্ব, উন্নতি ও শান্তির জন্য কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি আরও অধিকতর শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তোলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

থানা অফিসার সমাজ বিরোধী সম্পর্কে সদ্য থাকার আহবান জানান এবং লুটের মাল আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

দৈনিক আজাদ ২৮ জুন ১৯৭১

ফরিদপুর ও বরিশালের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে শান্তিকমিটি গঠন

ঢাকা, ১৫ই মে—পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের পক্ষ হইতে ফরিদপুর ও বরিশালের বিভিন্ন ইউনিয়ন ও থানায় শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে বলিয়া এক প্রেস রিলিজে জানা গিয়াছে। নিম্নে নব গঠিত শান্তিকমিটির তালিকা প্রদত্ত হইল :

ফরিদপুর জেলার গোসাইর হাট থানার সাবেক এম. পি. এ. এবং দাসের জঙ্গল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব এরাজ উদ্দিন আহমেদকে প্রেসিডেন্ট এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়াম্যানদের ভাইস প্রেসিডেন্ট করিয়া থানা শান্তি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

মুলাদী থানা ইউনিট

জনাব আবদুল্লাহ হারুন এবং মওলানা আব্দুল মজিদকে যুগ্ন সম্পাদক করিয়া পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের মুলাদী ইউনিট গঠন করা হইয়াছে।

উপরোক্ত শান্তি ইউনিটগুলি রাষ্ট্রবিরোধী গুজব, হিন্দুস্থানী ভিত্তিহীন অপপ্রচারের বিরোধিতা এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পল্লী এলাকায় কৃষি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করিবে।

মৌসুমী শস্য উৎপাদন দ্বিগুন করিয়া রফতানী বৃদ্ধিকল্পে ব্যবসায়ীদের লইয়া স্থানীয় বাণিজ্য কমিটি গঠন করা হইবে। উক্ত ইউনিটগুলি স্থানীয় বাজার সমূহে নিরাপদে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ এবং চাউল, কেরোসিন তৈল ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর কৃত্রিম অভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশী সংখ্যক লঞ্চ ও নৌকা যাতায়াতের ব্যবস্থা করিবে।

শান্তি ইউনিটগুলি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিয়া যাইবে।

দৈনিক আজাদ ১৬ মে ১৯৭১

শান্তিকমিটির কর্মতৎপরতা শুরু
মুন্সিগঞ্জে পাক সেনাদের বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

মুন্সিগঞ্জ, ১১ মে (পিপিআই)।—পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জোয়ানরা গত ৯ মে মুন্সীগঞ্জ টাউনে উপনীত হলে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীরা তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। পিপিআই বার্তা সংস্থার বিশেষ সংবাদদাতা এ কথা লিখেছেন।

মেজর জাবেদের নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনাদল মুন্সীগঞ্জ উপনীত হলে সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই সেনাদলকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এর আগে জনসাধারণ সকল দালান কোঠা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাজার সমূহে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন।

পাকিস্তানী সেনাদল টাউনে উপনীত হলে সেখানে একটা আনন্দমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এরপর সেনাবাহিনীর অফিসারার জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য এবং মুন্সীগঞ্জ টাউন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরীসহ স্থানীয় সহকারী কর্মচারী ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকে জনাব বিক্রমপুরী সামরিক অফিসারদের মুন্সীগঞ্জ মহকুমার জনসাধারণের আন্তরিক ও পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

জনাব বিক্রমপুরী আরও বলেন, মুন্সীগঞ্জ, লৌহজং, টঙ্গীবাড়ি, গজারিয়া, শ্রীনগর এবং সিরাজদীখান নিয়ে গঠিত এই মহকুমার জনসাধারণ সব সময়ই আইনানুগ শান্তিপ্রিয় এবং দেশ প্রেমিক।

সকল দোকান পাট, সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলো তাদের স্বাভাবিক কর্ম তৎপরতা অব্যাহত রাখে। কোন ব্যক্তিই ভয় ও আতংকে টাউন ছেড়ে যায়নি।

সামরিক অফিসার বাজার পরিদর্শন করেন এবং দেখতে পান যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রবাদির মূল্যও স্বাভাবিকও যুক্তিসংগত পর্যায়ে রয়েছে। পণ্যদ্রব্যের সরবরাহও সন্তোষজনক রয়েছে। মুন্সীগঞ্জ কৃষকরা আউশ ফসল কাটছেন, কৃষকরা আবার অন্যান্য ধরনের ধানও রোপণ করছেন।

সেনাবাহিনীর দলটি মুন্সীগঞ্জের অভ্যন্তরে টঙ্গীবাড়ি, সিরাজদিখান, রামপাল (ঐতিহাসিক স্থান) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ সফর করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনী পদ্মা নদী দিয়ে মাওয়া, ভাগ্যকুল এবং কুমারভোগ অতিক্রম করাকালে লৌহজং এর জনসাধারণ তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান।

ইতিমধ্যে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ইউনিয়নের কাউন্সিলের সদস্য এবং শান্তিপূর্ণ জনসাধারণদের তাদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তিকমিটির সভা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। তারা ভারতীয় দালালদের হাত থেকে তাদের নিজেদের ভুমি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

এদিকে শান্তিকমিটির নেতা জনাব আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী ইতিমধ্যেই ৬৮টি ইউনিয়ন কাউন্সিলের নেতৃস্থানীয় জনসাধারণকে সেনাবাহিনীর দল তাদের স্থানে উপনীত হলে সেনাবাহিনীকে তাদের সহযোগিতা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি এলাকার জনসাধারণই স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি সেনাদলের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। জনসাধারণ ও সেনাদল সন্তুষ্টির সাথে তাদের মত বিনিময় করেন।

পূর্বদেশ ১২ মে ১৯৭১

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সদস্যগণের বিভিন্ন জেলা সফর

"সেনাবাহিনীর উপস্থিতির ফলে দেশ প্রেমিক নাগরিকদের প্রাণ রক্ষা পায়"

'কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির ৩ জন সদস্য মোমেনশাহী ও টাঙ্গাইল জেলায় ৩ দিন ব্যাপী এক সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া এক বিবৃতি দান করিয়াছেন। শান্তিকমিটির এই সদস্য ৩ জন হইতেছেন কাউন্সিল মোছলেম লীগের জনাব এ. কে. এম. মুজিবল হক, পিডিপির জনাব জুলমত আলী খান এবং কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগের জনাব ফিরোজ আহমদ।

গত বৃহস্পতিবার এক প্রেস রিলিজে তাঁহারা বলেন যে, মোমেনশাহী শহরে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। শতকরা ৯০ জন কর্মচারী অফিস আদালতে যোগদান করিয়াছেন। মোমেনশাহী সফর কালে তাঁহারা তথায় শান্তিকমিটি গুলির কার্য্যাবলী 'পর্যালোচনা করেন। মহকুমা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তিকমিটি গঠনের ব্যাপারেও তাঁহারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া ঢাকা হইতে মোমেনশাহী যাওয়ার পথও তাহারা সর্বত্র জনসাধারণকে স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন কাজ নির্বাহ করিতে দেখেন বলিয়া প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়।

মোমেনশাহী শহরের অধিবাসীরা তাহাদের জানাইয়াছেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পলায়ন করার সময় জনসাধারণের নিকট হইতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র লুট করিয়া লইয়া যায়। জনসাধারণ তাহাদের আসসালামু আলাইকুম বলিলে তাহারা রাম রাম বলিতে বলে। দুষ্কৃতিকারীরা আরও বলে—'হামলোগ পানচ রবস পর বদলা লেনেকা মওকা পাইস।' এই সকল দুষ্কৃতিকারী মসজিদের ভিতর মুসল্লীদের হত্যা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। ইহা ছাড়া তাহারা শান্তি প্রিয় ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের হত্যার জন্য তালিকা প্রস্তুত করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তাহাদের প্রাণ রক্ষা পায়।

জনসাধারণ কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সদস্যদের নিকট মোমেনশাহীর ডি. সি. ও এডিসির ভূমিকার প্রশংসা করিয়া বলেন যে, দুষ্কৃতিকারীদের হাত হইতে ট্রেজারী, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী সম্পত্তি রক্ষায় তাহারা অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করেন।

দৈনিক আজাদ ১৫ মে ১৯৭১

শান্তিকমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের জেলা ও মহকুমা সফর

কুমিল্লা, খুলনা, যশোর ও রংপুর জেলা শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে। প্রাক্তন এম. এন. এ. জনাব আজিজুর রহমান, প্রাক্তন এম. এন. এ. জনাব এ. কে. এম. ইউছুফ, প্রাক্তন এম. সি. এ. জনাব সৈয়দ শামছুর রহমান এবং প্রাক্তন এম. এল. এ. জনাব সিরাজুল ইসলাম যথাক্রমে এই শান্তিকমিটিগুলির আহবায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা শান্তিকমিটিও গঠন করা হইয়াছে। অধ্যাপক হাবিবুর রহমান এই শান্তিকমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রাক্তন এম. এল. এ. আলহাজ্ব এম. আবদুস সালামকে আহবায়ক করিয়া চাঁদপুর মহকুমা শান্তি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে। মওলবী কাঞ্চুদ্দিন ও প্রাক্তন এম. পি. এ. মওলবী আবদুল ছাত্তার খান চৌধুরী যথাক্রমে এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। ডা. সফিউদ্দিন আহমদ এম. বি. বি. এস. কে আহবায়ক করিয়া নওয়াবগঞ্জ থানা শান্তিকমিটিও গঠন করা হইয়াছে।

এডভোকেট জনাব নুরুল হক মজুমদার এবং এডভোকেট একে ফজলুল হক চৌধুরী বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা তথায় শান্তিকমিটি গঠন করিবেন। একই উদ্দেশ্যে এডভোকেট জুলমত আলী খান এবং জনাব মুজিবুল হক টাংগাইল ও মোমেনশাহী জেলা সফর করিতেছেন। আড়াই হাজার থানা শান্তিকমিটি গঠনের জন্য কবি বেনজির আহমদকে আহবায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি অফিসের দুইটি ফোন নম্বর ২৫৭৭৬৫ ও ২৮৩২৬৬।

দৈনিক আজাদ ১১ মে ১৯৭১

দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি গঠন

"দিলকুশা ইউনিয়নে শান্তিকমিটি গঠন করা হলা পাকিস্তান শান্তি ও কল্যান কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মওলানা নুরুজ্জামান ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট দিলকুশা 'শান্তি এবং কল্যাণ কাউন্সিল' গঠন করেন। জনাব আলীকে সভাপতি, জনাব আব্দুল মালিক এম. ইউ. সি. এবং জনাব আব্দুল মজিদ এম. ইউ. সি. কে সহ সভাপতি এবং জনাব আমির বক্স এম. ইউ. সি. কে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এই সভা থেকে ইসলাম এবং পাকিস্তানের শত্রু ভারতীয়দের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে জনগণকে যুদ্ধের সামিল হওয়ার আহবান জানানো হয়। ভারতীয় আগ্রাসনের নিন্দা করে সভা থেকে বলা হয় যে, ভারত যেন বিনম্র আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে তার নিজের স্বার্থ এবং বিশ্ব শান্তি রক্ষা করে।

মর্নিং নিউজ ১ জুন ১৯৭১ *একাত্তরের দালালনামা*

জনগণের প্রতি রংপুর শান্তিকমিটির নেতা নাসির আহমদ উসমানী

'সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগীতার আহবান'

ঢাকা, ৩০শে মে।—রংপুর কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সেক্রেটারি ও জেলা মোসলিম লীগের (কাউন্সিল) কোষাধ্যক্ষ্য জনাব নাসিম আহমদ উসমানী এক বিবৃতিতে বুদ্ধংদেহী নীতির নিন্দা করে বলেন যে, ভারত যতই মিথ্যা কাহিনী প্রচার করুক না কেন, পূর্ব পাকিস্তানের দেশ প্রেমিক জনগণ তাহাতে বিভ্রান্ত হইবেনা। তাহারা আমাদের দেশে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর পশ্চাতে শরিক হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বিবৃতিতে তিনি প্রসঙ্গত বলেন যে আমাদের সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনায়নের সাথে সাথে সমগ্র জেলায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। এবং ভারত কর্তৃক যে রুপ দাবি করা হইয়াছে, সেরুপ কোথাও কোনরুপ প্রতিরোধের চিহ্নই নাই।

বস্তুত জেলার জনসাধারণ এর অনুপ্রবেশকারী ও তাহাদের সহযোগীদের কোনরুপ স্থান দেয় নাই এবং এভাবে দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযান শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই জেলায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহয়তা করিয়াছেন।

তিনি প্রসঙ্গ বলেন, ভারতীয় সহযোগীরা তাহাদের হীন অভিসন্ধি হাসিলের ব্যাপারে জনসমর্থন না পাওয়ায় বেতারযোগে মিথ্যা প্রচারণয় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে। তিনি ভারতের এই জাতীয় মিথ্যা প্রচারণা সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ থাকার জন্য এবং আমাদের প্রিয় দেশ হইতে অবাঞ্চিত

লোকদের উৎখাতকরণে জোয়ানদের পশ্চাতে দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক আজাদ ১ জুন ১৯৭১

মুন্সিগঞ্জ রিকাবী বাজার শান্তিকমিটির সভা

"পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব রক্ষার সংকল্প ঘোষণা"

'মুন্সীগঞ্জ, ২৩শে জুন।—গত ২০ মে জুন রিকাবী বাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটির উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভায় জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী সভাপতিত্ব করেন। সভায় ইউনিয়ন শান্তিকমিটির কনভেনর আজিজ মাস্টার যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার সংকল্প ঘোষণা করেন এবং জনগণকে হিন্দুস্থানী মিথ্যা প্রচারণায় কান না দিতে অনুরোধ জানান। তিনি জনগণের প্রতি অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীগণকে নির্মূল করার জন্য শান্তি কমিটির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করার আহবান জানান। সভায় বক্তৃতা করেন জনাব দুদু মিয়া, জনাব নুরুল হক বেপারী, জনাব মোহাম্মদ মোছলেম মিয়া প্রমুখ। সভাপতি তাঁহার ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতিতে পাক নাগরিকগণের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেন। তিনি আজাদী পূর্ব আমলে মুছলমানদের প্রতি হিন্দু আচরণের ইতিহাস তুলিয়া ধরেন এবং এখানকার অধিবাসীদের প্রতি ভারতীয় দরদের স্বরূপ উদঘাটন করেন। বক্তাগণ অভিভাবকদের প্রতি তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে নিয়মিতভাবে স্কুলে পাঠানোর আহবান জানান। মিরকাদিম মহাজন সমিতির সম্পাদক জনাব মোছলেম মিয়া বলেন, আমরা পাকিস্তান পাইয়াছি বলিয়াই এই বন্দরে আজ মুছলমান ব্যবসায়ী হইতে পারিয়াছি নতুবা এই বন্দরে একজন মুছলমান ব্যবসায়ীও থাকিতে পারিত না।'

দৈনিক আজাদ ২৮ জুন ১৯৭১

সিলেটে শিক্ষক রাজনীতিবিদদের যৌথ সভা

'শাহজালালের পবিত্রভূমি হইতে সমাজবিরোধীদের উৎখাতের শপথ'

সিলেট ২৮ জুন গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় হযরত শাহজালালের পবিত্র ভুমি হইতে সমাজ বিরোধীদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাতের জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। সরকারী কলেজসমূহের অধ্যাপকবৃন্দ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় ভাষণদান করেন পাকিস্তান কাউন্সিল মোসলেম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সিলেট শান্তিকমিটির আহবায়ক এডভোকেট সহিদ আলী, পিডিপি

নেতা এডভোকেট গোলামী জিলানী, জনাব জসিম উদ্দিন আহমদ, জামাতে ইসলামীর জনাব হাফিজ লুৎফর রহমান, সিলেট সরকারী কলেজের অধ্যাপক আবু মুসা, সরকারী মাধ্যমিক কলেজের অধ্যাপক ইউসুফ, জনাব আজমল আলী চৌধুরী, সাবেক কেন্দ্রীয় উজির জনাব গোলাম জিলানী।

জনাব চৌধুরী অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের দালালদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে কুক্ষিগত করার ভারতীয় চক্রান্ত সম্পর্কে জনসাধারণকে হুঁশিযার করিয়া দেন। পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন।

জনাব আজমল আলী চৌধুরী জঙ্গী হিন্দুবাদের দর্শন ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, হিন্দুবাদ সকল সময়েই ইসলামকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছে। ভারতীয় সস্তা শ্লোগানে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য তিনি তরুণ সমাজের প্রতি আহবান জানান।

দৈনিক আজাদ ৩০ জুন ১৯৭১

চাঁদপুরে সালাম মঞ্জিলে শান্তিকমিটির সভা

ঢাকা, ২৬শে জুন।—সম্প্রতি চাঁদপুর মহকুমা শান্তিকমিটির আহবায়ক আলহাজ্ব এম. এ. সালামের সভাপতিত্বে চাঁদপুরস্থ 'সালাম মঞ্জিলে' ১৫০ জন বিশিষ্ট অধ্যাপক, শিক্ষক, ইমাম, ব্যবসায়ী এবং শান্তিকমিটির সদস্যবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতি শান্তিকমিটির তৎপরতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন বলিয়া কমিটির প্রেস বিজ্ঞপিতে প্রকাশ। তিনি এই প্রসঙ্গে সরকারের প্রতি সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি তীব্র ভাষায় ভারতের মিথ্যা ও অনিষ্টকর প্রচারণার নিন্দা করিয়া জনগণের প্রতি সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদেরর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।'

দৈনিক আজাদ ২৮ জুন ১৯৭১

বরিশাল থানা শান্তিকমিটি উদ্যোগে উজিরপুরে সভা

এ দিকে বরিশাল থানা শান্তিকমিটির উদ্যোগে ১৬ জুন উজিরপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভারতের জঘন্য কার্যকলাপ ও বেআইনী আওয়ামী লীগের ভূমিকায় তীব্র সমালোচনা করা হয়। সভায় ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল্য পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হোসেন। বক্তৃতা দেন মতিউর রহমান তালুকদার।

দৈনিক পাকিস্তান ১৭ জুন ১৯৭১

গফরগাঁও শান্তিকমিটি গঠন

মোমেনশাহীর গফরগাঁও থানায় ডা. আবদুল হাকিম মণ্ডলকে প্রেসিডেন্ট ও ডা. খন্দকার আবু সাঈদ শামসুল হুদাকে সেক্রেটারি করিয়া ১৬৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিল ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে।

দৈনিক আজাদ ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সদস্যদের চট্টগ্রাম সফর শেষে বিবৃতি
"রাষ্ট্রবিরোধীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে জনগণ বদ্ধপরিকর"

ঢাকা, ২৬শে মে, কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সদস্য এডভোকেট আবু সালেক এক বিবৃতিতে বলেন যে, জনসাধারণ গুটিকতক রাষ্ট্রবিরোধী এবং গুজব সৃষ্টিকারীদের অশুভ চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জনাব সালেক আরো দুজন নেতার সহিত চট্টগ্রাম সফরের পর বলেন, সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। এবং শহর ও গ্রাম অঞ্চলে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে।

তিনি উক্ত বিবৃতিতে আরো বলেন যে, তিনি জনাব মোহাম্মদ আলী এবং জনাব আব্দুল জব্বার খদ্দরের সহিত বিভিন্ন এলাকা সফর করেন এবং বিভিন্ন স্তরের লোকদের সহিত আলোচনা করেন। সর্বত্রই জনসাধারণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য ও শান্তি রক্ষার জন্য সশস্ত্রবাহিনী ও কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করতে আগ্রহী। জনসাধারণ গুটি কতক রাষ্ট্রবিরোধী ও গুজব রটনাকারীদের অশুভ চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন থানা ও ইউনিয়নসমূহে শান্তিকমিটি গঠন করা হয়েছে এবং জেলা শান্তি কমিট বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে শান্তি রক্ষা ও পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা এবং পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাইতেছে।

তিনি আরো প্রকাশ করেন যে, কারখানাসমূহ উহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতেছে এবং বিভিন্ন থানায় পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দরে স্বাভাবিক কাজকারবার চলিতেছে এবং অফিসে হাজিরও সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।'

দৈনিক আজাদ ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

'রাজশাহী ও পাবনায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে'

ঢাকা, ১১ই জুন। কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির অফিস সেক্রেটারী জনাব নূরুল হক মজুমদার সম্প্রতি পাবনা ও রাজশাহী জেলা সফরান্তে এখানে প্রত্যাবর্তনের পর

এক বিবৃতিতে জানান যে, সেখানে দ্রুত শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে।

জনাব হক গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন যে, সরেজমিনে পরিস্থিতি অনুধাবনের উদ্দেশ্যে আমি সম্প্রতি পাবনা ও রাজশাহী সফর করি। সফরকালে তথায় আমি স্থানীয় শান্তিকমিটির সদস্য, সামরিক আইন প্রশাসক ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমি সেখানে দ্রুত শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছি। অফিস আদালতে নিয়মিত কাজ চলিতেছে এবং জনসাধারণ স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা শুরু করিয়াছে।

আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। তাঁহারা আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের এক সমাবেশে আমি বক্তৃতা করিয়াছি। আমি তাহাদের বলিয়াছি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শত্রুতা আমাদের দেশে যে বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্য সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। বহু ত্যাগের ভিত্তিতে অর্জিত পাকিস্তানকে বানচাল করার জন্য ভারতীয় কারসাজি নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানাইয়াছি।

দৈনিক আজাদ ১৩ জুন ১৯৭১

সিলেট, পিরোজপুর এবং মুন্সীগঞ্জ শান্তিকমিটির ব্যাপক তৎপরতা

সিলেট, ১৫ই জুন। গতকাল এখানে কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি কর্তৃক আয়োজিত এক বিরাট সমাবেশে ভারত ও উহার ক্রীড়নকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কঠোর ও দৃঢ় সঙ্কল্প জানান হয়।

এডভোকেট জনাব আবদুল হাফিজ এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাবেক কেন্দ্রীয় উজীর জনাব আজমল আলী চৌধুরী ভারতকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, ভারত যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রয়াসী হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে (ভারতকে) তাহার স্বভূমিতেই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে।

জামাতে ইসলামের আমির জনাব শামসুল হক সভায় বক্তৃতা দান কালে বলেন যে, ভারত পাকিস্তানের সহিত সংগ্রাম করিবার স্বাদ পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছে। বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করিয়াছে, আমাদের সড়ক, সেতু ধ্বংস করিয়াছে এবং ব্যাঙ্ক ও খাদ্য ও গুদাম লুণ্ঠন করিয়াছে। এই ধরনের শত্রু ও সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে বীরত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি তাহাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। সভার অন্যতম বক্তা এডভোকেট জনাব জালালুদ্দীন বলেন, ভারত আমাদের আজন্ম শত্রু এবং

প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের ধ্বংস করিতে উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি প্রতিটি ইউনিয়নে শান্তিকমিটি গঠনের এবং দুষ্কৃতিকারীদের উচ্ছেদের আহবান জানান।

দৈনিক আজাদ ২৬ শে মে ১৯৭১

পিরোজপুরে শান্তিকমিটির সভা

পিরোজপুর মহকুমা শান্তিকমিটির প্রেসিডেন্ট খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলেন যে, বিশেষভাবে যুব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কায়েদে আজমের আদর্শ ঈমান, ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ অনুসরণ করা আজ অত্যন্ত জরুরী। গত শনিবার বানারিপাড়ায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতাদান কালে জনাব খান বাহাদুর আফজাল ছাত্রসমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার এবং নিজস্ব তমদ্দুন ও ঐতিহ্যের জন্য গর্ববোধ করার আহবান জানান। ভারত ও তাহার এজেন্টদের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণার শিকার না হওয়ার জন্য তিনি তাহাদের হুঁশিয়ার করিয়া দেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামী আদর্শ ও তমদ্দুন ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে তিনি শিক্ষক মাজ ও অভিভাবকদের আহবান জানান। জনাব আফজাল বক্তৃতাকালে আরও বলেন যে, পাকিস্তানের জনগণ আজ শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এবং একটি সমৃদ্ধিশালী পাকিস্তান গঠনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

ভারতীয় হস্তক্ষেপের নিন্দা

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া হইতে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ সম্প্রতি কামার খান ইউনিয়ন শান্তিকমিটির এক সভায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্ত ক্ষেপের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন এবং দেশের সংহতি রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভুমিকায় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরের যে কোন হীন চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে কোন পাকিস্তানীই তাহার শেষ রক্তবিন্দু প্রদান ইতস্ততঃ করিবে না বলিয়া দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনরুল্লেখ করা হয়। ইউনিয়ন শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব রুস্তম আলী হালদার সভায় সভাপতিত্বে করেন।

দৈনিক আজাদ ১৬ জুন ১৯৭১

কিশোরগঞ্জ শান্তিকমিটির সভা

কিশোরগঞ্জে শান্তিকমিটি আয়োজিত জনসভায় পিডিপি-র সহ সভাপতি মওলানা সৈয়দ মসলে উদ্দিন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির জন্য

বিচ্ছিন্নকারীরাই দায়ী। জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ায় তিনি তার প্রশংসা করেন। বক্তৃতায় তিনি কঠোরভাবে ভারতীয় আগ্রাসনের নিন্দা করেন। সভায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদকারী নেতা এস. বি. জামান, নূরুল্লাহ খান, মৌলভী বদরুজ্জামান, এডভোকেট শফিকুল হোসাইন খান এবং মৌলভী মোহাম্মদ আবু ইলিয়াস বক্তৃতা করেন।

দি মর্নিং নিউজ ১৩ জুন ১৯৭১, অনুবাদ ইফতেখার আমিন, *একাত্তরের দালালনামা*

“প্রেসিডেন্টের সময়োচিত ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা”

সম্প্রতি সদর উত্তর মহকুমা শান্তিকমিটির প্রেসিডেন্ট জনাব আবু হোসেনের সভাপতিত্বে গোরান্দিতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক পরিষদ সদস্য মওলানা মোহাম্মদ কাসেম, বরিশাল শহর শান্তিকমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মতিয়ুর রহমান তালুকদার প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় বক্তাগণ পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংসের জন্য ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের নিন্দা করেন।

পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, সভায় তাহার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করা হয়।

দৈনিক আজাদ ১৪ জুন ১৯৭১

“আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী দেশের উভয় অংশে বৈষ্যমের কারণ”

ফরিদপুর, ২১শে জুন। ফরিদপুর জেলা শান্তিকমিটি এবং বালিয়াকান্দি থানা শান্তি কমিটির উদ্যোগে বালিয়া জামালপুরে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বালিয়াকান্দি থানা শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব এম. এ. গফুর। সভায় ভাষণদানকারীদের মধ্যে ছিলেন জনাব কাবিলুদ্দিন, জনাব আফজাল হোসেন, মওলবী হাতিমুদ্দিন, জনবা এ. আর. বাকাউল।

জনাব এ. আর. বাকাউল দেশের উভয় অংশের মধ্যকার বৈষম্যের কারণ এবং ভারতের সহিত যোগসাজসক্রমে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে জোরদারকল্পে পাকিস্তানের ২ অংশের জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির জন্য বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি ভারতের সম্প্রসারণবাদী ভূমিকা ও মিথ্যা প্রচারণা এবং সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ করাইয়া পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উহার জঘন্য হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেন।

জেলা শান্তিকমিটির আহ্বায়ক জনাব আফজাল হোসেন আজাদী আন্দোলনের পটভূমিকা ব্যাখ্যা এবং কি পরিস্থিতির মধ্যে মুসলমানগণ পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন উহারও ব্যাখ্যা দান করেন। পাকিস্তান কায়েমের পর হইতেই ভারত উহার প্রতি শত্রুতা করিয়া আসিতেছে এবং পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। ভারতের যুদ্ধবাজেরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য আদাপানি খাইয়া মাঠে নামিয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের তথাকথিত ৬-দফার নিন্দা করিয়া বলেন যে, উক্ত দফার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে ভারতের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করা।

দেশের অর্থনৈতিক সবল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিত করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

গত ১৪ই জুন জেলা শান্তিকমিটির জেনারেল বডির এক বৈঠকে জেলার সার্বিক পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেরণ করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ জানান হয়। ফরিদপুর জেলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ তাহাদের স্ব-স্ব কাজে যোগদান করিয়াছেন।

দৈনিক আজাদ ২৪ জুন ১৯৭১

"শান্তিকমিটিগুলো চমৎকার কাজ করিতেছে"

ঢাকা, ২৩ জুন। সাবেক কেন্দ্রীয় উজির ও পূর্বপাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন এবং নিখিল পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ড. এ. এম. মালিক দশদিনব্যাপী যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলা সফরান্তে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিযাছেন। আজ এখানে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ড. এ. এম. মালিক বলেন, সমাজ জীবনের সর্বস্তরে পূর্ণ স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনা ও শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায় এতদঞ্চলের শান্তি কমিটিগুলি সন্তোষজনকভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে।

ডা. মালিক তাহার বিবৃতিতে বলেন, দর্শনা ও গেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন রেললাইন সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সহায়তায় স্থাপন করিয়া ২০০টি রেলওয়ে ওয়াগন ও বেশ কিছু সংখ্যক ইঞ্জিন ভারতে লইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ধান, পাট ও ডাইল সহ বিপুল পরিমান খাদ্যশস্যও ভারতে পাচার করে।

দৈনিক আজাদ ২৪ এপ্রিল ১৯৭১

'সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৭ই জুন। গতকাল বিকালে স্থানীয় শহর মিলনায়তনে মহকুমা শান্তিকমিটির উদ্যোগে এক ইমাম ও উলেমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মওলানা বজলুর রহমান। বিভিন্ন বক্তা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইমাম ও উলেমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, বর্তমানে আমরা এক সংকটময় অবস্থার মধ্য দিয়া দিন কাটাইতেছি। এই সময়ে পাকিস্তান ও ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন বজায় রাখিতে হইলে ইমাম ও আলেম সমাজকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য্য। এ প্রসঙ্গে তাহারা আরও বলেন, দেশের ঐক্য, সংহতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য শান্তিকমিটি ও রক্ষাদল গঠন করিয়া দুষ্কৃতিকারীদের সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার সকলের কর্তব্য। তাই তাহারা জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। সভায় আলহাজ্ব জনাব শহীদুল্লাহ ও অধ্যাপক হাবিবুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

দৈনিক আজাদ ২৬ জুন ১৯৭১

ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঢাকায় শান্তিকমিটির হরতাল মিছিল

'পাকিস্তানের পবিত্র মাটির উপর ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে গতকাল দিনব্যাপী ঢাকায় হরতাল, মিছিল করা হয় এবং শত্রুদের বিপক্ষে অস্ত্র যোদ্ধাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়। কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির আহবানে ঢাকায় গতকাল তথাকথিত যুদ্ধ এবং আধিপত্যের প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। হরতালের সমর্থনে সকল দোকানপাট, ব্যবসা ক্ষেত্রে, সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, বাজার সব বন্ধ ছিলো। কোন প্রকার যানবাহন চলাচল করেনি। জনগণ পায়ে হেঁটে শান্তিকমিটির আহবানে ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদ করতে হরতালে যোগ দিয়েছে।

গতকাল বিকেলে মুহুর্মুহু শ্লোগানে এবং প্লাকার্ড বহন করে মিছিলটি বায়তুল মোকাররম হতে নগরীর বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। মিছিল থেকে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়া হয় এবং প্লাকার্ড এবং ব্যানার থেকে ভারতীয় কার্যক্রমের বিরোধিতা করা হয়।

প্রধান মিছিলটির নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির আহবায়ক খাজা খয়ের উদ্দিন, মুসলিম লীগের (কাইয়ুম) সাধারণ সম্পাদক খান এ. সবুর, জামায়াতে ইসলামের উপ আমির মাওলানা রহিম, প্রাদেশিক মন্ত্রী মো. এ. এম. এস. সোলায়মান এবং মো. আখতার উদ্দিন।

শ্লোগান মিছিলকারীরা বিভিন্ন শ্লোগানবাহী প্ল্যাকার্ড বহন করে। শ্লোগানগুলো ছিল 'ইন্ডিয়া খতম কর', 'আসাম, কলকাতা এবং দিল্লী ঘিরে ফেল, আমাদের সৈন্যরা দীর্ঘজীবী হউক, আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা সাবধান, ভারতীয় এজেন্ট নিপাত যাক', 'আমাদের যুবক ভাইয়েরা ফিরে আসুক', পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'রাশিয়া কুকুর ভারত কুকুর', 'পাকিস্তানের মূল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু', 'ইন্দিরা সাবধান', 'কায়েদ আযম জিন্দাবাদ', 'ভারতকে খতম কর', 'চল আমরা দিল্লী যাই', 'আমাদের সৈন্য জিন্দাবাদ', 'পাক চায়না জিন্দাবাদ', 'ভারতীয় আধিপত্যের কূট-কৌশল বাতিল কর।' মিছিলকারীরা উচ্চকণ্ঠে বললো, 'দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।'

মিছিলকারীরা কায়েদে আযম, কায়েদে মিল্লাত, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ছবি এবং জাতীয় পতাকা বহন করছিলো।

প্রতিমূর্তি : মিছিলকারীরা ঘোড়ার গাড়ী ও ঠেলা গাড়ীতে করে ডজন ডজন ইন্দিরাগান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামের প্রতিমূর্তি নিয়ে যাওয়া হয়।

পুরো মিছিলটি বায়তুল মোকাররম থেকে গুলিস্তান, নওয়াবপুর, সদরঘাট, ইসলামপুর হয়ে চকবাজারের দিকে যায়। এ সব স্থানে জনগণ তাদের স্বাগত জানায় এবং বাস ও ট্রাক করে মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

শান্তিকমিটির খাজা খয়ের উদ্দিন, অধ্যাপক গোলাম আযম, মো. এম. এ. মতিন, আব্দুল জব্বার খদ্দর, মাওলানা আশরাফ আলী এবং মো. এ. এস. এম. সোলায়মান চক বাজার থেকে মিছিলে নেতৃত্ব দেন এবং বলেন মাতৃভুমি রক্ষার্থে তারা শেষ বিন্দু রক্ত দেবে। নেতারা পাকিস্তান সৈন্যদের প্রতি তাদের পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেন।

তারা আশা প্রকাশ করেন যে, জাতি বর্তমানের সংকট থেকে আরও সাহস এবং সাফল্য লাভ করবে। তারা ভারতকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য না করার আহবান জানিয়ে বলেন, পাকিস্তানকে ভাঙ্গার দুষ্ট চক্রান্ত কখনও সফল হবে না। তারা আরো বলেন, উপমহাদেশের সকল মুসলমান তাদের অবদান দিয়ে পাকিস্তান তৈরী করবে এবং যে কোন মূল্যে এর একতা ও সংহতি রক্ষা করবে।

শান্তিকমিটির জনগণের কাছে তাদের নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সংহতির জন্য আবেদন জানায়। ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে তারা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি পূর্ণ সমর্থনও ব্যক্ত করেন।

আবেদন বক্তাগণ আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে ভারত যে বিপজ্জনক পথ অনুসরণ করছে তাতে বিশ্ব সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে। শান্তিকমিটির নেতারা উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের জনগণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকলে তারা যে কোন আধিপত্যকে মোকাবেলা করতে পারবে। শান্তি

কমিটির আহ্বায়ক খাজা খয়ের উদ্দিন র‍্যালীকে সামনে রেখে পাকিস্তানকে আক্রমণ করায় বিপজ্জনক কৌশল পরিহার করার জন্য সতর্ক করেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের জনগণ তাদের সার্বভৌমত্ব এবং একতা যে কোন প্রকারে রক্ষা করবে। জামায়েত ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, এটি যে আমাদের প্রদেশের উপর আক্রমণ তা নয় এটি আমাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের উপর আক্রমণ, তিনি বলেন, পাকিস্তানের জনগণ মনে করছে যে, শত্রুরা ধ্বংস হবে। তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর আধিপত্যশীল কৌশলের জন্য সর্তক করে দেন।

মো. এ. এস. এম. সোলায়মান ভারত সরকারের কাছে চার দফা দাবী জানান, যেগুলোর মধ্যে ছিলো ২৪ ঘন্টার মধ্যে আগ্রাসন বন্ধ করা, ভারতীয় দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা আহতদের ক্ষতিপূরণ, পাকিস্তানে পাঠানো ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার এবং পূর্ব পাকিস্তান ও ভারত সীমান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাখা।

তিনি বলেন, যদি ভারত সরকার এই প্রস্তাব মেনে না নেয়, তাহলে যে কোন ঘটনার জন্য তারা দায়ী থাকবে। গতকাল বিকেলে মোহাম্মপুর এবং মিরপুরে ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে পৃথক প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলের অগ্রাভাগে দোতলা বাসের চতুর্দিকে অসংখ্য ব্যানার এবং ফেস্টুন প্রদর্শিত হয়। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন তানজিম মিল্লির, আখতার আলম এবং হাশেম হাশমি। মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

জনাব আখতার এবং হাশেম হাশমি পাকিস্তানের কাছে মিছিলকারীদের উদ্দেশ্যে ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে বলেন। তারা জনগণের কাছে পাকিস্তান সৈন্যদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেয়ার আহবান জানান। মিছিলকারীরা বিশ্বাসঘাতকদের ফাঁসীর দাবী করেন।

দি মর্নিং নিউজ ২৯ নভেম্বর ১৯৭১, ইফতেখার আমিন, *প্রাগুক্ত*

‘ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তোলার আহবান’

নালিতাবাড়ি, ২৬শে জুন। সম্প্রতি নালিতাবাড়ি অভ্যর্থনা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভা হয়। উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন স্থানীয় মহকুমা হাকিম ও নালিতাবাড়ি থানা অফিসার।

থানা অফিসার মো. সেরাজুল ইসলাম পাকিস্তান অর্জনের পটভূমিকা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া হইতেই ভারত তাহা মানিয়া লইতে পারে নাই। ফলে তাহারা নানা রকম কলা-কৌশল ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়াছে। ১৯৬৫ সালে বিনা উস্কানী ও বিনা ঘোষণায় ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে। কিন্তু সে আক্রমণের পাল্টা জবাবে হিন্দুস্থান পর্যুদস্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর হিন্দুস্থান নীরবে বসিয়া না থাকিয়া কিছু সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানী কুইসলিং লইয়া

পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্য নূতন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠাইয়া এবং আকাশবাণীর মিথ্যা প্রচারনার সাহায্যে পাকিস্তানীদের পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতির প্রতি বিশ্বাস অটুট রহিয়াছে। তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূল করার জন্য বীর পাক সেনাবাহিনী ভারতীয় দূরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করিয়া দেয়। দুষ্কৃতিকারীদের উদ্দেশ্য ছিল লুটতরাজ, নরহত্যা ও ধ্বংসাত্মক কার্যদ্বারা ভারতকে লাভবান করা। জনগণের আশা-আকাঙ্খার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি আরও বলেন, পাক সেনাবাহিনীর পাকিস্ত ানের সংহতি, সার্বভৌমত্ব, উন্নতি ও শান্তির জন্য কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি আরও অধিকতর শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তোলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

তিনি জনগণকে ভিতরকার এবং বহিরাগত সমাজবিরোধীদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সদাসতর্ক থাকার এবং আত্মত্যাগের আহবান জানান।

থানা অফিসার সমাজ বিরোধী সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকার আহবান জানান এবং লুটের মাল আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

দৈনিক আজাদ ২৮ জুন ১৯৭১

কুমিল্লা থানা শান্তিকমিটির উদ্যোগে জনসভা

এদিকে কুমিল্লায় গত শুক্রবার হাজিগঞ্জের নওয়াব আলী ময়দানে থানা শান্তি কমিটির উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় শান্তিকমিটির আহবায়ক মো. আনোওয়ার হোসেন সভাপতিত্ব করেন। দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন স্তরের জনগণ পাকিস্তানের জাতির পিতার ছবি বহন করে আনে এবং মুহুর্মুহু শ্লোগান দেয় পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আযম জিন্দাবাদ, আল্লাহু আকবর বলে।

সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন-সাবেক এম. এন. এ. দুলিলুর রহমান এডভোকেট, নূরুল ইসলাম, সাবেক এম. পি. এ. আব্দুস সামাদ, সাবেক এম. পি. এ চাঁদপুর মহকুমা শান্তিকমিটির আহবায়ক হাজী এম. এ. সালাম এবং হাজীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম।

জনাব আজিজুর রহমান তার বক্তৃতায় পাকিস্তানের উপর বিনা উস্কানীতে ভারতের আক্রমণের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, এই আক্রমণের ফলে কুমিল্লা শহরের বহু লোকের জীবন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌম্ত্ব রক্ষার জন্য এক কাতারে সবাইকে দাঁড়াতে আহবান জানান এবং যে কোন মূল্যে মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি জায়গা রক্ষার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, যদি আমরা আলাদাভাবে দাঁড়াই তাহলে আমরা ব্যর্থ হবো।

জনাব দলিলুর রহমান তার ভাষণে জনগণকে ভারতের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হবার আহবান জানান। সাবেক এম. এন. এ. মো. সিরাজুল হক তার

ভাষণে বলেন, সম্প্রতি বিপুল সংখ্যক দেশপ্রেমিক জনগণ রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করেছে। তিনি জাতির কল্যাণের জন্য রাজাকারদের সততা ও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করার আহবান জনান। সভাপতির বক্তব্যে আনোওয়ার হোসেন দেশকে রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্টের সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রশংসা করেন।

দি মর্নিং নিউজ ৫ আগস্ট ১৯৭১, ইফতেখার আমীন, *প্রাগুক্ত*

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা শান্তিকমিটি গঠন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৭শে মে-মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ৫টি ওয়ার্ডে জনাব হারুন-উর-রশিদ, জনাব ছৈয়দ মোহাম্মদ আহম্মদ, জনাব কেরামত আলী, জনাব আব্দুল গফুর এবং জনাব আবেদ আলীকে যথাক্রমে আহবায়ক করিয়া সম্প্রতি কতিপয় শান্তিকমিটি গঠিত হয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে আহবায়ক করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা শান্তিকমিটি গঠিত হয়েছে।

দৈনিক আজাদ ২৯ মে ১৯৭১

বিভিন্ন থানা ও ইউনিয়নে আরো শান্তিকমিটি গঠন

১৯ মে—গতকল্য শ্রীনগর থানা মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষীয় শান্তিকমিটির অর্গানাইজারদের উদ্যোগে থানা কম্পাউণ্ডে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। সভাপতির ভাষণে জনাব বিক্রমপুরী ছাহেব পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার আবশ্যকতা, দুষ্কৃতিকারীদের সহায়তা কল্পে হিন্দুস্থানের উস্কানীমূলক কার্যের তীব্র নিন্দা করেন এবং পাক সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ তৎপরতার প্রশংসা করেন। উপস্থিত জনসাধারণ সকলেই একবাক্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে সেনাবাহিনীর জোয়ানদের সর্বপ্রকার সহায়তা করার নিশ্চয়তাদান করেন। অতঃপর আলহাজ্ব জনাব সৈয়দ আবদুল মান্নানকে আহবায়ক করিয়া এবং ২৯ জন সদস্য নিয়া থানা শান্তিকমিটি গঠন করা হয়।

শ্রীনগর (ঢাকা), ১৮ ই মে গতকল্য শ্রীনগর থানা মোছলেম লীগ অফিসে স্থানীয় মোছলেম লীগ কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভা হয়। জনাব আবদুল ছামাদ লস্কর সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আলহাজ্ব জনাব সৈয়দ এ. মান্নানকে আহবায়ক ও জনাব নজরুল ইসলাম ও জনাব এ. কে. খানকে সেক্রেটারি ও সহ সেক্রেটারি করিয়া শ্রীনগর থানা শান্তিকমিটি গঠন করা হয়।

গত রবিবার বাড়ৈখালী মাঠে প্রাক্তন ইউ. বি. প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট মোসলেম লীগ নেতা ও কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির অর্গানাইজার জনাব এ. জলিল খানের উদ্যোগে বাড়ৈখালী মাঠে এক জনসভা হয়। জনাব এ. বি. এম. সিদ্দিক সভাপতিত্ব করেন। জনাব এ. জলিল খান পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং ভারতের অপচেষ্টার সমালোচনা করেন। অতঃপর জনাব এ. জলিল খানকে আহবায়ক ও জনাব এ. বি. এম. সিদ্দিকের প্রচার সেক্রেটারি এবং জনাব রোস্তম মিয়াকে সহকারী করিয়া অপর ২০ জন সদস্য সহ বাড়ৈখালী ইউনিয়ন শান্তিকমিটি গঠন করা হয়।

কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অর্গানাইজার জনাব এ. জলিল ও আলহাজ্ব সৈয়দ এ. মান্নানের প্রচেষ্টায় শ্রীনগর থানা এলাকার আরও বারটি ইউনিয়নে শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে।

হাষাড়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব রিয়াজউদ্দিন মিয়া, ষোলঘর, আহবায়ক জনাব দেলওয়ার হোসেন, বাঘরা, জনাব তোফাজ্জাল হোসেন, আটপাড়া, জনাব মাহবুবুর রহমান, জনাব আব্দুল করী, কুকুটিয়া; জনাব আমীনুল হক মৃধা, কোলাপাড়া; ডা. ফজলুল হক, শামসিদ্ধি; জনাব আ. বাচির মিয়া, শ্রীনগর; জনাব সোলায়মান খান, রাঢ়ীখাল; জনাব আব্দুল মান্না; পাটাভোগ; জনাব সৈয়দ শাহ আলাম।

দৈনিক আজাদ ২১ মে ১৯৭১

মুন্সীগঞ্জে আবদুল্লাহপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি গঠন

মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা), ১২ই মে—গতকল্য আবদুল্লাহপুর ইউনিয়নের শান্তিপ্রিয় জনগণ এক সভায় মিলিত হইয়া বর্তমান সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় জনগণ সাম্রাজ্যবাদী ভারতের পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণার তীব্র নিন্দা করেন।

উক্ত ইউনিয়নের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কর্মকর্তা নির্ধারিত করিয়া ইউনিয়ন পর্যায় শান্তিকমিটি গঠন করেন। সভায় জনাব আ. ছামাদ আবদুল্লাহপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দৈনিক আজাদ ১৬ মে ১৯৭১

খুলনায় খান এ. সবুর

এদিকে খুলনার দৌলতপুর থানায় দিয়ানায় আয়োজিত সমাবেশে খুলনার কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সদস্যগণ বক্তৃতা করেন। জাতীয় পরিষদ সাবেক সদস্য খান এ.

সবুর সমাবেশে সভাপতির ভাষণে বলেন, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে। সভায় সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আবদুল হামিদ, আবুল হোসেন এবং কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলীও বক্তৃতা করেন।'

দৈনিক আজাদ ১ মে ১৯৭১

খাজা খয়ের উদ্দিন-এর নেতৃত্বে সভা

১লা মে কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির কার্যকরী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় কমিটির কার্যালয়ে সকাল ১১ টায়। কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির আহবায়ক খাজা খয়ের উদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে 'কমিটি পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এক ইউনিট শান্তিকমিটি গুলো কার্যক্রম বিবেচনা করেন।'

দৈনিক আজাদ ২ মে ১৯৭১

সিলেটের বিভিন্ন স্থানে শান্তিকমিটি গঠন

ঢাকা ১২ই মে। সংশ্লিষ্ট এলাকায়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং সমাজ হইত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎখাত করার উদ্দেশ্যে নিম্মোক্ত স্থানসমূহে শান্তিকমিটি গঠন করা হয়েছে।

সিলেট জেলা

সিলেট জেলা মোছলেম লীগের আহবায়ক জনাব নজুল হোসেনকে আহবায়ক করিয়া বিভিন্ন সংস্থার ৫৫ জন প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য সমবায়ে শান্তিকমিটি গঠিত হয়।

মৌলভীবাজার

গত ৮ই মে মৌলভীবাজার মহকুমা শান্তিকমিটি গঠিত হয়। সাবেক এম. পি. এ. আলহাজ্ব জনাব এনাম উল্লাহ ও জনাব মিসির উল্লাহ যথাক্রমে এই কমিটির চেয়ারম্যান ও আহবায়ক নিযুক্ত হন।

কুলাউরা থ.না

গত ৮ই মে প্রায় দশহাজার লোকের একটি শান্তি মিছিল বাহির হয়। মিছিলকারীরা "কায়েদে আজম জিন্দাবাদ" সহ বিভিন্ন ধ্বনি প্রদান করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মোছলেম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব এ. এন. এম. ইউসুফ মিছিলকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তিনি জনগণকে সমাজ হইতে

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎখাতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার এবং পূর্ণ স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনার পরামর্শ দেন। জনাব বদরুদ্দিন আহমদ ও জনাব বাতির মিয়াকে যথাক্রমে আহবায়ক ও সেক্রেটারি করিয়া কুলাউরা থানা শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

বড়লেখা থানা

গত ৮ই মে আলহাজ্ব আফতাব উদ্দিন আহমদকে আহবায়ক ও জনাব আকাদ্দস আলীকে সেক্রেটারি করিয়া বড়লেখা থানা শান্তিকমিটি গঠিত হয়।

রাজনগর থানা

সম্প্রতি রাজনগর থানা শান্তিকমিটি গঠিত হয়। জনাব আবদুল গফুর, হাজী আজমল খান ও জনাব আবদুল করিম যথাক্রমে এই কমিটির চেয়ারম্যান, আহবায়ক ও সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

কমলগঞ্জ থানা

আলহাজ্ব মুন্সী মোহাম্মদ আরিফকে আহবায়ক করিয়া কমলগঞ্জ শান্তিকমিটি গঠিত হয়।

দৈনিক আজাদ ১৩ মে ১৯৭১

মুন্সিগঞ্জে শান্তিকমিটির উদ্যোগে জনসভা

"পাক সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার আহবান"

মুন্সীগঞ্জ, (ঢাকা) ১৯শে মে—সম্প্রতি স্থানীয় মোখতার বার লাইব্রেরী হলে স্থানীয় শান্তিকমিটির উদ্যোগে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী।

সভায় বিভিন্ন বক্তা পাকিস্তানের আদর্শ ও অখণ্ডতা রক্ষা করার উপর গুরত্ব আরোপ করিয়া বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূল সাধনে পাক সেনাবাহিনীকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করার আহবান জানান। তিনি জনসাধারণকে দেশের অর্থনৈতিক সার্বিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করার উপদেশ দেন। যথাসময়ে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পাকিস্তানের দুশমন দুষ্কৃতিকারীদের নস্যাৎ করার জন্য সভায় পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর জোয়ানদের মোবারকবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর পাকিস্তানের সংহতি উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করিয়া মোনাজাত করা হয়।

দৈনিক আজাদ ২১ মে ১৯৭১

বরিশালের উত্তর মহকুমা শান্তিকমিটি গঠন

বরিশাল, ২০শে মে—সম্প্রতি ডেপুটি কমিশনারের কনফারেন্স রুমে ইউনিয়ন কাউন্সিল সমূহের চেয়ারম্যান, সার্কেল অফিসার এবং উত্তর মহকুমার অন্যান্য প্রতিনিধিদের এক সভায় উত্তর মহকুমা শান্তিকমিটি গঠন করা হইয়াছে।

দৈনিক আজাদ ২২ মে ১৯৭১

শান্তিকমিটির উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮ই মে—সম্প্রতি এখানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে শান্তি কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট শান্তি মিছিল বের করা হয়। প্রায় দেড় মাইল লম্বা এই মিছিলে শহর ও শহরতলীর হাজার হাজার লোক যোগদান করে। শোভা যাত্রা আল্লাহু আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ এবং ভারতীয় ষড়যন্ত্র ধ্বংস হোক প্রভৃতি ধ্বনিসহ শহরের বড় বড় রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে রিপাবলিক স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভা হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন বক্তা পাকিস্তান হাছেলের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন।

বক্তাগণ দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধনের অপচেষ্টা, ভারতীয় চক্রান্ত ও অপ্রচারের তীব্র নিন্দা করেন। সভায় জনগণকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং সংহতি এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থ জানমাল কোরবানী করার জন্য আহবান জানানো হয়। অবশেষে পাকিস্তানের সকল প্রকার মঙ্গলের জন্য মোনাজাত করা হয়।

দৈনিক আজাদ ২২ মে ১৯৭১

ঢাকায় ইসলামপুর শান্তিকমিটির অফিস উদ্বোধন

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির আহবায়ক সৈয়দ খাজা খায়রুদ্দিন গত শুক্রবার ইসলামপুর রোডে মর্ডান হোটেলে বিল্ডিং এ ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির অফিস উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির প্রায় সকল সদস্য, বিভিন্ন ইউনিয়ন কমিটির আহবায়ক, ইউনিট আহবায়কবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব মোবারক হোসেন, সৈয়দ খাজা খায়েরুদ্দিনকে মাল্যভূষিত করেন।

দৈনিক আজাদ ২২ মে ১৯৭১

ঢাকার ফতুল্যা থানায় শান্তিকমিটি গঠন

ঢাকা, ২২শে মে—নারায়ণগঞ্জ মহকুমাধীন ফতুল্লা থানার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ একটি শান্তিকমিটি গঠন করাইয়াছে বলিয়া এক প্রেস রিলিজে জানা গিয়াছে।

আলহাজ্ব বন্দে আলী মিয়াকে আহবায়ক নির্বাচিত করিয়া থানা শান্তিকমিটি গঠিত হয়। জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা এবং উক্ত এলাকায় শান্তি অক্ষুণ্ন রাখাই এই কমিটির লক্ষ্য।

দৈনিক আজাদ ২৩ মে ১৯৭১

টাঙ্গাইলে টাঙ্গাইল জেলা শন্তি কমিটির সভা
"দেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার আহবান"

টাঙ্গাইল, ২২শে মে—গতকাল টাঙ্গাইল জেলা শান্তিকমিটির এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সদস্য জনাব এ. এম. শফিকুল ইসলাম উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। জেলা শান্তিকমিটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৮ জনে উন্নীত হইয়াছে এবং জেলা শান্তিকমিটি নীতি পরিচালনার জন্য ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করিয়াছে বলিয়া এক প্রেস রিলিজে জানা গিয়াছে।

জনাব শফিকুল ইসলাম সভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে, পাকিস্তান বর্তমানে সর্বাপেক্ষা সংকটজনক মুহূর্তে অতিক্রম করিতেছে।

দৈনিক আজাদ ২৩ মে ১৯৭১

চট্টগ্রামে শান্তি কমিটর তৎপরতা বৃদ্ধি

'চট্টগ্রাম, ২২শে মে—চট্টগ্রাম জেলা শান্তিকমিটির কর্মতৎপরতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জেলায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবনের জন্য জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য লোক স্থানীয় শান্তিকমিটির অফিসে সমাগত হইতেছে। জনগণের নিকট হইতে বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ করা হইতেছে এবং শান্তিকমিটির উদ্যোগে উহার প্রতিবিধান হইতেছে। সর্বশ্রেণীর লোকেরা বহু অভাব অভিযোগ উপশমের জন্য সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন।

শান্তিকমিটির বহু শাখা গঠন করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে শান্তিকমিটির শাখা কমিটির শাখা ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে। ডা. জামানুল্লাহ কে আহবায়ক নির্বাচিত করিয়া মিরেশ্বরাই থানার হাইতকান্দি ইউনিয়নে একটি শান্তি কমিটি গঠিত হইয়াছে। শান্তিকমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম জেলার পিডিপির সাধারণ সম্পাদক জনাব নুরুল্লাহ প্রধান অতিথি হিসাবে উক্ত সভায় যোগদান করেন। গত ২৩শে মে বাগমুনিরাম হাই স্কুলের বাগমনিরাম এর উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম জেলার শান্তিকমিটির জনাব নওয়াব আলী চৌধুরী উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। ডবল মুরিং থানার এবং রাওমা নকাদানপুর ইউনিয়নে দুইটি শান্তিকমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দৈনিক আজাদ ২৬ মে ১৯৭১

মুন্সীগঞ্জে শান্তিকমিটির সভা
"বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে উৎখাতের সংকল্প ঘোষণা"

'মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা), ২৯শে এপ্রিল—গতকাল মিরকাদিমে অনুষ্ঠিত শান্তিকমিটির সভায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদিগকে সমূলে উৎখাত করার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। রিকাবী বাজার ইউনিয়ন শান্তিকমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এবং পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান কর্মী জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শান্তিকমিটির সদস্যগণসহ আশে পাশের কয়েকটি ইউনিয়নের বহু সংখ্যক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিচ্ছিন্নতাবাদিদের দমন কল্পে বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। সভায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না করার আহবান ও বর্তমান সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এক প্রস্তাবে রিকাবী বাজার ইউনিয়নের রাস্তার বাতিগুলি জ্বালানোর জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানানো হয়।

সভায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার প্রতিটি নাগরিককে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সজাগ থাকার আহবান জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে ক্ষেত-খামার ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কৃষক ও মিল মালিকগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। সভার শুরুতে মরহুম এ. কে. ফজলুল হক ছাহেবের রুহের মাগফেরাত এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতির জন্য মোনাজাত করা হয়।

দৈনিক আজাদ ৩ মে ১৯৭১

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শান্তিকমিটির উদ্যোগে জনসভা
"পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপের নিন্দা"

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৫ই মে।—সম্প্রতি স্থানীয় পাবলিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শান্তিকমিটির আহবয়ক অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যদের মধ্যে জনাব এ. টি. এম. ওবায়দুল্লা, জনাব আজিজুর রহমান মোল্লা, জনাব কেরামত আলী, জনাব জিল্লুর রহমান এবং জনাব কারুকুল ইসলাম সভায় বক্তৃতা দান করেন। সভায় পাকিস্তানী এলাকায় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ এবং দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্য করার জন্য ভারত সরকারের তীব্র নিন্দা করা হয়।

সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা বিভাবে স্থানীয় লোকজনদের হত্যা করে এবং পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছার পূর্ব পর্যন্ত তথায় কি ধরনের সন্ত্রাসের রাজত্ব চলিতেছিল বিভিন্ন বক্তা তাহার বিবরণ দেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দুষ্কৃতিকারীদের সহায়তায় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা বিভিন্ন সেতু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী গৃহ নষ্ট করিয়া যে

ক্ষতিসাধন করে তাহার তীব্র নিন্দা করা হয়। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা স্বর্ণ, টাকা-পয়সা, খাদ্যশস্য এবং যানবাহন লইয়া যায় বলিয়া সভায় অভিযোগ করা হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে ভারতীয় হামলাকারীদের মোকাবেলার জন্য যে কোন মূল্যে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানানো হয়।

দৈনিক আজাদ ৭ মে ১৯৭১, ইফতেখার আমিন, *প্রাগুক্ত*

নোয়াখালী

গত সোমবার এখানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যোগদানকারী সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ পাকিস্তানের সংহতির প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করিয়া দুষ্কৃতিকারীদের হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় তাহারা কর্তৃপক্ষের সহিত সর্বাত্মক সমর্থন দান করেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সদস্য জনাব এ. জব্বার খদ্দর, নোয়াখালী জেলা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান এডভোকেট সাইদুল হক, জেলা শান্তিকমিটির সদস্য এডভোকেট শামসুল হক সহ আরো অনেকে সভায় বক্তৃতা করেন। মাইজদী কোর্ট ও চৌমুহনীতেও শান্তিকমিটির অনুরুপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব এ. জব্বার খদ্দর এলাকা হইতে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে কর্তৃপক্ষের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা এবং শক্তিশালী ও গৌরবময়, পাকিস্তান গড়িয়া তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

মাইজদি কোর্ট ও চৌমুহনীতে শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ইত্যাদি শ্লোগান সহকারে মিছিল শহরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিন করে।

দৈনিক আজাদ ৩০ মে ১৯৭১, *ঐ*

টিকাটুলিতে শান্তিকমিটির অফিস উদ্বোধন

'ঢাকা, ২৯শে মে—গতকাল এখানে দারুল ইসলাম মাদ্রসায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে খাজা খায়েরুদ্দিন দেওয়ানগজ্ঞ ইউনিয়ন শান্তিকমিটির টিকাটুলী ইউনিটের অফিস উদ্ভোধন করেন। উক্ত অফিস উদ্ভোধনকালে খাজা খয়েরউদ্দিন পাকিস্তানের ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত অনুপ্রবেশকারী ও স্থানীয় আন্তর্ঘাতীদের সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন। ঢাকা শহর কাউন্সিল মোছলেম লীগের সভাপতি ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রাক্তন সদস্য জনাব সিরাজউদ্দীন খান এবং জনাব ফয়েজ বখশও উক্ত সভায় ভাষণ দেন।

দৈনিক আজাদ ৩০ মে ১৯৭১, *ঐ*

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শান্তিকমিটির উদ্যোগ

ঢাকা, ২৯শে মে।—ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের শান্তিকমিটির সদস্যগণ এতদঞ্চলের শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা পুররুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করিতেছেন।

এখানে স্মর্তব্য যে, পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) জনৈক কাউন্সিলার জনাব আবু নাসের এক গোপন তথ্য লাভ করিয়া স্থানীয় দেশপ্রেমিক জনসাধারণ ও পুলিশ কর্মচারিদের সহযোগিতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়া গোপনভাবে রক্ষিত ৬টি রাইফেল উদ্ধার করিয়াছেন। এই রাইফেলগুলি দুষ্কৃতিকারিগণ ফেলিয়া গিয়াছিল। উদ্ধারকৃত রাইফেলগুলি স্থানীয় প্রশাসকের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

জনাব আবু নাছের এধরনের দেশপ্রেম মূলক কার্যকলাপে স্থানীয় শান্তিকামী জনগণ ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন।

জনাব আবু নাসের ইতিমধ্যে সংবাদ পত্রের প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষকে সাহায্য দানের জন্য দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীদের প্রতি আবেদন জানান। বিবৃতিতে তিনি আমাদের বিরাট কষ্টার্জিত পাকিস্তানের আদর্শ ও নিরাপত্তার বিধানের উদ্দেশ্যে সরকার যে প্রচেষ্টা চালাইতেছেন তার প্রতি সহয়তা প্রদানের জন্য তিনি জনগসাধারণের প্রতি প্রদত্ত আহবান জানাইয়াছেন।

মহকুমার সর্বত্র দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া তিনি জানান।

দৈনিক আজাদ ৩১ মে ১৯৭১, *ঐ*

বরিশালে মেহেন্দীগঞ্জে শান্তিকমিটির সভা

বরিশাল, ১৯শে জুন। গত বুধবার মেহেন্দীগঞ্জ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক উদ্ধারকৃত শান্তি বজায় রাখার জন্য এবং অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের খতম করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানান হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা ভারতের জঘন্য মিথ্যা প্রচারণার তীব্র নিন্দা করেন। তাহারা বলেন যে, পাকিস্তান টিকিয়া থাকিতে আসিয়াছে এবং তাহা টিকিয়া থাকিবে। তাহারা ঘোষণা করেন যে, ভারত কোনদিনই উহার চক্রান্তে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। বিভিন্ন বক্তা ছাত্রদের প্রতি যথার্থ দৃষ্টি রাখার জন্য এবং তাহারা যাহাতে পড়াশোনায় অভিনিবেশ করে তাহার প্রতি নজর রাখার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আবেদন জানান। ছাত্ররা যাহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে তাহার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য তাঁহারা অভিভাবকদের প্রতি আবেদন জানান। শান্তিকমিটির উধ্যোগে আয়োজিত উক্ত সভায় সদর উত্তর মহকুমা শান্তিকমিটির জনাব আবুল হোসেন সভাপতিত্ব করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জনাব এস. এম. ডবলিউ লকিতুল্লাহ, ডক্টর মোশারফ হোসেন, মওলানা আবদুল মান্না, জনাব তোফাজ্জল হোসেন নিয়াজী এবং জনাব জালিলুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক আজাদ ২০ জুন ১৯৭১

খুলনার ডেপুটি কমিশনার নূরুল ইসলাম খান
'সমগ্র খুলনা জেলার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে'

খুলনার ডেপুটি কমিশনার জনাব নূরুল ইসলাম খান, জেলার পুলিশ সুপার ও কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সদস্যরা সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন পল্লী এলাক সফর করেন। তাহারা বিভিন্ন এলাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখিতে পান যে, সারা জেলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে।

ডেপুটি কমিশনার বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন এবং জনগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে আত্মনিয়োগের উপদেশ দেন। তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় ষড়যন্ত্র বানচাল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

ইতিমধ্যে জেলার সকল অফিস আদালতে নিয়মিত কাজকর্ম শুরু হইয়াছে, জনসাধারণও তাহাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করিয়াছে, প্রাইমারী ও হাইস্কুল সমূহ চালু হইয়াছে। ছাত্র ও শিক্ষকরা গত ১৫ এপ্রিল হতে বিদ্যালয়ে যোগদান করিতেছেন। সকল মিল ও কারখানা চালু হইয়াছে এবং দিন দিন উহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। এক সপ্তাহ যাবত চাউল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সাতক্ষীরা ও উহার মফস্বল অঞ্চল সমূহেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। তথায় বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ তাহাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরায় শুরু করিয়াছেন। সাতক্ষীরাও অফিস আদালতে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলিতেছে।

দৈনিক আজাদ ২২ জুন ১৯৭১

ইসলামপুরে ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তিকমিটি গঠন

"গত রোববার ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটির অফিসে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব মোবারক হোসেন সভাপতিত্ব করেন। ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটির এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, সভায় প্রত্যেকটি ইউনিটের ২৫ জন করে লোক নিয়ে একটি রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। সভায় মহল্লার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাকিস্তান বাহিনীর সময় মত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করা হয়।"

দৈনিক আজাদ ২৭ জুলাই ১৯৭১

কুমিল্লাতে কোতোয়ালী থানা শান্তিকমিটির উদ্যোগে জনসভা

'কুমিল্লা হতে এপিপি পরিবেশিত খবরে জানা গেছে যে, কোতোয়ালী শান্তিকমিটির উদ্যোগে বালুতোবায় গত ১৪ই জুলাইয়ে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে থানা শান্তিকমিটির আহবায়ক ও জেলা কাউন্সিল সদস্য জনাব আবুল বাশার ভারতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান। তিনি শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বলেন যে আপনাদের কোন আত্মীয়স্বজন ভারতে চলে গিয়ে থাকলে বিনা সংকোচে তাদেরকে ফিরে আসতে বলেন। কারণ তাদের পূর্ণ পুনর্বাসনের জন্য সরকার এবং শান্তিকমিটির পক্ষ হতে সব রকম সহযোগিতা দেওয়া হবে। এছাড়া সভায় বক্তৃতা করেন জনাব আলী আকবর এডভোকেট, হাসমতুল্লাহ খান ও শামসুল আলম।'

দি মর্নিং নিউজ ৩১ জুলাই ১৯৭১, ইফতেখার আমিন, *প্রাগুক্ত*

দিনাজপুর জেলা শান্তিকমিটি গঠিত

এপিপি পরিবিশিত খবরে বলা হয় দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল হলে এডভোকেট জনাব হাসান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার মধ্য দিয়ে দিনাজপুর জেলা শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। যারা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন-জেলা শান্তি কমিটির সভাপতি জনাব এম. এ. কাসেম এডভোকেট, সহ সভাপতি জনাব মজিবুর রহমান ও জনাব এম. এ. ইউ. এস. এডভোকেট, সাধারণ সম্পাদক মো. ফজলুল হক, অফিস সেক্রেটারি সদর মহকুমা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান জনাব এ. এস. রিয়াজুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. কে. জিলানী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী এবং দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হন মতিউর রহমান খান। দিনাজপুর জেলার সকল থানায় শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান এবং অন্য দশজন করে সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

দি মর্নিং নিউজ ২৪ আগস্ট ১৯৭১, *ঐ*

কুমিল্লায় শান্তিকমিটির উদ্যোগে জনসভা

কুমিল্লা জেলার রামচন্দ্রপুরেও শান্তিকমিটির উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত জনসভায় বক্তারা একতা ও সংহতি রক্ষার প্রশ্নে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করে। জেলা শান্তিকমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাসার এবং এডভোকেট মো. শরাফত উল্লাহ দেশকে দ্বিখণ্ডিত করার হতে থেকে রক্ষা করার জন্য সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অভিনন্দন জানান। তারা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, একতা ও সংহিত রক্ষায় জনগণকে পর্বতের মতো দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের আহবান জানান।

তারা রাজাকারদের কার্যক্রমের উচ্চ প্রশংসা করে রাজাকার বাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে দুষ্কৃতিকারী এবং ভারতীয় এজেন্টদের পাকিস্তানের পবিত্র অঙ্গন থেকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

দি মর্নিং নিউজ ৯ অক্টোবর ১৯৭১, *ঐ*

দৌলতপুরে শান্তিকমিটির উদ্যোগে জনসভা

দৌলতপুর (মানিক গঞ্জ) থানা শান্তিকমিটির উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগমে অনুষ্ঠিত জনসভায় যে কোন মূল্যে অখণ্ডতা, সংহতি ও পাকিস্তানী আদর্শ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল। দৌলতপুর শান্তিকমিটির আহবায়ক শাহাদাৎ হোসাইন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় স্থানীয় নেতারা এ মত প্রকাশ করেন।

দি মর্নিং নিউজ ৯ অক্টোবর ১৯৭১, *ঐ*

ময়মনসিংহ জেলা ও থানা শান্তিকমিটির সভা

'ময়মনসিংহ, গতকাল জেলা কাউন্সিল অডিটরিয়ামে ময়মনসিংহ জেলা এবং থানা শান্তিকমিটির উদ্যোগে একটি যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তাগণ ভারতীয় এজেন্ট ও দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা সংগঠিত আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা ভারতীয় আগ্রাসন হতে মাতৃভূমি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য জীবন দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

দি মর্নিং নিউজ ১৮ অক্টোবর ১৯৭১, *ঐ*

শান্তিকমিটি আয়োজিত নোয়াখালীর জনসভা
"পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জায়গা রক্ষার প্রতিজ্ঞা"

'নোয়াখালী, সমরমুন্সী এবং বাজার হাটে অনুষ্ঠিত জনসভায় বাহিরের আক্রমণ থেকে দেশের প্রতি ইঞ্চি জায়গা রক্ষা করার জন্য জনগণ পূর্নবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন। দু'টি জনসভা জেলা শান্তিকমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান সাইদুল হক সভাপতিত্ব করেন।

বক্তাদের মধ্যে সিদ্দিক উল্লাহ এডভোকেট এবং সামশুল হক এডভোকেট তীব্রভাবে ভারতের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা জানিয়ে বলেন, পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি ধ্বংসের যে কোন অপচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। সভা থেকে প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে অভিনন্দিতি করা হয়।

দি মর্নিং নিউজ ৩৯ নভেম্বর ১৯৭১, *ঐ*

খুলনায় শান্তিকমিটির সভায় খান এ. সবুর খান
"দেশের সংহতি রক্ষকল্পে সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতার আহবান'

খুলনা, ২০শে মে—সাবেক কেন্দ্রীয় উজির এবং জাতিয় পরিষদের নেতা খান আবদুস সবুর খান আজ দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার জন্য দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাইয়াছেন।

খান সবুর স্থানীয় কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির এক ঘরোয়া সভায় ভাষণদানকালে আরও বলেন যে, বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ দেশের সংহতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের সদা জাগ্রত সশস্ত্র বাহিনী উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে উহা পূরণের জন্য এবং শিল্প ও কৃষি উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক তৎপরতা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনার জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

খুলনা কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সভাপতি এবং সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য মওলবী এ. কে. এম. ইউসুফ সভায় ভাষণদানকালে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী এবং রাষ্ট্র বিরোধীদের উৎখাতকল্পে সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। সভায় সাবেক প্রাদেশিক উজির জনাব এস. এম. আমজাদ হোসেনও ভাষণ দান করেন।

দৈনিক আজাদ ২২ মে ১৯৭১

বরিশাল শান্তিকমিটির উদ্যোগে জনসভা

বরিশাল, ২২ মে—গতকাল অপরাহ্নে স্থানীয় টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় রাষ্ট্রের দুশমনদের উৎখাত করিয়া দেশের সংহতি রক্ষাকল্পে বীরত্বপূর্ণ ও সমোয়চিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

স্থানীয় শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুর রবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় মেসার্স শামসের আলী, নূরুল ইসলাম শিকদার, আবুল হাসেন ও গোলাম কুদ্দুস ভাষণ দান করেন। বক্তাগণ পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী জঘন্য কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়ার অভিযোগে ভারতের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, পাকিস্তানের জন্মের পর হইতে উহাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করাই হইতেছে ভারতের একমাত্র লক্ষ্য। মি. গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু এবং মি. প্যাটেল তাহাদের নোংরা উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হঠাৎ করিয়া উপমহাদেশে বিভক্তকল্পে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের প্রস্তাবে সম্মত হন।

বক্তাগণ আরও বলেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতেই ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধ চালায়। ভারত একই সংগে এই দেশকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন সূক্ষ্ম উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানী তরুণদের সাংস্কৃতিক দিক দিয়া প্রভাবিত করে। তাঁহারা বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, পাকিস্তানকে দুর্বল করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

দৈনিক আজাদ ২৩ মে ১৯৭১

বরিশালে শান্তিকমিটি গঠন

বরিশাল, ১৩ই মে। গতকাল বরিশাল শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি টাউনহলে সমবেত হইয়া জেলা শান্তিকমিটি গঠন করেন। দুইজন সাবেক এম. এন. এ. জনাব আব্দুর রব এবং খান চৌধুরী ফজলে রব যথাক্রমে এই শান্তিকমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী নির্বাচিত হইয়াছেন। এই কমিটিতে ১০১ জন সদস্য রহিয়াছেন।

শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসায় দোকান পাট খুলিয়াছে ও হাট বাজার চালূ হইয়াছে। অফিস আদালত নিয়মিতভাবে চলিতেছে এবং বেসামরিক প্রশাসন বিভাগ কাজ করিতে শুর করিয়াছে। যাহারা শহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

দৈনিক আজাদ ১৪ মে ১৯৭১

এপিপি'র বিশেষ সংবাদদাতা জনাব শওকত কামাল-এর পরিবেশিত সংবাদ
"দুষ্কৃতিকারীদের নিশ্চিহ্ন করার পর রংপুরে প্রাণের স্পন্দন শুরু হইয়াছে"

রংপুর, ৫ই মে—পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ২শত মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত জেলা শহর রংপুর হইতে সেনাবহিনী কর্তৃক দুষ্কৃতিকারী ও রাষ্ট্রবিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার পর তথায় প্রাণের স্পন্দন শুর হইয়াছে। এপিপির বিশেষ সংবাদদাতা জনাব শওকত কামাল এই খবর পরিবেশন করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সুদূর উত্তর অঞ্চল সফরের পর উক্ত সংবাদদাতা জানান, 'আমি শহরের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। একটি প্রেক্ষাগৃহে "লাডলা" ও "নসিব আপনা আপনা" নামে দুটি ছবি নিয়মিত দেখানো হইতেছে। দোকান পাট খোলা হইয়াছে। শহরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমি কালেক্টরেট, পৌরসভা ও জেলা কাউন্সিলসহ বহু সংখ্যক অফিস পরিদর্শন করি এবং লোকজনদেরর নিয়মিত কাজকর্মে ব্যস্ত থাকিতে দেখিতে পাই। এই সকল অফিসে আমাকে বলা হয় যে,

শতকরা ৯০ জনের বেশি কর্মচারী কাজে যোগদান করিয়াছেন। ইহা নিছক দাবী নহে। আমি নিজেই দেখিয়াছি যে, প্রায় সকল টেবিলে কর্মচারীতে পূর্ণ।

শহরে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নাগরিকদের মধ্যে আস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের পরই দ্রুত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়া আসিয়াছে। কমিটির সদস্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওয়ার্ড কমিটিও গঠন করিয়াছেন এবং তাহাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার তৎপরতা নিকটবর্তী এলাকা পর্যন্তও সম্প্রসারিত করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিটি অফিসে মহকুমা অফিসার জনাব খন্দকার শফিরুল এছলাম জানান যে কমিটি এপ্রিল মাসেই ৩০ হাজার টাকা কর আদায় করিয়াছে। কমিটির বাজেট হইতেছে মাত্র ৯ লক্ষ টাকা।

জেলা কাউন্সিলের সেক্রেটারী জনাব মনজুর আহমেদ জানান যে, তাহার সাড়ে ৪ শত কর্মচারীর প্রায় সকলে কাজে যোগদান করিয়াছে। এ বছর উন্নয়ন বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি পরিমাণ অর্থের সদ্বব্যবহার করা হইয়াছে। জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সাধিত হইতেছে। রংপুর হইতে সৈয়দপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, পীরগাছা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ পর্যন্ত বাস, ট্যাক্সী ও ওয়াগণ যাতায়াত করিতেছে। লালমনিরহাট ও রংপুর, পার্বতীপুর ও দিনাজপুর এবং পার্বতীপুর ও সৈয়দপুরের মধ্যে ইতিমধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু হইয়াছে।

রংপুরে শান্তিকমিটির সদস্যরা তাহাদের একটি নিয়মিত বৈঠকে আমাকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়। উক্ত বৈঠকে তাহারা শান্তি রক্ষা এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও রাষ্ট্র বিরোধীদের ষড়যন্ত্র বানচাল করিয়া দেয়ার উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাহারা জনসাধারণকে গুজব রটনাকারীদের কথায় কর্ণপাত না করার উপদেশ দিতেছেন। বৈঠকে আমাকে বলা হয় যে, রাষ্ট্রবিরোধীদের শহরে প্রবেশ এবং নিরীহ মানুষের জীবন ও বিষয় সম্পত্তি লইয়া ছিনিমিনি খেলার সুযোগ না য়োর জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বিভিন্ন তল্লাশী ফাঁড়িতে সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিতেছে। একটি উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় এই যে, সংযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে জনসাধারণ সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী রাষ্ট্রবিরোধী গোবিন্দগঞ্জ থানার নিকট ঢাকা-রংপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত কাটাখালি সেতুর ক্ষতি সাধন করিয়াছে। কিন্তু হাজার হাজার লোক কাটাখালি নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজে সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করেন। শান্তিকমিটির জনৈক সদস্য জানান যে, রংপুরের জনগণ পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি রক্ষা এবং যে কোন উপায়ে ভারতের দুরভিসন্ধি বানচাল করিয়া দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

দৈনিক আজাদ ৬ মে ১৯৭১, *ঐ*

খুলনায় শান্তিকমিটির সমাবেশ

'খুলনায়, ৪ঠা মে—খুলনা হইতে ৭ মাইল দূরে মহেশ্বপাশা বাজারে গত শনিবার অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার প্রশ্নে দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করা হয়। সভায় পাকিস্তানী জনগণের ঐক্য বিনষ্টকারী ভারতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানান হয়।

খুলনা কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির সহযোগিতায় স্থানীয় শান্তিকমিটির উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সভায় স্থানীয় বক্তা ছাড়াও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব খান এ. সবুর ও সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী আমজাদ হোসেন বক্তৃতা করেন।

সভায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, ভারতীয় চক্রান্ত ধ্বংস কর প্রভৃতি শ্লোগান দান করা হয়। সভায় জনাব আবদুস সবুর খান বলেন যে, বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করার ভারতীয় চক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ভারতের কতিপয় দালাল ব্যতীয় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আদর্শকে প্রত্যাখান করিয়া পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের গৌরবজনক আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে।

সভায় বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচি, পাঠান ইত্যাদি সম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান হয়।'

দৈনিক আজাদ ৫ মে ১৯৭১

তেজগাঁও-এ শান্তিকমিটির সভা

ঢাকা ৪ঠা মে।—গতকাল বিকালে তেজগাঁও ইউনিয়ন তেছতরী বাজার এলাকার শান্তি কমিটির সভা তেজগাঁও পলিটেকনিক স্কুল ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ফকির আবদুল মান্নান, জনাব এস. এম. জুহুরুদ্দীন এডভোকেট, ডা. এ. এম. এস. খান এবং শান্তিকমিটির আহবায়ক জনাব মাহবুবুর রহমানসহ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিকমিটির আরেক সভা গত ১লা মে অনুষ্ঠিত হয়। তেজগাঁও এলাকার বহুলোক এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। শান্তিকমিটির এই উভয় সভাতেই পাকিস্তানের আদর্শ তুলিয়া ধরিতে এবং যে কোন মূল্যে দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় সংহতি উন্নয়নের জন্য এবং সমাজদ্রোহী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী অনুচরদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করা হইবে না বলিয়া আরেকটি প্রস্তাবে

উল্লেখ করা হয়। শান্তিকমিটির সভায় যোগদানকারী শ্রোতামণ্ডলী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের চিরতরে নির্মূল করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে সমর্থণ করিতে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন।

দৈনিক আজাদ ৫ মে ১৯৭১

খুলনায় কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির প্রশংসনীয় কর্মতৎপরতা

খুলনা, ৯ই মে। খুলনার কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি পাকিস্তানের সংহতি এবং অখণ্ডতার প্রতি আস্থা প্রকাশের উদ্দেশ্যে শহর এবং পল্লী এলাকায় জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছে। কৃষি এবং শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে জনসাধারণকে উৎসাহিত করাও এই সকল সভার উদ্দেশ্য। সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য মাওলনা এ. কে. এম. ইউসুফের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রতিনিধিদের লইয়া খুলনা কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি বর্তমানে জেলার তিনটি মহকুমার বিভিন্ন শহর এবং গ্রামাঞ্চলে শান্তিকমিটি গঠনের কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সাতক্ষীরায় ইতিমধ্যেই শান্তিকমিটি গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ শান্তিকমিটির কাজের সুবিধার্থে অফিস পরিবহন, টেলিযোগাযোগ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করিয়াছেন। জনসাধারণও পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনার জন্য শান্তিকমিটির সহিত সহযোগিতা করিতেছে। তাহার জনসাধারণের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সম্পর্কে বেসামরিক এবং সামরিক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতেছেন। এবং উহাদের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহারা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জানমাল রক্ষার জন্য এবং দুষ্কৃতিকারী ও রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের ধরার জন্য স্বেচ্ছাসেবী দলও গঠন করিতেছেন।

স্থানীয় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শান্তিকমিটির অফিস পরিদর্শনের জন্য এবং ঘটনাস্থলেই জনসাধারণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের ব্যাপারে করণীয় কাজ সম্পাদনের জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন সামরিক অফিসার নিযোগ করিয়াছেন। খুলনা কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটির দৌলতপুর, খালিশপুর এবং খুলনা শীপইয়ার্ডসহ বিভিন্ন শিল্প এলাকার জন্য বিশেষ শান্তিকমিটি গঠন করিয়াছেন। এই এলাকাগুলি প্রধান গোলযোগের এলাকা ছিল। গত কয়েক মাসের উৎপাদন ঘাটতি পূরণের জন্য শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম সহকারে এবং অভিনিবিশে সহকারে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করাই এই সকল কমিটির প্রধান লক্ষ্য।

দৈনিক আজাদ ১০ মে ১৯৭১



সপ্তম পর্ব

শান্তিকমিটির সদস্য তালিকা

আঃ লতিফ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আঃ সাত্তার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আঃ সাত্তার, দ্র. সুনামগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
আঃ সামাদ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আঃ সালাম, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আঃ হক, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আঃ হাই, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আঃ হানিফ মোল্লা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আঃ হান্নান, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আঃ হামিদ গাজী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আঃ হামিদ গাজী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আঃ হালিম, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আঃ হাসিম, দ্র. চুনারুঘাট শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
আঃ হেকিম (মৃত), দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আঃ হোসেন, দ্র. কিশোরগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
আকবর আলী, দ্র. চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শান্তিকমিটি
আকবর আলী, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আকবর আলী, মওলানা, দ্র. উলিপুর থানা শান্তিকমিটি
আকবর আলী মোল্লা, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আকবর, দ্র. ঢাকা জেলা শান্তিকমিটি
আকবর, মৃত, দ্র. টাঙ্গাইল জেলা শান্তিকমিটি
আকবর মেম্বার, দ্র. দিনাজপুর জেলা শান্তিকমিটি
আকবার আলী বিশ্বাস, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আকমান মিয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আকরাম আলী, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আকরাম খান, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
আকরাম হোসেন, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আকরামউদ্দীন ভুঁইয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আকরামুজ্জামান, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আকসেদ আলী, দ্র. চাঁদপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
আকাম শেখ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আকামুদ্দিন বিশ্বাস, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আকামুদ্দিন বিশ্বাস, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আকিজ উদ্দীন, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
আকিজ মোড়ল, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

আতাউর রহমান খান, মওলানা, দ্র. কিশোরগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
আতাউর রহমান ঝন্টু, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আতাউর রহমান, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আতাউর রহমান, মওলান, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য
আতাউল কবির চৌধুরী, দ্র. বাঁশখালী থানা শান্তিকমিটি
আতাউল হক, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আতাহার আলী, দ্র. কিশোরগঞ্জ সদর শান্তিকমিটি
আতাহার আলী, মওলানা, দ্র. কিশোরগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
আতিউর রহমান ঝন্টু, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আতিক উল্লাহ চৌধুরী (ধনু মিয়া), মৃত, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আতিয়ার রসুল বিএল, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আতিয়ার রহমান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আতিয়ার রহমান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৩), যশোর
আতিয়ার রহমান, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আত্মরুদ্দি মেম্বার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আদম আলী মীর, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আদম শফিউল্লাহ ওরফে মুহাম্মদ জাকারিয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আদু খান, দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
আনছারুল হক, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আনসার আলী, দ্র. তালা থানা শান্তিকমিটি
আনসার আলী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আনসার, অ্যাডভোকেট, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আনসার উদ্দিন, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ৬), যশোর
আনসার উদ্দিন মোল্লা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আনসার মুন্সী, দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
আনসার মোতালেব, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আনসারী, দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
আনসারী, দ্র. নাটোর জেলা শান্তিকমিটি
আনাউল কাইয়ুম, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আনাজউদ্দিন, দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি

আবদুর রহমান, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুর রহমান, হাজী, দ্র. বাহুবল শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
আবদুর রাজ্জাক মিয়া, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আবদুল আজিজ, দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি
আবদুল আজিজ মাস্টার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল আজিজ মিয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল ওয়াজেদ মোল্লা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল ওয়াতির, দ্র. সুনামগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
আবদুল কুদ্দুস, দ্র. কুড়িগ্রাম মহকুমা শান্তিকমিটি
আবদুল কুদ্দুস, দ্র. নান্দাইল থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আবদুল গফুর চৌধুরী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল গফুর সর্দার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল জব্বার, দ্র. রাজবাড়ি সদর শান্তিকমিটি
আবদুল জলিল খান, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল জলিল, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল নইম, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল বারিক, দ্র. বাহুবল শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
আবদুল বারেক, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল মজিদ,দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল মতিন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল মন্নাফ, দ্র. নান্দাইল থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আবদুল মান্নান, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল মান্নান মোল্লা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল মালেক, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল হক, দ্র. ১নং বারান্দীপাড়া পিস কমিটি, সদর, যশোর
আবদুল হক, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আবদুল হক প্রধান, দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
আবদুল হাই, দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি
আবদুল্লাহ খান, দ্র. নান্দাইল শান্তিকমিটি
আবদুল্লাহ, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আবদুল্লাহ মুন্সি, দ্র. উলিপুর থানা শান্তিকমিটি
আবদুস সাত্তার, উকিল, দ্র. চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শান্তিকমিটি
আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী, **দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি**
আবদুস সাত্তার, ডা., দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

আব্দুল খালেক মুকতার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুল খালেক, মৃত, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
আব্দুল খালেক, মৌলানা, দ্র. নেত্রকোণার সদর শান্তিকমিটি
আব্দুল খালেক,দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
আব্দুল খালেক, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
আব্দুল খালেখ, মৃত, দ্র. কলমাকান্দা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
আব্দুল গণি, দ্র. জামালগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি
আব্দুল গণি, প্রফেসর, দ্র. জামালপুর সদর শান্তিকমিটি
আব্দুল গণি ভূঁইয়া, দ্র. নান্দাইল শান্তিকমিটি
আব্দুল গফফার তরফদার, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১০), যশোর
আব্দুল গফফার, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আব্দুল গফুর, দ্র. নান্দাইল থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুল গফুর, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য
আব্দুল গফুর, **দ্র. লাকসাম শান্তিকমিটি**
আব্দুল গফুর মোল্লা,দ্র. রাজবাড়ি সদর শান্তিকমিটি
আব্দুল গাফফার চৌধুরী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুল জব্বার, দ্র. মদন থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
আব্দুল জব্বার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুল জব্বার, মওলানা, দ্র. গফরগাঁও থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুল জলিল খান, দ্র. শ্রীনগর থানা শান্তিকমিটি, মুন্সীগঞ্জ
আব্দুল জলিল, দ্র. কলমাকান্দা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
আব্দুল জলিল, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুল জলিল সরদার, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
আব্দুল, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুল বারী চৌধুরী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুল বারেক, মদন থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
আব্দুল বারেক (মৃত), দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুল বাসেত, ক্যাপ্টেন, ডাক্তার, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
আব্দুল মজিদ খান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আব্দুল মজিদ খান, দ্র. লাকসাম শান্তিকমিটি
আব্দুল মজিদ তালুকদার, দ্র. আদমদিঘি, দুপচাচিয়া, বগুড়া
আব্দুল মজিদ তালুকদার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

আব্দুল হাই, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুল হাই মৌলভী, মৃত, দ্র. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুল হাই সালাকী, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
আব্দুল হাকিম আজাদী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুল হাকিম তালুকদার, মৃত, দ্র. আটপাড়া থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
আব্দুল হাকিম, দ্র. উলিপুর থানা শান্তিকমিটি
আব্দুল হান্নান, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুল হান্নান, দ্র. ময়মনসিংহ সদর শান্তিকমিটি
আব্দুল হামিদ কোম্পানি, দ্র. নান্দাইল শান্তিকমিটি
আব্দুল হামিদ খন্দকার, দ্র. মাদারীপুর জেলা শান্তিকমিটি
আব্দুল হামিদ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৫), যশোর
আব্দুল হামিদ, দ্র. মাধবপুর শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
আব্দুল হামিদ, মাওলানা, দ্র. কিশোরগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
আব্দুল হামিদ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুল হালিম, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুল হাসেম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আব্দুল হেলিম খান, মৃত, দ্র. গফরগাঁও থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুল হেলিম মণ্ডল, মৃত, দ্র. গফরগাঁও থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুল্লা মুন্সি, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আব্দুল্লাহ-হেল-ওয়াসেক, দ্র. টাঙ্গাইল জেলা শান্তিকমিটি
আব্দুল্লাহ-হেল-ওয়াছেক, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুস ছোবহান মোল্লা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আব্দুস শহিদ মাস্টার, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুস সাকুর, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৬), যশোর
আব্দুস সাত্তার খান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৬), যশোর
আব্দুস সাত্তার, ঘড়মশ্রী, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
আব্দুস সাত্তার, ডা., দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আব্দুস সাত্তার মাস্টার, মৃত, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আব্দুস সাত্তার (মৃত), প্রফেসর, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
আব্দুস সামাদ, এ্যাডভোকেট, দ্র. সুনামগঞ্জ শান্তিকমিটি
আব্দুস সামাদ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর

আমিনুল্লাহ, দ্র. উপশহর পিস কমিটি, সদর, যশোর
আমির খান, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আমির খান, দ্র. ময়মনসিংহ সদর শান্তিকমিটি
আমির গাজী, দ্র. নলছিটি শান্তিকমিটি, বরিশাল
আমির গাজী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আমির, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আমির হুসাইন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আমির হোসেন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আমীর আলী খান পাঠান, দ্র. নেত্রকোণার সদর শান্তিকমিটি
আমীর আলী, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আমীর আলী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আমীর আলী, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আমীর হুসাইন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আমীর হোসেন ভুঁইয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আমু, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আমেজউদ্দিন চেয়ারম্যান, মৃত, দ্র. জামালপুর সদর শান্তিকমিটি
আয়নুল হক, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আয়েন উদ্দিন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আর রহমান, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আর হক, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আরজ, দ্র.গোপালগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
আরমান উদ্দিন, দ্র. ময়মনসিংহ সদর শান্তিকমিটি
আরমান, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আরমান, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আরশাদ আলী মিয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আরশাদ আলী সরদার, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
আরশাদ উল্লাহ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আরিফ উদ্দিন আকন্দ,দ্র. নান্দাইল শান্তিকমিটি
আরিফ, হাজী, দ্র. মৌলভীবাজার জেলা শান্তিকমিটি
আরেজ আলী, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আলকাছ আলী মণ্ডল, মৃত, দ্র. দুর্গাপুর থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইলের
আলতাফ আলী, দ্র. ত্রিশাল থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আলতাফ আলী, দ্র. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আলতাফ উদ্দিন আহমদ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

আলী হোসেন, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আলেপ উদ্দিন, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আশরাফ আলী চৌধুরী, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
আশরাফ আলী, দ্র. টাঙ্গাইল জেলা শান্তিকমিটি
আশরাফ আলী শিকদার, দ্র. পিরোজপুর জেলা শান্তিকমিটি
আশরাফ উদ্দিন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আশরাফ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আশরাফ মির্জা, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
আশ্রাব আলী শিকদার, দ্র. পিরোজপুর জেলা শান্তিকমিটি
আসগর আলী, হাজী, দ্র. নাটোর জেলা শান্তিকমিটি
আসমত ব্যাপারী, দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
আসলাম, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আসাদ উদ্দৌল্লা সিরাজী, মাওলানা, দ্র. সিরাজগঞ্জ মহকুমা শান্তিকমিটি
আসাদ গাজী, চেয়ারম্যান, দ্র. মৌলভীবাজার জেলা শান্তিকমিটি
আসাদ গাজী, চেয়ারম্যান, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আসাদ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আসাদুল্লাহ, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আহমদ আলী খান, দ্র. সুনামগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
আহমদ আলী, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আহমদ কবীর, মৌলবী, দ্র. বাঁশখালীর ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তিকমিটির আহবায়ক
আহমদ সগীর, 'মওলানা', দ্র. বাঁশখালী থানা শান্তিকমিটি
আহমদ সগীর মওলানা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আহমদ হোসাইন, দ্র. উল্লাপাড়া থানা শান্তিকমিটি
আহমেদ খান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ২), যশোর
আহম্মদ আলী, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
আহম্মদ আলী, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
আহম্মদ আলী, দ্র. ময়মনসিংহ সদর শান্তিকমিটি
আহম্মদ আলী, মৌলভী, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
আহম্মদ উল্লাহ, দ্র. নওগাঁ জেলা শান্তিকমিটি
আহম্মদ উল্লাহ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
আহম্মদ তালুকদার, দ্র. দুর্গাপুর থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইলের
আহম্মদ শফি চৌধুরী, দ্র. বাঁশখালীর ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তিকমিটির আহবায়ক
আহসন আলী, মৌলভী, দ্র. দুর্গাপুর থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইলের
আহাদ উল্লাহ, দ্র. নওগাঁ জেলা শান্তিকমিটি

কাজী আবু ইউসুফ চৌধুরী, দ্র. নবীগঞ্জ শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
কাজী আব্দুল রহিম, দ্র. জামালপুর সদর শান্তিকমিটি
কাজী ইমদাদুল হক, ডা., দ্র. ফরিদপুর জেলা শান্তিকমিটি
কাজী ছায়েম উদ্দিন, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
কাজী জায়াল আহমেদ,দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৪), যশোর
কাজী তসাদ্দক আলী, দ্র. নান্দাইল শান্তিকমিটি
কাজী নুরুল ইসলাম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
কাজী ফকরুল ইসলাম, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৭), যশোর
কাজী মজিবর রহমান, দ্র. উলিপুর থানা শান্তিকমিটি
কাজী মাহফুজুল হক, দ্র. কিশোরগঞ্জ সদর শান্তিকমিটি
কাজী মল্লীক এল.এল.বি, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
কাজী মোফাজ্জাল হোসেন, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৫), যশোর
কাজী শাকুর আলী, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
কাজী শামসুদ্দীন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
কাজী সিদ্দীক হোসেন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
কাজী সিরাজুল হক, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
কাজী সুলতান আহমেদ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৬), যশোর
কাঞ্চু উদ্দিন, দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি
কাদির, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
কাফিল উদ্দীন গাজী, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
কাফু মিয়া, দ্র.গোপালগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
কাবুল খান (বিহারী), দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
কামরুজ্জামান, দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
কামরুজ্জামান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
কামরুজ্জামান বাবু, দ্র. জগন্নাথপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
কামরুদ্দিন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
কামাল টাইপিস্ট,দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
কায়েম আলী, দ্র. যশোর জেলা শান্তিকমিটি
কায়েম আলী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
কালা মিয়া, মৃত চেয়ারম্যান, কেন্দুয়া থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল

খন্দকার মনোয়ার হোসেন, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৭), যশোর
খন্দকার মহিউদ্দিন, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
খবির উদ্দিন বিশ্বাস, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
খবির কাজী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
খবিরুদ্দীন, দ্র. দিনাজপুর জেলা শান্তিকমিটি
খয়বর আলী, দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
খলির, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
খলিল জমাদ্দার, দ্র. মাদারীপুর জেলা শান্তিকমিটি
খলিল, দ্র. ময়মনসিংহ সদর শান্তিকমিটি
খলিলুর রহমান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৩), যশোর
খলিলুর রহমান (খলিল), দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
খলিলুর রহমান, দ্র. নান্দাইল থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
খলিলুর রহমান, দ্র. বগুড়া জেলা শান্তিকমিটি
খলিলুর রহমান, দ্র. মাদারীপুর জেলা শান্তিকমিটি
খান বাহাদুর সাইয়িদ মোহাম্মদ আফজাল, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
খান হাবিবুর রহমান খান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১০), যশোর
খামির উদ্দিন প্রধান, দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি
খায়রুল (খলিলুর), দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
খালেক মিয়া,দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
খিজির মিয়া, দ্র. বাহুবল শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
খিদির খাঁ, দ্র. ফরিদপুর জেলা শান্তিকমিটি
খিলাফত হোসেন, দ্র. পাল্টি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
খুরশীদ, দ্র.কুমারখালী থানা শান্তিকমিটি
খোকন, দ্র. ফরিদপুর জেলা শান্তিকমিটি
খোকন মেম্বার, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
খোদা বক্স্ খান, মওলানা, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য
খোদা বকস্, দ্র. ঈশ্বরদী থানা শান্তিকমিটি
খোদা বখস ভুঁইয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
খোন্দকার আব্দুস সামাদ, দ্র. যদুবয়রা ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
খোয়াজ বেপারী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

গোলাম মোস্তফা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
গোলাম রব্বানী খান পাঠান, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
গোলাম রসুল, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
গোলাম রসুল, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৬), যশোর
গোলাম রসুল, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
গোলাম রসূল, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
গোলাম রহমান, এ্যাডভোকেট, দ্র. চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শান্তিকমিটি
গোলাম রহমান ফকির, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
গোলাম সরোয়ার, দ্র নন্দলালপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
গোলাম সিদ্দিক, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
গোলাম হোসেন ফকির, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
চং চো অং, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
চন্দ, দ্র. ফরিদপুর জেলা শান্তিকমিটি
চমক আলী, কেন্দুয়া থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
চাঁদ কাজী, দ্র. নগরকান্দা থানা শান্তিকমিটি
চাঁন মিয়া, দ্র. ত্রিশাল থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
চাঁন মিয়া, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
চাঁন মিয়া, দ্র. বগুড়া জেলা শান্তিকমিটি
চাঁন মিয়া, মাযান, মৃত, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
চাঁনু, দ্র. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
চান মিয়া, চাকারীপাড়া, দ্র. জামালপুর সদর শান্তিকমিটি
চান মোল্লা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
চানমিয়া সর্দার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
চান্দু, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
চান্দু মিয়া, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
চুন্নু মিয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
চুন্নু মিয়া, বড়কাশিয়া, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
চুন্নু মিয়া, মৃত, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
চৌধুরী দারোগা, দ্র. বারহাট্টা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
চৌধুরী মোহসেন আলী মোক্তার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
ছদ্দু মিয়া, দ্র. বড়কাশিয়া, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
ছফর উদ্দিন, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
ছলিমুদ্দিন মিয়া, দ্র. ঝালকাঠি শান্তিকমিটি, বরিশাল
ছাত্তার কাজী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

তাফসিরুদ্দীন আহমেদ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
তামাই মহালদার, দ্র. চুনারুঘাট শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
তারিকুল আলম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
তারিফুদ্দিন বিশ্বাস, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৫), যশোর
তালেবুর রহমান, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
তাহের আলী, মৃত, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
তুলা মোক্তার, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
তৈয়ব, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
তৈয়ব, দ্র. ময়মনসিংহ সদর শান্তিকমিটি
তোজী মাসুদ, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
তোতা, দ্র. বারহাট্টা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
তোতা মিয়া, দ্র. ঢাকা জেলা শান্তিকমিটি
তোফাজ শেখ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
তোফাজ্জল, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
তোফাজ্জল, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
তোফাজ্জল হোসাইন সোজার, দ্র. সিরাজগঞ্জ মহকুমা শান্তিকমিটি
তোয়াজাত সরদার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
তোয়েব মুন্সি, দ্র. মাগুরা জেলা শান্তিকমিটি
দরবেশ মিয়া, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
দলিল উদ্দিন আহমেদ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
দলিলউদ্দিন, দ্র. চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শান্তিকমিটি
দানেশ আলী, দ্র. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
দিল মামুদ, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
দীন মহাম্মদ, 'মাওলানা', দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
দুদু মিয়া, দ্র. টাঙ্গাইল জেলা শান্তিকমিটি
দুদু মিয়া, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
দুদু মিয়া, দ্র. বারহাট্টা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
দুদু মিয়া, দ্র. বারহাট্টা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
দুরবেশ, দ্র. নোয়াখালী জেলা শান্তিকমিটি
দুরবেশ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
দুলা মল্লিক, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
দুলাল, মেম্বার, দ্র. বগুড়া জেলা শান্তিকমিটি
দেওয়ান আলী রেজা, দ্র. বানিয়াচং শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ

নরুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ্ব, দ্র. বাঁশখালীর ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তিকমিটির আহবায়ক
নাছির উদ্দিন, মওলানা, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য
নাজমুল শেখ, দ্র. আটপাড়া থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
নাজিম উদ্দীন আজাদ,দ্র. পিস কমিটি, যশোর
নাজিম মুন্সী, দ্র. নগরকান্দা থানা শান্তিকমিটি
নাজিমউদ্দীন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
নাজিমুদ্দিন আল আজাদ,দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
নাজিমুদ্দীন আল আজাদ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
নাজির আহমেদ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
নাজির আহমেদ,দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি
নাজির উদ্দিন, অ্যাডভোকেট, দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
নাজির শেখ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
নাজিরউদ্দীন আহমেদ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
নানু অ্যাডভোকেট, দ্র. মাদারীপুর জেলা শান্তিকমিটি
নান্নু, দ্র. ফরিদপুর জেলা শান্তিকমিটি
নান্নু, দ্র. মাদারীপুর জেলা শান্তিকমিটি
নান্নু মিয়া, দ্র. আটপাড়া থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
নান্নু মিয়া, দ্র. আটপাড়া থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
নান্নু,দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
নাবালক মিয়া, মদনপুর, দ্র. নেত্রকোণার সদর শান্তিকমিটি
নাবিজুদ্দিন বিশ্বাস, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
নারা, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
নাসিম, দ্র. সুনামগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
নাসির আহমেদ, দ্র. উপশহর পিস কমিটি, সদর, যশোর
নাসির উদ্দিন, মওলানা, দ্র.ঈশ্বরদী থানা শান্তিকমিটি
নাসির উদ্দিন (মৃত), দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
নাসির খান, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ১), যশোর
নাসির মোড়ল, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
নাসিরউদ্দিন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
নাসিরুদ্দিন আহমেদ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৩), যশোর

ফিরোজ, দ্র.কুমারখালী থানা শান্তিকমিটি
ফিরোজ সিদ্দিক, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
ফিরোজ সিদ্দিকী, দ্র. উপশহর পিস কমিটি, সদর, যশোর
ফুল চান মেম্বার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
বংগা, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
বংগা, দ্র. ময়মনসিংহ সদর শান্তিকমিটি
বদর উদ্দীন বিশ্বাস, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
বদরুদ্দীন আহমেদ,দ্র. পিস কমিটি, যশোর
বদিউর রহমান, দ্র. চুনারুঘাট শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
বদু, দ্র. ফরিদপুর জেলা শান্তিকমিটি
ববরু মিয়া, মাস্টার, দ্র. বাহুবল শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
বশির আকন্দ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
বশিরউদ্দীন ওরফে (বশির মেকার), দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
বসিরুদ্দিন মজুমদার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
বসিরুদ্দিন মজুমদার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
বাকু মেম্বার, মৃত, দ্র. গফরগাঁও থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
বাখর আলী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
বাছের উদ্দিন আহমদ, দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি
বাজার মহাজন, দ্র. দিনাজপুর জেলা শান্তিকমিটি
বাতেন, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
বাদল মিয়া, মৃত, কেন্দুয়া থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
বাদশা খন্দকার, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
বাদশা, দ্র. বারহাট্টা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
বাদশা, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
বাদশা মিয়া, দ্র. কিশোরগঞ্জ সদর শান্তিকমিটি
বাদশা মিয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
বাবর আলী, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
বাবর কবিরাজ, দ্র, নন্দলালপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
বাবু খান, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
বাবু মিস্ত্রি, দ্র. ১নং বারান্দীপাড়া পিস কমিটি, সদর, যশোর
বাবুর বাপ, দ্র. কিশোরগঞ্জ সদর শান্তিকমিটি
বাবুল, দ্র. মাদারীপুর জেলা শান্তিকমিটি
বারিক মোড়ল, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
বারিক শেখ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

মজিবর রহমান মিয়া, দ্র. নগরকান্দা থানা শান্তিকমিটি
মজিবুর রহমান প্রামাণিক, দ্র. রাজবাড়ি সদর শান্তিকমিটি
মঞ্জুরুল হক, মওলানা,দ্র. আটপাড়া থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
মঞ্জুরুল হক, মৌলানা, দ্র. নেত্রকোণার সদর শান্তিকমিটি
মণিরুজ্জামান, দ্র. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মতি, ড্রাইভার,দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
মতি মিয়া, দ্র. মাধবপুর শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
মতিউর রহমান খান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মতিউর রহমান খান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মতিউর রহমান, দ্র. কেন্দুয়া থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
মতিউর রহমান (মতি চেয়ারম্যান), দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
মতিন উকিল, দ্র. মেহেরপুর জেলা শান্তিকমিটি
মতিন উকিল, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মতিয়ার রহমান খান, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
মতিয়ার রহমান (মওলানা), দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
মতিয়ার রহমান, মোল্যা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মদনা বিহারি, দ্র. চাপড়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
মদ্দার, দ্র.কয়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
মনওয়ার মিয়া, দ্র. বানিয়াচং শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
মনসুর, দ্র. টাঙ্গাইল জেলা শান্তিকমিটি
মনি মিয়া, দ্র.গোপালগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
মনির, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
মনিরুদ্দিন, দ্র. চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শান্তিকমিটি
মনু, দ্র. গাজীপুর জেলা শান্তিকমিটি
মনোয়ার হোসেন, অ্যাডভোকেট, দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
মনোয়ার হোসেন, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১), যশোর
মন্তমিয়া, দ্র. সুনামগঞ্জ শান্তিকমিটি
মফিজ উদ্দিন, দ্র. কিশোরগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
মফিজ উদ্দিন, দ্র. বেড়া থানা শান্তিকমিটি
মফিজ উদ্দিন, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মফিজউদ্দিন, দ্র. কিশোরগঞ্জ সদর শান্তিকমিটি
মমতাজ উদ্দিন খাদেম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মমতাজ উদ্দিন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মমতাজুল করিম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর

মালেক উদ্দিন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মালেক চৌধুরী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মালেক, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
মাশরুর খান, দ্র. নবীগঞ্জ শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
মাসুক চৌধুরী, দ্র. বাহুবল শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
মাসুক চৌধুরী, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
মাসুদুর রহমান, ডা., দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মাসুদুর রহমান, ডা., দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মাসুদুর রহমান, ডা., দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ২), যশোর
মাসুদুর রহমান, ডা.,দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
মাসুদুর রহমান, ডা.,দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মাসুদুর রহমান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৬), যশোর
মাহতাব উদ্দিন আহম্মদ, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
মাহতাব উদ্দিন, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
মাহতাবউদ্দিন আহমেদ, দ্র. শ্রীনগর থানা শান্তিকমিটি, মুন্সীগঞ্জ
মাহতাবউদ্দিন, প্রফেসর, দ্র. কিশোরগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
মাহফুজ আলী খান, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
মাহবুব মওলানা, দ্র. মাগুরা জেলা শান্তিকমিটি
মাহবুব সাব্বানী, দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
মাহবুব সোবহানী, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মাহবুবুর রহমান খান, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৯), যশোর
মাহবুবুর রহমান, ডা., দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মাহবুবুর রহমান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মাহবুবুর রহমান, দ্র. মাগুরা জেলা শান্তিকমিটি
মাহমুদ আলী, দ্র. সুনামগঞ্জ শান্তিকমিটি
মাহারান আলী খান, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মাহেবুল, দ্র. টাঙ্গাইল জেলা শান্তিকমিটি
মিজানুর রহমান, দ্র. দিনাজপুর জেলা শান্তিকমিটি
মিয়া আবুল কাসেম, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
মিয়া, মওলানা, মৃত, দ্র. নেত্রকোণার সদর শান্তিকমিটি

মেজবা উদ্দিন আহমেদ, আলহাজ্ব, দ্র. পিস কমিটি, যশোর

মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, আলহাজ দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১), যশোর

মেসবা উদ্দিন আহমেদ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১০), যশোর

মেসবাহ্ উদ্দীন আহমেদ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর

মেহেদি খান পল্লী, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি

মেহের উকিল, দ্র. মেহেরপুর জেলা শান্তিকমিটি

মেহের উকিল, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

মো. মোরশেদুল আলম মোক্তার, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি

মো. আ. ছত্তার, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি

মো. আইয়ুব, দ্র. পিস কমিটি, যশোর

মো : আঃ খালেক, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

মো. আফছারউদ্দিন, এ্যাডভোকেট, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি

মো. আবদুন নাসির, মৌলানা, দ্র. কুড়িগ্রাম মহকুমা শান্তিকমিটি

মো. আব্দুল কাইউস, এ্যাডভোকেট, দ্র. বাগুলাট ইউনিয়ন শান্তিকমিটি

মো. আসাদ আলী,দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য

মো. ইউসুফ আলী, এ্যাডভোকেট, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি

মো. ইব্রাহীম, ডা., দ্র. পিস কমিটি, যশোর

মো. এছহাক উদ্দিন, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি

মো. জিল্লুর রহমান, এ্যাডভোকেট, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি

মো. নতুব আলী শেখ, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য

মো. নুরু মিঞা, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য

মো. নুরুজ্জামান, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য

মো. নূর হোসাইন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর

মো. বন্দে আলী মিঞা, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য

মো. মক্তব হোসেন, দ্র. জামালপুর মহকুমা শান্তিকমিটি

মো. মজিবুল হব কিরমানী, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য

মো. মফিজ উদ্দীন,দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য

মো. মোজাম্মেল হক, দ্র. পাবনার বিভিন্ন এলাকার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য
মো. মোস্তফা, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মো : শহীদুল্লাহ মণ্ডল, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মো. হানিফ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ২), যশোর
মো. হাসান আলী এ্যাডভোকেট, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
মোঃ আইউব, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ আইয়ুব, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ আঃ রহমান হাজী, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
মোঃ আজিজুল ইসলাম, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আজিজুল ইসলাম, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আদিল সরকার (চেয়ারম্যান), দ্র. ত্রিশাল থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আনছার উদ্দিন মাস্টার, দ্র. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আনসার উদ্দিন খান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৭), যশোর
মোঃ আবতাব উদ্দিন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ আবদুল্লাহ, এড, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
মোঃ আবু আবদুল্লাহ ইসমাইল, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
মোঃ আবুল কাশেম সিকদার, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আবুল বাশার (বাসায়েত), দ্র. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুর রহিম বিশ্বাস, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৭), যশোর
মোঃ আব্দুল কাইয়ুম মল্লিক, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ আব্দুল কাশেম সিকদার, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল বারী, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
মোঃ আব্দুল বারেক, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল মজিদ শেখ, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল মোতালেব, দ্র. মদন থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
মোঃ আব্দুল হাই, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল হাই, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল হামিদ ক্বারী, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল্লাহ, এডভোকেট, দ্র. বাহুবল শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
মোঃ আব্দুস কুদ্দুস, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুস সামাদ, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

মোঃ আব্দুস সোবহান, মদন থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
মোঃ আমিন, দ্র. রংপুর জেলা শান্তিকমিটি
মোঃ আযম খান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৪), যশোর
মোঃ আলী, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ৯), যশোর
মোঃ আলী মিয়াজ, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১), যশোর
মোঃ আশরাফ আলী, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ আসাদুজ্জামান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৩), যশোর
মোঃ ইউনুস, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৪), যশোর
মোঃ ইউসুফ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ২), যশোর
মোঃ ইউসুফ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ ইজাজ, দ্র. ১নং বারান্দীপাড়া পিস কমিটি, সদর, যশোর
মোঃ ইদ্রিস, দ্র. মৌলভীবাজার জেলা শান্তিকমিটি
মোঃ ইদ্রিস, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ ইব্রাহীম, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১০), যশোর
মোঃ ইয়া সায়েম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ ইয়াকুব আলী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ ইয়াকুব, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ ইয়াকুব, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৫), যশোর
মোঃ ইয়াকুব বক্স, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ ইয়াদ আলী খান, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
মোঃ ইয়াসিন আলী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ ইয়াসিন, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ২), যশোর
মোঃ ইয়াসিন, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১), যশোর
মোঃ ইয়াহিয়া, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ৫), যশোর

মোঃ ইলিয়াস, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ২), যশোর
মোঃ ইসমাইল, ডা., দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ ইসমাইল, ডা.,দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ ইসরাইল, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৩), যশোর
মোঃ ইসলাম, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৩), যশোর
মোঃ ইসহক, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১০), যশোর
মোঃ ইসহাক, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ ইসহাক, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
মোঃ এ রহিম, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৭), যশোর
মোঃ কলিম উদ্দিন, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ কলিম উদ্দিন, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ কলিম উদ্দিন, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ কাবিল মিঞা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ কামরুদ্দীন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ কামরুদ্দীন, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১০), যশোর
মোঃ গোলাম মোস্তফা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ চাঁন মিয়া, দ্র. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ জয়নাল মিয়া, কেন্দুয়া থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
মোঃ জয়নাল মিয়া, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
মোঃ জাকির হোসেন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ জাফর আলী খান, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৯), যশোর
মোঃ জুনাব আলী, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
মোঃ জুনায়েত, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ তাজুল ইসলাম, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ তাহী মোল্লা, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ নুরুল ইসলাম, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ

মোঃ নূরুল হক খান, দ্র. গফরগাঁও থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ নেসার আলী, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ২), যশোর
মোঃ ভূটান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ২), যশোর
মোঃ মকিম, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
মোঃ মতিয়ার রহমান, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৯), যশোর
মোঃ মনির খান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৩), যশোর
মোঃ মালেখ মুন্সী, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ মুসা, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন খাঁ, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন খাঁ, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন খাঁ, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ মোস্তফা, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ রউফ মিয়া, দ্র. দিনাজপুর জেলা শান্তিকমিটি
মোঃ রফিউদ্দীন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ রফিউদ্দীন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ রুহুল আমিন, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ শরিফ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ২), যশোর
মোঃ শরিফ, দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
মোঃ শরীফ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ শরীফ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ শাকীর, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ শাফিউদ্দিন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ শামছুর রহমান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ শামছুল ইসলাম খলিফা, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ শামছুল ইসলাম (শামসু খলিফা), দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ শামসুদ্দিন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ শামসুর হক, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

মোঃ সগীর, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ সফি, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ১০), যশোর
মোঃ সফি, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৭), যশোর
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
মোঃ সাব্বির, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ সিরাজুল ইসলাম, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
মোঃ সোলায়মান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ২), যশোর
মোঃ সোলেমান গাজী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোঃ সোহাবাজ আলী, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
মোঃ হরমুজ আলী, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ হরমুজ আলী, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ হানিফ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ২), যশোর
মোঃ হানিফ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ হানিফ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ হাবিবুর রহমান (হবি), দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোঃ হাবিবুল্লাহ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৫), যশোর
মোঃ হাসান, দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
মোঃ হাসেম আলী, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৬), যশোর
মোঃ হুসাইন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ হোসাইন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ হোসেন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোঃ হোসেন, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৩), যশোর
মো.কমর উদ্দিন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোকাজ্জল হোসেন, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
মোকাদ্দাস হোসেন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোক্তার আলী খান, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
মোক্তার মহিউদ্দিন মৃধা, দ্র. দুর্গাপুর থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইলের
মোজাফ্ফর বক্স মোল্লা, দ্র. মাদারীপুর জেলা শান্তিকমিটি

মোজাফফর হুসাইন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোজাফফার হোসেন, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১), যশোর
মোজাম, হাসিমপুর, দ্র. জগন্নাথপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
মোজাম্মেল চৌধুরী (মৃত), দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
মোজাম্মেল হক, ডা., দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
মোজাম্মেল হক, দ্র. চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শান্তিকমিটি
মোজাম্মেল হক প্রধান, দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি
মোজাম্মেল হোসেন, ডা., দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
মোজাহার বিশ্বাস, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোজ্জাম হুসাইন খান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোজ্জাম্মেল হোসাইন খান চৌধুরী, দ্র. মিরপুর থানা শান্তিকমিটি
মোটাবুলবুল, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
মোৎ আজিজুল ইসলাম, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোতালেব, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
মোনতাজ উদ্দিন, মাওলানা, দ্র. কিশোরগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
মোফাজ্জল ভেণ্ডার, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
মোফাজ্জল হোসেন খান, দ্র. কলমাকান্দা থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
মোফাজ্জার হুসাইন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোফাজ্জেল হোসেন ক্ষানা, দ্র. নন্দলালপুর ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
মোবারক আলী, দ্র. নান্দাইল শান্তিকমিটি
মোবারক আলী মগা, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোবারক ডাক্তার, দ্র. দিনাজপুর জেলা শান্তিকমিটি
মোবারক হোসেন, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
মোমতাজউদ্দিন ভূঁইয়া, দ্র. নান্দাইল শান্তিকমিটি
মোয়াজ্জেম হোসাইন খান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোয়াজ্জেম হোসেন সরকার, দ্র. নান্দাইল শান্তিকমিটি
মোসলেম উদ্দিন, ডা., দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
মোসলেম উদ্দিন, দ্র. নান্দাইল শান্তিকমিটি
মোসলেম খাঁ, দ্র. পিরোজপুর জেলা শান্তিকমিটি
মোসলেম খারিফা, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোসলেম বাওয়ালী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
মোসাম্মৎ মরিয়ম আক্তার, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
মোস্তফা আহমদ, মৌলানা, দ্র. বানিয়াচং শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
মোস্তফা, দ্র.কয়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি

মোহাম্মদ হারেজ উদ্দিন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোহাম্মদ হুসাইন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোহাম্মদ হুসাইন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
মোহাম্মদ হুসেন, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
মৌলা মিয়া, দ্র. আটপাড়া থানা শান্তিকমিটি, নেত্রকোণা
রইছদ্দিন বাইন্না, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
রওশন আলী, দ্র. চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শান্তিকমিটি
রওশন আলী, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৭), যশোর
রকিব, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
রজব আলী, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
রজব আলী, দ্র. পাল্টি ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
রজব আলী ফকির, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
রজব আলী ফকির, দ্র. ময়মনসিংহ সদর শান্তিকমিটি
রজব আলী ফকির, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
রজব আলী মিয়া, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
রজ্জব আলী ফকির, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
রজ্জব আলী ফকির, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
রতন মিয়া, দ্র.গোপালগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
রফি উদ্দিন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
রফিউদ্দিন চৌধুরী, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
রফিউদ্দীন মোল্যা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
রফিক উদ্দিন, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
রফিক, দ্র. টাঙ্গাইল জেলা শান্তিকমিটি
রফিকুল ইসলাম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
রফিকুল ইসলাম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
রফিকুল ইসলাম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
রফিকুল ইসলাম মোক্তার, দ্র. বাগুলাট ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
রফিজউদ্দিন দেওয়ান, দ্র. নালিতাবাড়ি থানা শান্তিকমিটি, শেরপুর
রবসির মেকার, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
রবিউল্লাহ, মানশ্রী, দ্র.মোহনগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি, টাঙ্গাইল
রমজান আলী, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
রমজান আলী, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
রমজান আলী, দ্র.কয়া ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
রমজান গাজী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ

শামসু, দ্র. বগুড়া জেলা শান্তিকমিটি
শামসুজ্জামান খান, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
শামসুদ্দিন আহমদ (শংকরপুর), দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শামসুদ্দিন, দ্র. কিশোরগঞ্জ জেলা শান্তিকমিটি
শামসুদ্দিন, দ্র. ঝিনাইদহ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
শামসুদ্দিন, দ্র. শিলাইদহ ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
শামসুদ্দিন মণ্ডল, দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
শামসুর রহমান খান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
শামসুর রহমান খোকা মিয়া, দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
শামসুর রহমান, মওলানা, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শামসুর রহমান, মওলানা, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শামসুল আলম (আক্কেল আলী), দ্র. মুক্তাগাছা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
শামসুল মাস্টার, দ্র. দিনাজপুর জেলা শান্তিকমিটি
শামসুল হক খন্দকার, দ্র. কুড়িগ্রাম ইউনিয়ন শান্তিকমিটি
শামসুল হক ফকির, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
শামসুল হক, মাওলানা, দ্র. মাগুরা জেলা শান্তিকমিটি
শামসুল হুদা, এডভোকেট, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
শামসুল হুদা, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শামীম উদ্দিন, দ্র. উপশহর পিস কমিটি, সদর, যশোর
শামীম উদ্দিন, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শাসছুল হক ওরফে হক চেয়ারম্যান, দ্র. ফুলপুর থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
শাহ নাজিম, দ্র. ভালুকা থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
শাহ সামশুল হুদা, দ্র. কিশোরগঞ্জ সদর শান্তিকমিটি
শাহআলম, দ্র. শ্রীনগর থানা শান্তিকমিটি, মুন্সীগঞ্জ
শাহজাহান চৌধুরী, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
শাহজাহান, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
শাহজাহান ব্যাপারী, দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
শাহনূর, দ্র. জামালগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি
শাহবুদ্দিন সরকার, দ্র. উলিপুর থানা শান্তিকমিটি
শাহাদত, দ্র. চুয়াডাঙ্গা সদর থানা শান্তিকমিটি
শাহাদাৎ হোসেন, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১), যশোর
শাহান আলী, মৃত, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
শাহাবুদ্দিন, দ্র. কুড়িগ্রাম জেলা শান্তিকমিটি

শেখ মফিজুল্লা, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৯), যশোর
শেখ মাওলা, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
শেখ মাহবুবুর রহমান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শেখ মাহবুবুর রহমান, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৯), যশোর
শেখ মাহাবুবুর রহমান (মন্টু) , দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
শেখ মোঃ আলী, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১০), যশোর
শেখ যাবিউল্লাহ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শেখ রহমত উল্লাহ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
শেখ রহিম বক্স, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৬), যশোর
শেখ রুস্তম আলী, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
শেখ লুৎফর রহমান, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৯), যশোর
শেখ শহিদুল হক, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ৩), যশোর
শেখ শামছুল হক, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১০), যশোর
শেখ সফিউদ্দিন আহমেদ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১০), যশোর
শেখ সাঈফ, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ১০), যশোর
শেখ সাকবুল, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শেখ সিরাজ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শেখ সিরাজ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শেখ সোহরাব হোসেন, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
শেখ হাফিজুল্লাহ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শেখ হাফিজুল্লাহ, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শেখ হাসান আলী, দ্র. টাউন পিস কমিটি, সদর, যশোর
শেখ হাসান আলী, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শেখ হাসান আলী, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শেখ.এ. জব্বার, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
শের আলী, দ্র. মাগুরা জেলা শান্তিকমিটি

সুলতান আহমেদ, দ্র.বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং : ১), যশোর
সুলতান খাঁ, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
সুলতান খাঁ, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
সুলতান খান, দ্র. লাখাই শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
সেকেন্দার আলী,.দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং :৮), যশোর
সেখ আলতাফ আলী মোক্তার, দ্র. বাগেরহাট শান্তিকমিটি
সেময় আলী, দ্র. নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটি
সেলিম খান পল্লী, দ্র. টাঙ্গাইল সদর শান্তিকমিটি
সৈয়দ আকবর আলী, দ্র. জামালগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি
সৈয়দ আব্দুল মান্নান, দ্র. শ্রীনগর থানা শান্তিকমিটি, মুন্সীগঞ্জ
সৈয়দ আলী আহম্মদ, দ্র. শান্তিকমিটির সদস্যদের বিবরণ
সৈয়দ আলী ইমাম, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
সৈয়দ আহম্মদ চেয়ারম্যান, দ্র. শেরপুর সদর শান্তিকমিটি
সৈয়দ কামরুল আহসান, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
সৈয়দ কামাল, দ্র. রাজবাড়ি সদর শান্তিকমিটি
সৈয়দ খান, দ্র. বেজপাড়া-শংকরপুর ইউনিয়ন পিস কমিটি, সদর (ওয়ার্ড নং ২), যশোর
সৈয়দ খান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
সৈয়দ, দ্র. নাগেশ্বরী থানা শান্তিকমিটি
সৈয়দ নুরুল আহসান, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
সৈয়দ ফজলুল হক, দ্র. বানিয়াচং শান্তিকমিটি, হবিগঞ্জ
সৈয়দ বদরুল আলম, দ্র. যশোর জেলা শান্তিকমিটি
সৈয়দ মধু মিয়া, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
সৈয়দ মনা হাজী, দ্র. হালুয়াঘাট থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
সৈয়দ মুহিবুল আহসান, দ্র. হবিগঞ্জ শান্তিকমিটি
সৈয়দ রফিকুল্লা, দ্র. কিশোরগঞ্জ সদর শান্তিকমিটি
সৈয়দ শামছুর রহমান, অ্যাডভোকেট, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
সৈয়দ শামছুর রহমান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
সৈয়দ শামসুর রহমান, অ্যাডভোকেট, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
সৈয়দ শামসুর রহমান, দ্র. পিস কমিটি, যশোর
সৈয়দ শামসুর রহমান, দ্র. যশোর জেলা শান্তিকমিটি
সৈয়রত উদ্দিন, দ্র. ফুলবাড়িয়া থানা শান্তিকমিটি, ময়মনসিংহ
সোনা মিয়া, দ্র. জামালগঞ্জ থানা শান্তিকমিটি

পরিশিষ্ট : ১

কেন্দ্রিয় শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান আইনউদ্দিনের চিঠি

No. 588 C.P.C. Dated 13.9.71
To
Captain M. Ilyas Khan
Rajshahi University Campus,

Dear Sir,
I write to state on Mvi. Ibrahim of Ramchandrapur, P.S. Paba, Rajshahi, is a very notorious type of Awami Leagor, who worked against Pakistan, instigated to fight against Pak-Army, created hatred between local and non-local Muslims. He was one of the greatest exponent of "Joy Bangla." He along with his followers created panic throughout the entire area by threat and intimedation. He and his followers killed our relatives of the Peace Committee. They also attacked and set fire to the house of Chairman, Parila Union Peace Committee and looted away everything. After this incident, you were kind enough to send a group of Mujahid who went there and arrested said Ibrahim Moulvi and handed him over to you. But he was latter released from the University, went back to Ramchandrapur, called a public meeting and decided to launch movement against the present govt. It is reliapty learnt that he and his followers are responsible in darmaging the Rly. Track near University, set fire to the T.D.R. office

at Kharkhari day before yesterday. Last night also they have destroyed the Union Council office at Ramchandrapur and attacked Rahanhat village. Rahanhat village people apprehend that they may attacked their village this night.

I threfore, request you to be good enough to send a group of Mujahid to the said village and direct them to arrest the following persons :

1. Moulvi Ibrahim of Koipukuria.
2. Ajmat Ali Palashbari, Secretary, Union Council, Parila.
3. Abdus Sattar of Parila.
4. Abdullah of Saranpur.
5. Abdul Baki of Parila.
6. Ataur Rahman of Parila.
7. Nurul Islam of Parila
8. Kamal of Parila.
9. Abasar of Saranpur.
10. Rahman, S/O. Soleman of Ramchandrapur, all of p.s. Paba, Dist. Rajshahi.

Thanking you,
Yours faithfully,
(MD. Ayenuddin)
Chairman,
Central Peace Committee, Rajshahi.
13.9.71.

পরিশিষ্ট : ২

From :
Md. Ayenuddin
Chairman
Central peace committee, Rajshahi.
No. C.P.c. Date. 29.7.71.

To
The Asstt. Director,
Central Intelligance Branch, Kumarpara,
Rajshahi.

Dear Sir,
Enclosed please find an annanymous pittion which will speak for itself.

Yours faithfully,
(Md. Ayenuddin)
Chairman.
Central Peace Committee, Rajshahi.
29.7.71.

English translation of a letter received from a Muslim Leagor.

"On the appeal of Mr. Ayenuddin we casted our votes in favour of Muslim league. The result is that our houss have looted and took away cash Rs. 900/=. Still we were living some how, but now it is not possible to live there for cruelty of Awami Leagors and so-called 'Mukti Fous.' All peace Committee Members and Muslim Leagors have been killed. We do not want Joy Bangla. Only 2% people want Joy Bangla. of one ½ is Muktifous and the rest half is their helpers so called Refugees from Mursidabad the heirs of Mirzafar. It is suggested that all transistors be withdrawn from their houses so that they may not hear Air India."

Villagers of Dashmari and Khujapura, P.s. Paba.
(মরহুম আতাউর রহমানের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

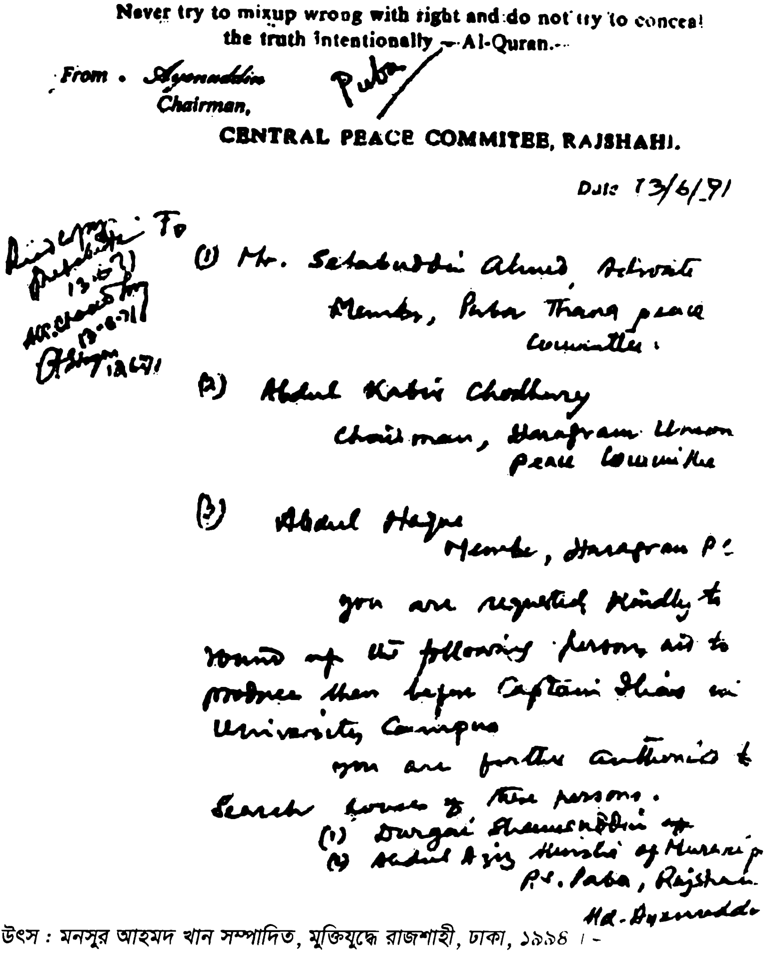
উৎস : মনসুর আহমদ খান সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী, ঢাকা, ১৯৯৪ ।

পরিশিষ্ট : ৩

৩ জন শান্তিকমিটির সদস্য ও চেয়ারম্যানের কাছে ১৩-৬-৭১ লিখিত রাজশাহী কেন্দ্রিয় শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান মোঃ আইনউদ্দীনের চিঠি।

Never try to mixup wrong with right and do not'try to conceal the truth Intentionally-Al-Quran.

From. Ayenuddin
Chairman,
Central Peace Committee, Rajshahi.
Date



Never try to mixup wrong with right and do not try to conceal the truth intentionally — Al-Quran.

From . Ayenuddin
Chairman,
CENTRAL PEACE COMMITEE, RAJSHAHI.

Date 13/6/71

To
(1) Mr. Setabuddin Ahmed, Advocate
Member, Paba Thana peace Committee.
(2) Abdul Kabir Chowdhury
Chairman, Haragram Union peace Committee
(3) Abdul Haque
Member, Haragram P.C.

you are requested kindly to round up the following persons and to produce them before Captain Ilias in University Campus
you are further authorised to search houses of these persons.
(1) Durgai Shamsuddin of
(2) Abdul Aziz Munshi of Haragram
P.S. Paba, Rajshahi.

Md. Ayenuddin

উৎস : মনসুর আহমদ খান সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী, ঢাকা, ১৯৯৪।

নির্দেশিকা

গ্রন্থ

১. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, ২০০৫
২. আবু সাইদ খান, *মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর*, ঢাকা, ২০০৭
৩. আবু সাইদ খান (সম্পাদিত), *ফরিদপুর মুক্তিযুদ্ধ : দলিলপত্র*, ঢাকা
৪. আবুল কালাম আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা, পাবনা জেলা*, ঢাকা, ১৯৯১
৫. এ এস এম শামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী*, ঢাকা, ২০০৮
৬. এ এস এম শামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদিত), রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃতদের তালিকা, ঢাকা, ২০০১
৭. তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে*, ঢাকা, ২০০৮
৮. মাহফুজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ*, ঢাকা, ২০০৯
৯. মাহফুজুর রহমান, *ভোলা দ্বীপের অনন্য মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, ২০০৯
১০. মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় ?*, ঢাকা ১৯৮
১১. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ চর্চা*/১, ঢাকা, ২০০৩
১২. রুকুনউদ্দৌলাহ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, ঢাকা, ২০০৯
১৩. হায়াৎ মামুদ (সম্পাদিত), *যুদ্ধাপরাধীর শাস্তি চাই*, ঢাকা, ২০০৯

গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত প্রবন্ধ

১৪. আছমা জাহান, 'জগন্নাথপুর', আ. মো. দেলোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস* ,১ম খণ্ড, ১৯৯৪
১৫. আবু সাঈদ খান-'নগরকান্দা'- আ. মো. দেলোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ৩ খণ্ড, ঢাকা
১৬. আমিনুল ইসলাম ছমির,'নাগেশ্বরী', *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতহাস*/৩
১৭. আমিনুল হক বাবুল, 'পাঁচবিবি', আ. মো. দেলোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ২ খণ্ড

১৮. এ. টি. এম. যায়েদ হোসেন, 'কুমারখালী' *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতহাস*/৩
১৯. এস. এম. আলাউদ্দিন, 'চুয়াডাঙ্গা সদর', *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*/২।
২০. খান মোহাম্মদ জহুরুল হক, 'রাজবাড়ি সদর', *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*/ ২
২১. গাজী আবদুস সালাম ভূঁইয়া, 'নান্দাইল', *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*/ ১
২২. তুহিন খান, 'টাঙ্গাইল সদর', *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*/২
২৩. মনোরঞ্জন রায়, 'উলিপুর', *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*/ ২
২৪. মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, *মুক্তিযুদ্ধে দৌলতপুর : একটি সমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০৫
২৫. মো. জয়নাল আবেদীন, 'শ্রীনগর', *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*/৩
২৬. মোহাম্মদ ইউসুফনূর নবী চৌধুরী,'বাঁশখালি', *ঐ*
২৭. সাইফুল হক মোল্লা দুলু, 'কিশোরগঞ্জ সদর'ঐ/২

সংবাদপত্র/সাময়িকপত্র

২৮. *দি মর্নিং নিউজ*, ১০ জুন ১৯৭১
২৯. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯-১-২০০১
৩০. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩-০৩-২০০১
৩১. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১২-০৩-২০০১
৩২. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২-৪-২০০০
৩৩. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৪-৪-২০০০
৩৪. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৫-৩-২০০১
৩৫. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৭.০৩.২০০১
৩৬. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩.০৩.২০০১
৩৭. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬.০৩.২০০১
৩৮. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১-২৫.০৩.২০০৯
৩৯. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১০.০৫.১৯৭২
৪০. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২০.০৩.১৯৭২
৪১. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ ১২.২০০০
৪২. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪.১২.২০০৭
৪৩. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৫-১১-২০০৭
৪৪. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৩.১২.২০০৭
৪৫. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৫.৭.২০০৭
৪৬. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৩-১১-০৭
৪৭. *দৈনিক যুগান্তর*, ২৫.০৩.২০০৯
৪৮. *দৈনিক সমকাল*, ১৬-১১-০৭
৪৯. *দৈনিক সমকাল*, ১৪.১২.২০০৭
৫০. *নতুন বাংলা*, ২৫.১১.১৯৭১
৫১. *প্রতিনিধি*, ১৫.১০.১৯৭১
৫২. *সাপ্তাহিক*, ১৮-১২-২০০৮

বিবিধ

৫৩. *কার্য বিবরণী*, ২৪.৬.১৯৭১
৫৪. *কার্য বিবরণী*, ২৮.৪.১৯৭১
৫৫. ছলিমুদ্দিন মিয়ার *চিঠি*
৫৬. *তালিকা* : ২৪.১২.৭১ তারিখে মুন্সীগঞ্জ মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত [সংগ্রহ হাসিনা আহমেদ]
৫৭. *প্রচারপত্র*, ৩০-৭-১৯৭১
৫৮. *প্রচারপত্র*, ৫-৫-১৯৭১
৫৯. বাংলাদেশ সরকারের গেজেট, ১৫.১২.১৯৭৩
৬০. সাক্ষাৎকার, ইউসুফ আলী শিকদারের মাতা সালেহা বেগম
৬১. সাক্ষাৎকার, *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৪.১১.২০০৭
৬২. সাক্ষাৎকার, ফজলুর রহমান, কুইয়াপানিয়া, কসবা
৬৩. সাক্ষাৎকার, হেলাল উদ্দিনের ভাই মো. আব্দুর রহমান